অখণ্ড সংহিতা

বা

সপ্তদশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

সপ্তদশ খণ্ড

তৃতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৪১৫

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

সম্পাদিত।

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০

ধর্মার্থ শুল্ক : একশত টাকা (মাশুলাদি স্বতন্ত্র)

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"সন্তোষ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা
দূরভাষ : (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০২১২

সাধন কুঞ্জ
হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২৩১০৭১০

দি মান্টিভার্সিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড : ৮২৭০১

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

পর পর "অখণ্ড-সংহিতা"র ষোড়শটী খণ্ড প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বিধৃত বাণী-সমূহের বহুল প্রচারণার দিকে তাকাইয়া আমরা প্রত্যেক খণ্ডেরই কতক কতক বাণী "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। আচার্য্য স্বরূপানন্দের বাণী বাঁচিবার বাণী, জাগিবার বাণী, উঠিবার বাণী। এই বাণী দেশবাসীর শুনিবার প্রয়োজন আছে। এই জন্যই প্রচুর অর্থব্যয়ে এই মহাসঙ্কলনের প্রকাশন আমাদের অধ্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আমাদের আশ্রম অযাচক ও অভিক্ষু। এই জন্য আমাদের অর্থাভাব সর্ব্বদাই উৎকট। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা অগ্রসর হইতেছি। মঙ্গলময় পরমেশ্বরই জানেন, আমরা শেষ পর্য্যন্ত এই মহাগ্রন্থের কত খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব। আমৃত্যু নিষ্ঠায় কাজে লাগিয়া থাকিব, কাজটী ছাড়িব না, এই পণ করিয়াছি। জীর্ণাতিজীর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলি আমাদের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমাদের গুরুভ্রাতাদের সংখ্যা গণনাতীত। নিঃস্বার্থ গুরু নিষ্কাম হিত-বুদ্ধিতে লক্ষ লক্ষ লোককে দীক্ষা দিয়া জীবনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু কাহারও উপরে কোনও আর্থিক বা বৈষয়িক দাবী রাখেন নাই। তমোভাবাপন্ন গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীরা চিন্তা করিয়াও দেখেন না যে, তাঁহাদের

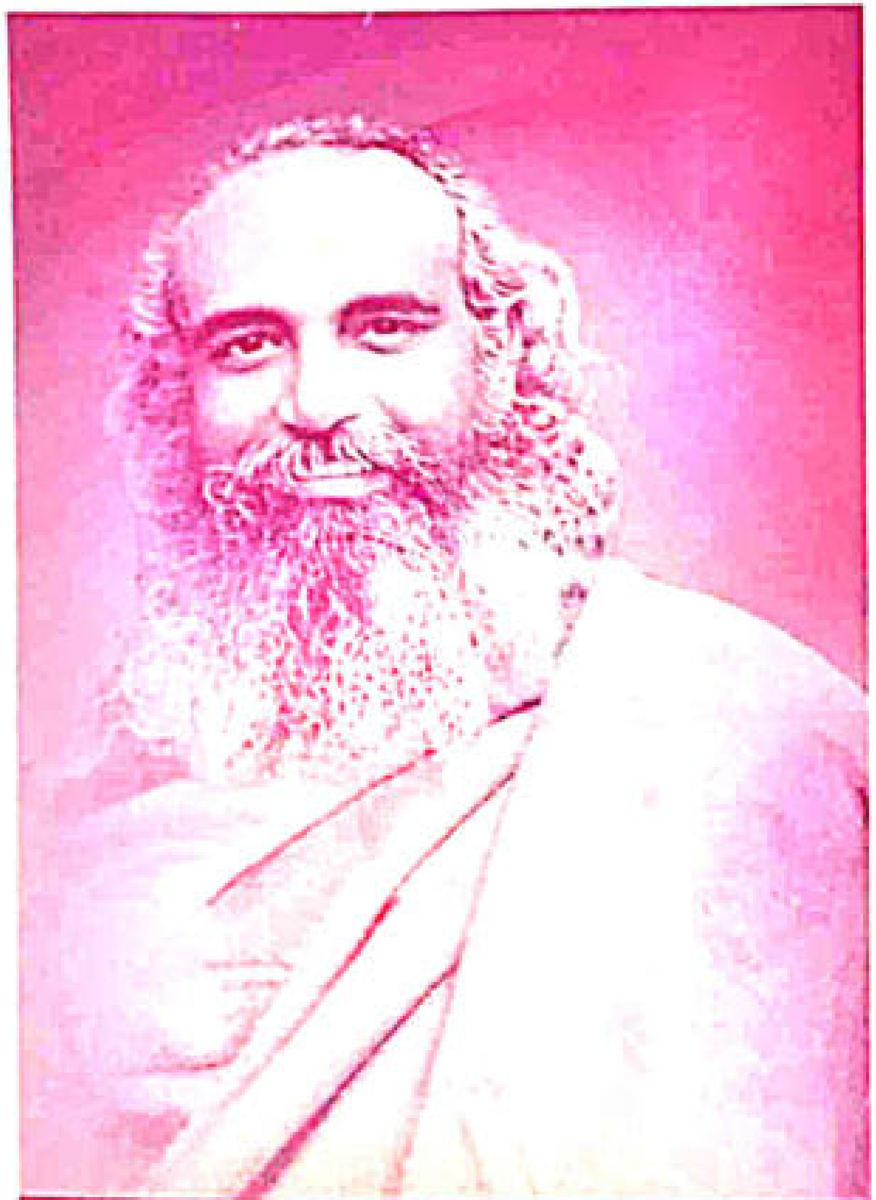
প্রত্যেকের এক এক সেট করিয়া "অখণ্ড-সংহিতা" শিয়রের কাছে থাকা উচিত, যাহাতে উপাসনার পূর্ব্বে ত' নিশ্চয়ই, শয়নের পূর্ব্বেও কতকাংশ বাণী এই মহাগ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া শুনিতে পারেন, শুনাইতে পারেন। মাত্র দুই তিন হাজার করিয়া "অখণ্ড-সংহিতা" ছাপানো হয়, কিন্তু প্রায় সবই আমাদের গুদামের দম বন্ধকরা আটকানো বাতাসকে অধিকতর অবরুদ্ধ করে। ছাপার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় হইয়া গেলে পরবর্ত্তী নূতন একটী খণ্ড প্রকাশ করা যে আমাদের পক্ষে সহজ হয়, এই কথাটী ভাবিবার মত সহৃদয় বন্ধু আমাদের বড় কেহ নাই। সামগ্রিক ভাবে এই দোষটী যখন প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সেই সময়ে দুঃসাধ্য অধ্যবসায় করিয়া করিয়াই আমাদিগকে "অখণ্ড-সংহিতা"র শত খণ্ড প্রকাশে লাগিয়া থাকিতে হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি আছে? এই গ্রন্থের একশত খণ্ডে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব আশ্রম গড়িয়াছেন কিন্তু তাহা ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য নহে, ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের যাবতীয় কল্যাণ-কর্ম্মের মূলদেশ হইতে কি ভাবে উৎখাত করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার নির্ভরযোগ্য নিরপেক্ষ সদুপায় আবিষ্কার করিবার জন্য। তিনি দেশের পর দেশ পথক্লেশ সহিয়া এবং অনেক সময়ে একেবারে অনশনে থাকিয়াও ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভিক্ষাসংগ্রহের জন্য নহে, ভিক্ষা-নিরপেক্ষ পৌরুষকে জাতীয় জীবনে জাগ্রত করিয়া তুলিবার প্রয়োজনে। স্থানের পর স্থানে তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা

প্রদান করিয়া শ্রোতাদের বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া দিয়াছেন কিন্তু সেই গ্রামটী বা সহরটী ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে একবারও কাহারও নিকট গিয়া হাত কচলাইয়া কোনও প্রকারের সাহায্য ভিক্ষা করেন নাই, এমনকি পাথেয় ব্যয় পর্য্যন্ত সংগ্রহের তিনি কোনও সুকৌশল চেষ্টা করেন নাই। বিজ্ঞাপন ছাপিবার ব্যয়, হলের ভাড়া-সঙ্কুলান সব-কিছু তিনি নিজে করিয়াছেন, এমনকি সভাস্থলে যে পেট্রোম্যাক্স্ বাতিটি জ্বলিত, তাহাও তিনি নিজে ঢাকা হইতে কিনিয়া নিয়াছিলেন। এমন পৌরুষ-নিষ্ঠ জ্ঞানের প্রচার ইহার পূর্ব্বে এই দেশে আর কেহ কখনো করেন নাই। এই জন্যই আচার্য্য স্বরূপানন্দের বাণী বজ্রসার, ওজঃপূর্ণ, দৃপ্ত ও উজ্জ্বল। যে ভাবে পারি, আমৃত্যু আমরা তাঁহার প্রদত্ত অযাচকত্বের আদর্শে নিষ্ঠাশীল থাকিয়া তাঁহার বাণী প্রচার করিয়া যাইব,—ইহা আমাদের কঠোর সঙ্কল্প।

সপ্তদশ খণ্ড প্রকাশ করিবার কালে তাঁহাদিগকে নিশ্চিতই ধন্যবাদ প্রদান করিব, যাঁহারা প্রথম হইতে ষোড়শ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশের পরে ঐ সকল খণ্ডের কোনও না কোনও খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই গৌণ সহায়তা আমাদের দুর্গম পথকে কথঞ্চিৎ সুগমতর করায় আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিমধিকমিতি—পৌষ ১৩৭৯।

অযাচক আশ্রম	নিবেদক
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট	ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
বারাণসী-১০	স্নেহময় ব্রহ্মচারী



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ-বাণী

(সপ্তদশ খণ্ড)

—ঃ * ঃ—

৯ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১
(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব আজ প্রাতে দশটায় শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়াছেন। ট্রেণ সন্ধ্যা সাতটা ষোল মিনিটে আখাউড়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একজন হোমরা-চোমরা চেহারার ভদ্রলোক আসিয়া গাড়ীতে ঢুকিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—হে মশায়, আপনার নাম কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে নিজের নামটী বলিলেন।

গৈরিক বসনের আবশ্যকতা

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হো মশায়, আপনি গেরুয়া পরেন না কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আগে আমি গেরুয়া পরতাম, এখন আর পরি না। কেন পরি না? পরি না, আমার ইচ্ছায়।

প্রশ্ন।—সব সন্ন্যাসীরা ত' পরে?

শ্রীশ্রীবাবামণি—সব সন্ন্যাসীরাই গেরুয়া পরেন না, অনেকে পরেন, কেউ কেউ পরেন না। গেরুয়াটা সন্ন্যাসের বহিরঙ্গ চিহ্ন। সন্ন্যাসের অন্তরঙ্গ প্রমাণ তাঁর ভিতরের অনাসক্ত কর্ত্তব্য-জ্ঞান। ভিতরে যিনি সন্ন্যাসী, তাঁর বাহিরের গেরুয়া না পরলেও চলে। ভিতরে যাঁর অনাসক্তি প্রবল নয় বা গভীর নয়, তাঁকে নিয়ত তাঁর প্রকৃত কর্ত্তব্য স্মরণ রাখতে গেরুয়া বসন সাহায্য করে ব'লেই তিনি আদর ক'রে গৈরিক ধারণ করেন। গৈরিক ধারণ নিশ্চয়ই মঙ্গলপ্রদ কিন্তু গৈরিক ধারণের প্রয়োজনকে উল্লঙ্ঘন করার সামর্থ্য অর্জ্জন অধিকতর কুশলজনক। সবগুলি মানুষ গৈরিক ধারণ ক'রে কেবল ভিক্ষাটন ক'রে বেড়াক, এটা কখনো কোনো জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক হ'তে পারে না। সব মানুষ নিজ নিজ কর্ত্তব্য-কর্ম্মে নিয়োজিত থেকেই মনকে গৈরিকে রঙ্গিয়ে নিয়ে অনাসক্ত নিঃস্পৃহ লালসাগন্ধহীন পবিত্র জীবন যাপন কত্তে সমর্থ হোক, একটা জাতির পক্ষে এটাই অনুসরণীয় আদর্শ।

ভবিষ্যদ্‌বাণী

প্রশ্নকর্ত্তা বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। কিছু সহযাত্রী বিতণ্ডায় যোগদান করিলেন। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল। শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঝড় থামিল। হোমরা চোমরা ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন,—হো মশায়, আপনি সভাস্থলে পরনিন্দা করেন কেন?

—আমার মুখে পরনিন্দা শুনেছেন নাকি? নিজ কাণে শুনেছেন ত'? কাকে নিন্দা করেছি? কবে? বলবেন কি দয়া ক'রে?

—কেন, শ্রীহট্টের বক্তৃতায় আপনি ফরাসী জাতিকে নিন্দা করেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন,—তবে ত' আমি সত্য সত্যই যশস্বী বক্তা! সিলেটের বক্তৃতা ঝড়ের মুখে কুমিল্লা জেলার আখাউড়া পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছে! এবার অবশ্যই আশা কত্তে পারি যে, বক্তৃতাটা একেবারে ফ্রান্স পর্য্যন্তও যাবে। বলা হচ্ছিল, ফরাসীরা ভোগী, ফরাসীরা বিলাসী, সাহিত্য তাদের কামক্লেদে পঙ্কিল, রুচি তাদের স্থূলসুখমুখী, তারা ত' চরিত্র-আন্দোলনের প্রয়োজন বোধ করে না, তবে ভারতবর্ষে আমাদের মত বক্তারা কেন চরিত্র চরিত্র ক'রে অত লাফালাফি কচ্ছে? এর জবাবে একটা

ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলাম যে, ফরাসী জাতির অধঃপতন আসন্ন এবং হঠাৎ একটা আকস্মিক আঘাতে এই জাতি এমন এক জাতির পদলেহন কত্তে বাধ্য হবে, যারা নিজেদের যুবকদের ও যুবতীদের ভিতরে চারিত্রিক শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য রাষ্ট্রশাসনের স্তরে, শিক্ষাদীক্ষার স্তরে, দার্শনিকতার স্তরে এবং সাহিত্যিক স্তরে অধ্যবসায় ক'রে যাচ্ছে। আমি এখনো বল্‌ছি যে, আমার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হবে এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়কেরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে একথা স্বীকার কত্তে বাধ্য হবেন যে, চারিত্রিক মেরুদণ্ড দুর্ব্বল থাকাতেই ফ্রান্সের কপালে এত দুঃখ ঘটল। আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছি, কারো নিন্দা করি নাই। *

হোমরা চোমরা ভদ্রলোক হঠাৎ কামরা ত্যাগ করিলেন।

দেশের সেবক কাহারা হইবে

রাত্রি দশটা তিন মিনিটে ট্রেণ কুমিল্লা পৌছিল। সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীটী একজন আত্মীয়কে দেখিবার জন্য এই ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন। কুমিল্লা হইতেছে জেলার সদর সহর। অনেক লোকই মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে এখানে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা নামিয়া গেলে ট্রেণ একেবারে ফাঁকা হইয়া গেল। শ্রীশ্রীবাবামণি কম্বল বিছাইয়া একটু ঘুমাইবার আয়োজন

* ১৯৪১ ইংরাজিতে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলিয়াছিল এবং ফ্রান্সের মার্শাল পেঁতা এই কারণটিকে দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।

করিতেছেন, এমন সময় একজন পূর্ণ বয়স্ক যুবক আসিয়া ট্রেণে চাপিল। সে প্রশ্ন সুরু করিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এখন আর প্রশ্নের জবাব দেবার ইচ্ছা নেই, সারাটা দিন ট্রেণে বসে বসে এসেছি, আর হাজার লোকের হাজার প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। এখন ঘুমোবো।

যুবক গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিল,—কেন ঘুমোবেন? ঘুমোবার আপনার কোন্ অধিকার? দেশ আজ পরাধীন, ইংরেজের বুটের তলায় আমাদের মান-সম্ভ্রম বিকুচ্ছে, আর আপনারা পড়ে পড়ে ঘুমোবেন? ঘুমোতে আমি দেব না। জোর ক'রে জাগিয়ে আমি রাখব। জলৌকার মতন সমাজের রক্ত শুষে খাচ্ছেন আর ঘুমোবার কত সখ। এসব সৌখিন সাধুদের দেশ থেকে আমরা তাড়িয়ে দিতে চাই। এদেশে এদের থাকতে কিছুতেই দিব না।

শ্রীশ্রীবাবামণি আস্তে আস্তে শয্যাতলে কাত হইয়া শুইলেন এবং বলিলেন,—বাছা হে, ভাল ভাল কাজ কত্তে চাও ত' যত ইচ্ছা কর। কারো তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। তবে সকলের আগে নিজের চরিত্রটীকে সংশোধিত কর। নিজে হও নির্লোভ, নিষ্কাম, নিষ্কলঙ্ক, নিজে হও অনবদ্য-চরিত্র, অপাপবিদ্ধ। নিজের ভিতরে চরিত্রের শৌর্য্যকে আগে জাগিয়ে তোল। অগঠিতচরিত্র ক্ষিপ্ত একদল যুবকের দ্বারা দেশের উদ্ধার-সাধন হবে, এমন কল্পনা বাতুলেই শোভে। মদ,

মেয়েমানুষ, জুয়া এই তিনটীকে একেবারে বুকের ধন প্রাণের মাণিক ক'রে ধ'রে রাখবে, আর তোমরা সবাই দেশোদ্ধার কর্ব্বে, এমন ধারণা আমার নেই।

যুবক যেন ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—সদলবলে প্রত্যেকে তোমরা চরিত্র-নিষ্ঠ হও। প্রত্যেকে তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, অপথে, কুপথে, বিপথে কদাচ পদচারণা কর্ব্বে না, দেশমাতৃকাকে অনাঘ্রাত-কুসুম-সম পবিত্র-সুন্দর জীবন কত্তে হবে উৎসর্গ। পাইখানার বিষ্ঠার হাঁড়ীতে যে ফুলটা প'ড়ে গেছে, সে সুন্দর হ'লেও দেশমাতৃকার পূজার অনুপযুক্ত, তাজা হ'লেও তার জন্ম বৃথা। আমি ত' দেশের পর দেশ ফুল খুঁজেই বেড়াচ্ছি,—সুন্দর ফুল, তাজা ফুল, অকলঙ্ক শুভ্র অমলিন ফুল। আমার মায়ের পূজা এমন ফুলেই হয়।

যুবকটী এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—বুঝতে পেরেছি, আপনি আমাকে আলাপ কত্তে দেবেন না। আপনি বাস্তবিকই অভদ্র।

শ্রীশ্রীবাবামণিও উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন,—আরে শোন, শোন। তুমি আসলে জানতে এসেছিলে, আমি লোকটা কে, কোথা থেকে কোথা যাচ্ছি, কয় দিন সেখানে থাক্‌ব। সব তোমাকে বলে দিচ্ছি, লিখে নাও। দেখো, তোমার রিপোর্ট যেন ভুল না হয়। আমি অমুক খানে যাচ্ছি, অত

ঘন্টা থাক্‌ব, তার পরেই আবার অমুক স্থানে। যে-কোনও জায়গায় গিয়ে আবার আমাকে প্রশ্ন কত্তে পার্ব্বে। তখন আমার ঘুমের এত প্রয়োজন থাক্‌বে না যে, তোমাকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিতে কুণ্ঠিত হব। তুমি কে, তা' আমি চিনেছি। তুমি আর যাই হও, দেশের সেবক যে নও, এটা ধ্রুব।

বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি শয্যাশ্রয় নিলেন।

পাথরঘাটা আশ্রম, চট্টগ্রাম
১০ই ফাল্গুন, শুক্রবার,১৩৪১
(২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ ইং)

পথ ও কষ্ট

পাথরঘাটা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নগেশ ব্রহ্মচারীজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—পথে কোনো কষ্ট হয় নাই তো স্বামীজী?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কষ্টেরই আর এক নাম পথ, পথেরই আর এক নাম কষ্ট। সুতরাং পথকষ্টের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে, পথে অনেক কৌতুক আছে, কৌতূহল আছে, আছে নিয়ত-ঘনায়মান-রহস্যের ধূম্রকুণ্ডলী, আছে নিরন্তর ছায়াছবি দর্শনের আমোদ ও প্রমোদ। পর্য্যটন এক অপূর্ব্ব শিক্ষাদাতা, যে নানা বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের দেয় সন্ধান আর আপাতরমণীয় ঐক্যের ভিতরে ফাটলের মুখগুলি সকলের

অগোচরে চোখের সামনে তুলে ধরে। দেখ্‌লাম, না শিখ্‌লাম। ভ্রমণ দেখার সুযোগ দেয়, ফলে শিখবার সুযোগও মিলে।

মানুষের সঙ্গ ও ঋণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগদ্‌ভরা যত মানুষ, সব যেন এক একটা ব্যাঙ্ক। এক এক জন যেন এক একটা বড় বড় মোটা মোটা টাকার থলি-বিশেষ। থলির সেলাই খোলার কৌশল জান্‌লে সকলের কাছ থেকেই মূল্যবান উপঢৌকন আদায় করা যায়। অথচ উপঢৌকন না ব'লে ঋণ বলাই ভাল। যার কাছ থেকে যা' পাব, তাকে তা' সুদ শুদ্ধ পরিশোধও ত' ক'রে দিতে হবে। তাকে হাতের নাগালে না পাই, তবে তার উত্তরাধিকারী এই বিশাল বিপুল মানব-সমাজকে তা' ফিরিয়ে দিতে হবে। কেউ চিরকাল বেঁচে থাকে না, সুতরাং তাকে তার জীবৎকালে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে না পার্লে তার স্থলাভিষিক্তদের হাতে কোনও না কোনও সময়ে এই ঋণের টাকা আর তার সঙ্গত সুদ ফিরিয়ে দিতেই হবে। সুতরাং মানুষের সঙ্গ ক'রে ক'রে নানা দিগ্‌দেশ ভ্রমণ ক'রে বেড়ানোর মধ্যেও দায়িত্ব আছে, উদ্বেগের কারণ আছে। যত দেখি, তত শিখি; যত শিখি, তত ঋণী হই; যত ঋণ বাড়ে, তত ঋণশোধের দায়িত্ব বাড়ে।

শ্রীমৎ নগেশ ব্রহ্মচারীজী বলিলেন,—আশ্চর্য্য কথা বল্‌ছেন!

মনুষ্য-জীবন একটা ব্যাপক ঋণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অঋণী মানুষের মত সুখী ত্রিজগতে কেউ নেই। কিন্তু অঋণী থাকাও ত' অসম্ভব। জন্মেছি মাতাপিতার করুণায়, তাঁদের দেহ, তাঁদের রক্তমাংসে, তাঁদের তেজোবীর্য্য, তাঁদের চিন্তাভাবনার রীতি, তাঁদের জীবনের বড় বড় প্রেরণা, তাঁদের ধ্যান ও ধারণা নিজ নিজ দেহে নিজ নিজ মনে বহন ক'রে বেড়াচ্ছি। এইগুলি কি ঋণ নয়? এ ঋণ অপরিশোধ্য কিন্তু পরিশোধের চেষ্টা কি তাই ব'লে বাদ দিতে হবে? আবির্ভূত হয়েছি একটা নির্দ্দিষ্ট সমাজের মধ্যে। এর চাইতে নিকৃষ্ট এক সমাজে আমার আবির্ভাব ঘটলে জীবন পঙ্গুতর, হীনতর, দুর্ব্বলতর হ'তে পার্ত। এই নির্দ্দিষ্ট একটা সমাজ আমাকে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, রুচিতে এবং আচার-বিচারে জগতের অনেক মানবের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে রেখেছে। এই সমাজের কাছে কি আমি ঋণী নই? এই ঋণ কি শোধ করার চেষ্টা আমাকে কত্তে হবে না? জন্মালাম, এটা একটা দৈব ঘটনা, মরে গেলাম, এটা একটা দৈব ঘটনা, কতক দিন বেঁচে রইলাম, কারো পানে না তাকিয়ে শুধু স্ফূর্ত্তি আর আমোদ ক'রে গেলাম। এইটুকুই কি জীবনের তাৎপর্য্য? নিশ্চয়ই নয়। মনুষ্যজীবন একটা ব্যাপক ঋণের বোঝা, এই বোঝা মানব-সমাজের কল্যাণ-সাধনের মধ্য দিয়েই হাল্‌কা কত্তে হবে।

ঋণের বোঝা হাল্কা করিবার জন্য উভয়েই খুশি হয়ে আশ্রমের উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং নানাস্থান হইতে আনীত এবং বিতরণীয় পেয়ারার কলম আর লেংড়া আমের কলমের পরিচর্য্যা করিতে লাগিয়া গেলেন। সারারাত্রির পথশ্রমের ক্লান্তি আর রৌদ্রের প্রখর কিরণ, উভয়েই দুই সুহৃদের রহস্যালাপে যেন বোকা বনিয়া গেল।

সাম্প্রদায়িকতার অবসানের উপায়

অপরাহ্ণে পাথরঘাটা আশ্রমে প্রচুর-জনসমাগম হইয়াছে। অধিকাংশই যুবক। একজন প্রশ্ন করিল—সাম্প্রদায়িকতার অবসান কি ক'রে হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আগে বুঝে নাও, সাম্প্রদায়িকতা কাকে বলে এবং তার স্বরূপ কি। তারপরে চিন্তা কর্ব্বে যে, এর প্রতীকার কি! এই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি কি কারণে সম্ভব হ'ল, তারও মূলানুসন্ধান কত্তে হবে। একজন নিজের ধর্ম্মগুরুর উপদেশানুযায়ী ঈশ্বর-সাধনে নিষ্ঠাবান্ এবং তদুচিত আচার-আচরণকে জীবনের অবলম্বন করেছে, এমন লোককে তুমি সাম্প্রদায়িক বলতে পার না। কেউ যদি মনে করে যে, জগতে তার মত এবং তার পথই একমাত্র সত্য মত ও সত্য পথ এবং জগতের অন্য মতাবলম্বীরা তার ঘৃণার বা বিদ্বেষের পাত্র, তবে তার

মনোভাবকেই তুমি সাম্প্রদায়িকতা ব'লে দূষ্য জ্ঞান কত্তে পার। ঈশ্বরানুরাগী সাধক যদি নিজের মতকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করেন, তবে তাঁর নিজ সাধনে নিষ্ঠা থাক্‌তে পারে না। কিন্তু তাঁর গৃহীত মত ও পথ ছাড়া আর সব পথ ভ্রান্ত এবং কেউ অন্য পথ আশ্রয় কর্ল্লে তাকে বিদ্বেষ করা সঙ্গত, এরূপ মনোভঙ্গী যদি কারো থাকে, তবে তাকে সাম্প্রদায়িক বলা চলে। অতএব, পরমতে সহিষ্ণুতার অনুশীলন বৃদ্ধিই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার প্রতীকারের পন্থা। ধর্ম্মমতের পার্থক্যের কারণে কাউকে হেয় জ্ঞান করা উচিত নয়, শত্রু ভাবাও সঙ্গত নয়। বিশাল এই ধরিত্রীতে নানা যুগে নানা দেশে নানা রকমের ধর্ম্মমতের উদ্ভব, প্রসার ও বিলয় হ'তেই থাক্‌বে। এটা পরমেশ্বরের এক বিচিত্র লীলা। এই বিচিত্রতাকে কবির দৃষ্টিতে দেখা চাই, তা' হ'লেই আর সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প নিঃশ্বাসে টানতে হবে না।

ধর্ম্মান্ধতার পরিণাম

প্রশ্নকর্ত্তা।—আপনি বহুবার বলেছেন যে, হিন্দু-মুসলমানে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বেশ কিছুকাল ধ'রে দেখা দিয়েছে, এর জন্য দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঠিকই বলেছি। বর্ত্তমান হিংসা-বিদ্বেষের ভাব বাড়্‌তে বাড়্‌তে এমন সব রোমহর্ষক দুর্ঘটনার সৃষ্টি হবে যে, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সদাচার,

সুবিচার, শান্তি ও সুস্থিরতা সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গিয়ে একটা উল্কাপিণ্ডের মতন জ্বলতে জ্বলতে দেশটা মানবজাতির ইতিহাসের বুকে আছড়ে পড়বে। দেশটা খণ্ড খণ্ড হ'য়ে লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যাবে। কত উচ্চ নীচ হ'য়ে যাবে, কত নীচ হঠাৎ মাটি ছেড়ে মেঘলোকে উঠবে, কত রক্তে, কত অশ্রুতে, কত আর্ত্তনাদে ধরণী ভ'রে যাবে। হারাতে হারাতে মানুষ তার সবকিছু প্রিয়বস্তু হারাবে কিন্তু একটী জিনিষ সে লাভ কর্ব্বে, তা' হচ্ছে এই জ্ঞান যে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ ক'রে কদাচ কেউ সুখী হ'তে পারে না।

ধর্ম্ম ও রাজনীতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্ম যখন রাজনৈতিক হাতিয়ার-রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন মানুষের আচরণ থেকে প্রকৃত ধর্ম্ম নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়। এজন্যই আমরা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে রাজনীতি করাকে পাপ মনে করি।

বিপ্লব ও ইতিহাস

কথায় কথায় চট্টগ্রামের যুবক-সম্প্রদায়ের নানাবিধ কার্য্যকলাপের প্রসঙ্গ উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্রবান্ যুবকসমাজের জাগরণ জাতির পক্ষে পরম সৌভাগ্যের দ্যোতক। কিন্তু জাতি যখন জাগে, তখন হিসাব ক'রে জাগে না। কি কাজ

ধরলে কাজ শেষ পর্য্যন্ত কতটুকু পর্য্যন্ত গড়াবে, তা' অনুমান করা সম্ভব হয় না। কি কাজ করলে তার অনুকূল ও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া কি ভাবে কতটুকু মাথা চাড়া দেবে, তা' ধারণায় আনা যায় না। প্রবল আশাবাদ ও গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ সুরু কর্ত্তে হয় এবং ফলাফল যাই হোক্, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাতে লেগে থাক্‌তে হয়। কখনো কখনো একজনের মৃত্যুতে দশ জনের ভিতরে মরণ-বরণের উন্মাদনা জাগে, কখনো কখনো চারিদিকে মৃত্যু বিভীষিকা দেখে নিজের একক জীবনটুকুকে বাঁচাবার জন্য অসঙ্গত আগ্রহের অত্যধিক ভিড় বেড়ে যায়। একদিকে মরবার চেষ্টায় কাড়াকাড়ি, আর এক দিকে বাঁচবার চেষ্টার বাড়াবাড়ি লেগে যায়। এই হুজুগের মাঝখানে যেটা গেল জিতে, সেটাই জাতির ভাগ্য-নির্দ্ধারণ ক'রে দিল। এরই নাম বিপ্লব, এরই নাম ইতিহাস।

বিপ্লবের মূর্ত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিপ্লবের ফল সুদূরপ্রসারী। শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে, সমাজনীতিতে, জীবন-যাপন-রীতিতে, চিন্তায় এবং কর্ম্মে বিপ্লবের স্বভাব সুদূরপ্রসারী। প্রথম প্রথম শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতাদির মধ্য দিয়েই বিপ্লবের সুরু হয়, পরিণত অবস্থায় বিপ্লব এদের প্রত্যেককে নবজীবন দেয়, নূতন রূপ দেয়, নূতন তাৎপর্য্য দেয়। বিপ্লব একটা আশ্চর্য্য জিনিষ, যা' সব-

কিছুকে স্বীকার করে, আবার সব-কিছুকে অস্বীকারও করে। জাতির শিরোদেশ থেকে পদনখাগ্র পর্য্যন্ত এমন কিছু নেই, যার সহায়তা বিপ্লব গ্রহণ করে না কিন্তু এমন কিছুও নাই, যাকে বিপ্লব স্বস্থানচ্যুত করে না এবং সব কিছু লণ্ডভণ্ড ক'রে দেয় না। বিপ্লবের এই সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বনাশা মূর্ত্তি দেখে ধীর স্থির বুদ্ধির লোকদের হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হ'য়ে যায়। কিন্তু বিপ্লব যখন আসে, তখন আসেই আসে, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, না পারে রাষ্ট্র, না পারে সমাজ, না পারে শাস্ত্র। সবকিছু বিপ্লাবিত ক'রে ডুবিয়ে দেয় বলেই তার নাম বিপ্লব।

হুজুগ বা উচ্ছ্বাস নহে, চাই চরিত্র

অপর একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন ভ্রান্ত ধারণাকে মনের অতি নিভৃত একটী অনাদৃত কোণেও কদাচ ঠাঁই দিও না যে, একটা জাতির উন্নতি কেবল উচ্ছ্বাসে, কেবল সলা-পরামর্শে, কেবল ঔদ্ধত্যে, কেবল ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা দিয়ে সাধিত হ'তে পারে। ঔদ্ধত্য কখনো কখনো সাহসের সমার্থবাচক হয়, ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা কখনো কখনো কৌশলদক্ষতা ব'লে পরিপূজিত হয় কিন্তু এরা প্রকৃত উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার পক্ষে কখনো কখনো গৌণসহায় মাত্র এবং অধিকাংশ সময়ে বিঘ্নস্বরূপ। যে জিনিষটীর

প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে, তার এক পিঠে আছে চরিত্রবল, অন্য পিঠে আছে ঐক্যবল। চরিত্রবলই আসল বল, ঐক্যবল তার পরের বল। হুজুগের বল বলই নয় বরং নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টিকারক ব'লে হুজুগ অনেক সময়ে ভাবী দুর্ব্বলতার মরণ-গুহা সব সৃষ্টি ক'রে বেড়াতে থাকে। মনের হঠাৎ-আবেগে হুট্ ক'রে একটা দুঃসাহসিক কাজ অনেক দুর্ব্বল লোকও কত্তে পারে কিন্তু সে কাজের প্রতিক্রিয়া কাজের মূল সদুদ্দেশ্যকে অনেক সময়ে উৎখাত ক'রে দেয়।

চরিত্র কাহাকে বলে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা সুনির্দ্দিষ্ট মহৎ কাজ নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে সুদীর্ঘকাল, অবিরাম, অবিশ্রাম ক'রে যাওয়ার রুচি, ধৈর্য্য, সাহস ও সামর্থ্যের নাম চরিত্র। কথায় কথায় মত-পরিবর্ত্তন চরিত্রের লক্ষণ নয়। লোকলজ্জা বা শাসনের ভয় বশতঃ নিজের কর্ত্তব্য ছেড়ে দেওয়ার নাম চরিত্রবত্তা নয়। নিজের চিন্তা ও আচরণের ত্রুটীকে ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে দেখে যাওয়া চরিত্রবত্তার প্রধান লক্ষণ। চরিত্রের প্রথম কথা আত্মবিশ্বাস। তুমি যে বড় কাজ কত্তে পার, তুমি যে ছোট কাজ করার জন্য, নীচ কাজ করার জন্য, লজ্জাকর জঘন্য স্বার্থপরতা-দুষ্ট তুচ্ছ কাজ করার জন্য জগতে আবির্ভূত হও নি, এই কথাটী অকপটে বিশ্বাস করা হ'ল চরিত্রের গোড়ার কথা। একথা বিশ্বাস করার পথে যারা তোমার

সহায়ক, জগতে তারাই তোমার সত্যিকারের বন্ধু। রাজ্যাভিষেক আর ফাঁসীর মঞ্চারোহণ যার দৃষ্টিতে সমান, আমার মতে সে-ই হচ্ছে চরিত্রবান্ পুরুষ। দেশসেবা দেশসেবা ব'লে সবাই অত চেঁচাচ্ছ ত', দেখো তোমাদের হাতে সম্পদ এলে, সুযোগ এলে, দুর্নীতির দুয়ার অবারিত নিরঙ্কুশ নিরর্গল হ'লে তোমরা নিজেদের কতটা সামলে নিতে পার। ঘুষের টাকায় যার লোভ নেই, আত্মীয় প্রতিপালনের জন্য দেশের টাকার অপব্যবহার কত্তে যে অক্ষম, অনুরোধে উপরোধে প'ড়েও যে কিছুতেই ঢেঁকী গিলবে না, সে চরিত্রবান্।

চরিত্র ও অহমিকা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্রবানেরা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন জগতে অসাধারণ ঘটনা সব ঘটতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, চরিত্রবান্‌দের ব্যক্তিগত অহমিকা অন্য চরিত্রবান্‌দের সঙ্গে মনে প্রাণে মিলিত হবার পথে যখন কাঁটার মত ক্ষত উৎপাদন করে, তখন এঁদের প্রত্যেককে একলা একলা নিজের পথে চলতে হয়। এই জন্য জগতে বহু চরিত্রবান্ পুরুষ, জগতে যা' ক'রে যাবার, তা' ক'রে যেতে পারেন নি। নিজের উদ্ধত অহংকে কমাতে না পার্লে এক চরিত্রবান্ পুরুষ অপর এক চরিত্রবান্ পুরুষের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে কাজ কত্তে পারেন না। অথচ দুজনে মিলিত হ'য়ে কাজ কর্লে তিন জনের কাজ এঁরা অনায়াসে সম্পাদন

কত্তে পারেন। অহমিকা মানুষকে মানুষের সঙ্গে মিলতে দেয় না। অথচ এই প্রলোভন-সঙ্কুল বিশাল পৃথিবীর দুর্গম অরণ্যে অহমিকা না থাকলে নিজ চরিত্র রক্ষা ক'রে চলাও প্রায় অসম্ভব।

স্বার্থের জন্য একতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্রহীনেরা কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিলে যেতে পারে, যদি তাদের স্বার্থ-বস্তুটী এক হয়। স্বার্থের একত্ব দিয়ে তারা মিলিত হয়, আদর্শের একত্ব দিয়ে নয়। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের মধ্যে যত মেলামেশা, আপোষ-রফা, প্যাক্ট ও ভালবাসা দেখ্‌ছ, সবকিছুর উৎপত্তিস্থল স্বার্থ। স্বার্থের দিকে তাকিয়ে উত্তর-শিয়রী লোকটা দক্ষিণ-শিয়রী লোকটীর সঙ্গে অনায়াসে কোলাকুলি কচ্ছে। এই মিতালি ক্ষণিকের এবং এই মিতালি ভেঙ্গে যেতেও খুব বড় কোনও উপলক্ষ্যের প্রয়োজন হবে না। স্বার্থ আদায় হ'য়ে গেল ত' মিতালিও চুকে গেল। ধার্ম্মিক ব'লে আমরা যাঁদেরকে উচ্চ সম্মান দিচ্ছি, তাঁরা অনেকে তাঁদের রাজনৈতিক জীবনে এই রকম শত শত ভুল করেন, যে ভুলের জন্য সমগ্র জাতি, ভবিষ্যতে করে অনুতাপ, অশ্রুপাত আর শিরে বক্ষে করাঘাত। স্বার্থের জন্য একতা একতাই নয়, ওটা পারস্পরিক ধাপ্পা মাত্র। আদর্শকে এক করা চাই এবং আদর্শের জন্য একতাকে সম্ভব করা চাই। তবেই ঐক্য চিরস্থায়ী হবে। নতুবা

এই ঐক্য ত' একটা কাচের গ্লাস মাত্র, চুমুক দিয়ে সরবৎটুকু গিলে ফেলার পরে কোনও প্রকারে হাত থেকে খসে পড়লেই শত খণ্ডে চূর্ণ।

দুশ্চরিত্রের ঐক্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুশ্চরিত্রেরা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন জগতের আর দুঃখের অন্ত থাকে না। দোহাইটা তারা স্বাদেশিকতারও দিতে পারে, ধর্ম্মেরও দিতে পারে, পতাকা তারা উন্নত আদর্শের বা নূতন সমাজব্যবস্থারও ধারণ কত্তে পারে, কিন্তু তারা যদি চরিত্রহীন হয়, তবে তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের ঐক্য জগতের অশেষ অকুশল সম্পাদন করে। লক্ষ লক্ষ নরনারীর অকালমৃত্যু তখন তাদের করে উল্লাস উৎপাদন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, বলাৎকার, নিষ্ঠুরতা তখন হয় তাদের গর্ব্বের সামগ্রী, মুখে আধো বুলি ফোটেনি, কুসুমসম কোমল, এমন শিশুকে মাতৃবক্ষ থেকে কেড়ে নিয়ে জলন্ত বহ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ হয় তাদের আমোদ-প্রমোদ, নারীকে শত জনে চরম অপমান ক'রে মেরে ফেলেও তাদের শখ মিটে না; উলঙ্গ ঐ দেহগুলিকে বর্ষায় বিদ্ধ ক'রে নগর-প্রাকারে থরে থরে সাজিয়ে দেওয়া হয় তখন এক বাহাদুরী। দুর্ব্বৃত্তদিগকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে জগতে অনেক শক্তিমান পুরুষ বিশ্বব্যাপী অরাজকতার সৃষ্টি ক'রে গেছেন কিন্তু হায়, চরিত্রবান্‌দিগকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় কেউ মন দেন নি।

আদর্শবাদীদের ঐক্য চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আদর্শ-বাদের দিক দিয়ে যাঁরা অতীব উচ্চে অবস্থিত, তাঁদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন শক্ত কাজও বটে। কারণ, এই সকল আদর্শ-বাদী সৎ লোকেরা স্ব স্ব স্বাধীন চিন্তায় দীপ্যমান। এঁরা কারো কর্ত্তৃত্ব, নেতৃত্ব, নির্দ্দেশ বা অনুশাসনকে গ্রাহ্যও করেন না, নিজেরা যা' বুঝেছেন, তাই নিয়ে নিজেদের ঠাকুরঘর-খানাতে ব'সে দুনিয়ার সকলকে অস্পৃশ্য আর অপাংক্তেয় ব'লে নাসিকা-কুঞ্চন কর্ব্বেন। এমন হতভাগারা যুগ যুগ ধ'রে কেবল লাথি, ঝাঁটা আর মার খাবে, এতে আশ্চর্য্যের কি আছে? বাঁচতে হ'লে এ জগতে সবাই বাঁচবে সংগ্রাম ক'রে, আর সংগ্রাম কত্তে হ'লেই চাই ঐক্য,—অনড়, নিবিড়, অটুট ঐক্য। অহংকারের উপাসকের পক্ষে ঐক্য লাভ কি ক'রে সম্ভব? সুতরাং অহঙ্কার কমাতে হবে, মিলনের পথ সুগম কত্তে হবে। এটা রাজনৈতিক সমস্যা নয়, সামরিক সমস্যাও নয়, এমনকি সামাজিক সমস্যাও এটা নয়। এটা নিছক নৈতিক সমস্যা বা চারিত্রিক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদিগকে প্রত্যেকটী ব্যক্তির কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'তে হবে। আন্দোলন বা অবদানের দ্বারা এ কাজটী হবে না, কাজটী কত্তে হবে সরস প্রাণের প্রবল আকর্ষণের দ্বারা। এজন্যই আমি সর্ব্বদা বল্‌ছি,—শিষ্য চাই না, সাধক চাই।

নিষ্ঠা চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এজন্য আমাদের একলক্ষ্য হ'তে হবে, হ'তে হবে একনিষ্ঠ। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হাতুড়ি ঠুকলে পেরেক বসবে না, একটী নির্দ্দিষ্ট পেরেকের মাথাতেই বারংবার ঠুকতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘর্ষণ করলে তাতেও তাপ উৎপন্ন হবে না, একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবিরাম ঘর্ষণ চালাতে হবে। একই উদ্দেশ্যে একই কর্ম্মে অবিরাম লেগে থাকার নাম নিষ্ঠা; মন বহুমুখী হ'লে সেই মনের দ্বারা কোনও মহতী সংসিদ্ধি অর্জ্জন সম্ভব নয়। আমি যে তোমাদিগকে সাধন-ভজনে মনোনিবেশ কত্তে এত ক'রে বলি, তার ত' আসল কারণ এইটি। নিজ মনের উপরে কর্ত্তৃত্ব এলে তবে ত' তুমি অন্যের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার কত্তে সমর্থ হবে।

ভাবী কর্ম্মীর প্রতীক্ষা

আর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন অনেক সৎকার্য্যই আমরা ধরি, যা' আর শেষ পর্য্যন্ত সমাপ্ত কত্তে পারি না। শ্রম কম দিয়েছি ব'লে নয়, কেবল দীর্ঘতর পরমায়ু পাই নি বলেই পারি না। এই না-পারায় মনে আফশোষ থাকতে পারে কিন্তু অপরাধ নেই। আমি আমার একার পরমায়ুতে যে কাজটা শেষ কত্তে পাল্লুম না,

সেই কাজটা আমার পরেই ধরার জন্য যদি যোগ্য মানুষ কেউ এসে যায়, তবে আর আফশোষের কিছু থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরের যোগ্য মানুষটীকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে পেয়েও গেলেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী পরবর্ত্তী লোকটীকে পাবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন না, কিন্তু তাকে পাওয়ার তাঁর প্রয়োজন ছিল। বিভূতি-প্রদর্শনকারী একজন হঠযোগীর মত তুচ্ছ ব্যক্তি লোকনাথ ব্রহ্মচারীজী ছিলেন না, বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ছিল তাঁর আসল পুঁজি। এই ব্রহ্মজ্ঞানকে মানুষের আভ্যন্তর উপলব্ধিতে আর বৈষয়িক জীবনে যুগপৎ রূপায়িত ক'রে সমগ্র জগৎকে বিস্ময়ে পুলকিত ক'রে দেবার জন্য তাঁর সত্যই একজন পরবর্ত্তীর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই পরবর্ত্তী আর এলেন না। ফলে মধ্যাহ্ন-ভাস্করের মতন দেদীপ্যমান লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ছবিখানা কয়েকটী আশ্রমে বা মন্দিরে পূজার ঘরেই রয়ে গেল, তাঁর জীবনের ঋদ্ধি সর্ব্বসাধারণ্যে প্রতিফলিত হ'ল না। আমার সাধনাও সুদীর্ঘ পথের এক বিরল পথিক। আমার পরমায়ুতে এই পথটুকু ফুরোবে না। কিন্তু কে এসে এই সাধনাকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের হিতে কার্য্যকর ক'রে তুলবে, তার দেখা আজও আমি পাইনি। তার দেখা পাওয়ার জন্য আমি সত্যই ব্যাকুল। কিন্তু এখন যারা আমার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা নানা দিক্ দিয়ে এত অগঠিত আর কৌলিক

উপাদানের দিক্ দিয়ে এত নিঃস্ব যে, এদের পিছনে শুধু শিক্ষাদানের শক্তিকে নিঃশেষিত কর্লেই এরা কাজের যোগ্য হ'য়ে উঠ্‌বে না। এরা ত' ছুতানাতা ক'রে একজনের পর একজন আশ্রম ত্যাগ কর্ব্বে এবং আশ্রমের বাইরে গিয়ে কেউ বলবে, "আমাকে পেট ভ'রে খেতে দিত না", কেউ বল্‌বে, "দূর, ওটা আবার একটা আশ্রম নাকি, একটা আস্তাকুঁড় মাত্র," কেউ বল্‌বে,—"আমার হাতে ক্যাশ-বাক্‌সটা তুলে দেওয়া হ'ল না, এত অবিশ্বাস। ওখানে থাক্‌ব কেন" কেউ বল্‌বে,—"আমার মত বুদ্ধিমানের কোনো কদরই হ'ল না, আচ্ছা, আমার ক্ষেত্র আমি নিজেই বেছে নেব," কেউ বল্‌বে,—"আমার উপরে আবার আর একজন কর্ত্তা বসিয়ে দেওয়া হ'ল কেন? এমন অপমান সহ্য করা যায় না," কেউ বল্‌বে—"আশ্রমে ব'সে আশ্রমের ধান-চাউল দিয়েই আমি গোপনে গ্রামের লোকের সঙ্গে সাত আট বৎসর ব্যবসা ক'রে বেশ কিছু মেরে নিয়েছি, ধরা পড়ার আগেই কাউকে কিছু না ব'লে সরে যাওয়াই ত' ভাল," কেউ বল্‌বে,—"আশ্রমে গিয়েছি বলেই আমি দাসখৎ দিয়েছি নাকি? অমুক তমুক স্থানের অমুক তমুক মেয়েদের কাছে আমি প্রেমপত্র লিখি ব'লেই কি দোষ হ'য়ে গেল? আমার স্বাধীনতায় যারা হস্তক্ষেপ করে, তাদের আশ্রমে আমি থাকি না।" এভাবে একটার পর একটা ক'রে অবাস্তব ও আজগুবি অভিযোগ

ক'রে একজনের পর একজন ক'রে সবাই চলে যাবে, তবু আমি তার প্রতীক্ষায় কালহরণ কচ্ছি, আমি যেখানটায় ফুলষ্টপ দিব, ঠিক সেইখানটায় যে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে আমার অসমাপ্ত মহাকাব্যখানা রচনার কাজ পুনরায় সুরু ক'রে দেবে।

অহিংসা, নিরামিষ ও জাতীয় দুর্ব্বলতা

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভারতবর্ষ অহিংসা অহিংসা বল্‌তে পাগল। এদেশের অধিকাংশ লোক নিরামিষাশী। বুদ্ধ, জিন-মহাবীর, শ্রীচৈতন্য আদি কেবল প্রেম আর দয়ার বাণী ছড়িয়েছেন। এরই ফলে ভারতবর্ষ ক্ষাত্রশক্তিতে দুর্ব্বল হয়েছে, বড় বড় যুদ্ধে বিদেশীর কাছে হেরেছে আর চিরপদানত ক্রীতদাস হ'য়ে জগতে ধিক্কার অর্জ্জন করেছে। শাক্তেরা বা তান্ত্রিকেরা যে পশুবলি দেয়, তাতে তাদের মনে একটা সাহস জাগে। শাক্তেরা যে পশুমাংস খায়, এতে তাদের দেহে বল বাড়ে। কিন্তু ভারতের যাবতীয় ধর্ম্ম-প্রচারক—"নিরামিষ খাও, নিরামিষ খাও" ব'লে রব তুলে জাতিটাকে পঙ্গু, দুর্ব্বল এবং কাপুরুষ ক'রে রেখেছে।—এসব বিষয়ে আপনার মতামত কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এসব বিষয়ে মতামত দেবার যোগ্য ব্যক্তি আমি নই, কারণ, ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের

সবটুকু আমি জানি না। তবে একজন জার্ম্মাণ সেনাপতির কথা জানি, যিনি একটী নামী রেজিমেন্টের সৈন্যদের আচরণে বীরত্বের অভাব দেখে তাদের খাদ্য-তালিকা অনুসন্ধান করেছিলেন এবং প্রোটিনজাতীয় খাদ্য কমতি দেখে তার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে আশানুরূপ ফল পেয়েছিলেন। ওদেশে প্রোটিন বলতে ছানা না বুঝে মাংসটাই বেশী বুঝা যায়। আর ওরা নিদারুণ মাংসাশীও বটে। সেই তুলনায় ভারতীয় সৈন্যেরা মাংস একরূপ খায়ই না বলতে হবে। কিন্তু জগতের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্যেরা ইংরাজ, ফরাসী বা জার্ম্মাণ সৈন্যের চেয়ে কম যোগ্যতা প্রদর্শন করে নি। সুতরাং আমিষ খাদ্য না খেলে দেশ জাহান্নমে যাবে, এমন ধারণার আমি সমর্থন কত্তে পারি না। যুদ্ধে জিততে হ'লে দেশের মধ্যে চাই ঐক্যবোধ, সৈনিকদের চাই যথোপযুক্ত শিক্ষা এবং তৎকালোচিত আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র, আর চাই সেনাধক্ষ্যদের রণ-বাহিণী পরিচালনে যোগ্যতা, চাতুর্য্য ও দক্ষতা। অহিংসার ভাব মনের দয়াবৃত্তি থেকে উদ্ভূত। এটা সভ্যতার একটা উচ্চ স্তরের অবস্থা। দয়াহীন নিষ্ঠুর অসুরগুলির চেয়ে সদয়-হৃদয় প্রেমকোমলমনা একজন সন্ত সহস্র গুণে উন্নত। অহিংসার জন্য ভারত পরাধীন হয় নাই, পরাধীন হয়েছে ঐক্যের অভাবে। নিরামিষ ভোজনের জন্য ভারত দুর্ব্বল হয় নাই, দুর্ব্বল হয়েছে শত শত বর্ষব্যাপী লুণ্ঠনে আর শোষণে।

সঙ্ঘের প্রাণ

অতীব কুণ্ঠিত ভাবে একটী যুবক আসিয়া নিকটে বসিল এবং বলিল,—আমরা একটী ছোট্ট সমিতি স্থাপন করেছি। কি ক'রে সমিতিটীকে গ'ড়ে তুলব, সেই বিষয়ে কিছু উপদেশ দিন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের সঙ্ঘ ছোট ব'লে তোমরা কুণ্ঠিত হ'য়ো না। তোমাদের সঙ্ঘ যেন খাঁটি হয়। "সঙ্ঘ" এবং "খাঁটি" এই দুইটী কথাকেই ভাল ভাবে বুঝে নিও। উদ্দেশ্য যেন তোমাদের হয় মহৎ। তোমাদের সঙ্ঘের নামটি খুব সুন্দর, তোমাদের সাফল্যের পক্ষে এটাই একটা যুক্তি হ'তে পারে না। তোমাদের সঙ্ঘ বড় রাস্তার উপরে অফিস খুলছে, এটা অতি তুচ্ছ কথা। তোমাদের সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক অমুক লক্ষপতি আর তমুক কোটিপতি, এর উপরে সঙ্ঘের সাফল্য নির্ভর করে না। সঙ্ঘের সফলতা নির্ভর করে তোমাদের চরিত্রবলের উপরে। তোমাদের ত্যাগ, তোমাদের সংযম, তোমাদের সততা এবং সর্ব্বোপরি তোমাদের ধারাবাহিক প্রযত্নে কাজে লেগে থাকবার অতুল নিষ্ঠাই তোমাদের সঙ্ঘকে সাফল্যদান কর্ব্বে। সফল সঙ্ঘের প্রাণ চরিত্র, সততা এবং নিষ্ঠা।

পাথরঘাটা আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রচুর দ্বারভাঙ্গার ল্যাংড়া আমের এবং কাশীর পেয়ারার কলম মজুদ করিয়া রাখিয়াছেন। পূজনীয় শ্রীমৎ নগেশ ব্রহ্মচারী মহাশয় তাহা

যথোপযুক্ত সময়ে পাত্র বুঝিয়া বিতরণ করিবেন। কিছু ইতঃপূর্ব্বে বিতরিতও হইয়াছে। জনৈক আশ্রম-সেবক শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট হইতে জানিয়া নিতেছেন যে, কোন্ গাছটার যত্ন কি, কোন্ সার দিতে হয়, কেমন মাটিতে কোন্ গাছ ভাল জন্মে।

গুরুগৃহ ও কলমী চারা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আম যে কত রকমের আছে, বল্‌বার নয়, একটা নির্দ্দিষ্ট আম গাছের সবগুলি ফল সুপক্ক ক'রে নিয়ে তারপরে যদি বীজগুলি উপযুক্ত স্থানে লাগান যায়, তাহ'লে আট দশ বৎসরের মধ্যেই দেখা যাবে যে, বীজু চারার গাছগুলিতে এক একটাতে এক এক রকমের ফল ধরেছে। কোনটার ফল বর্ণে উজ্জ্বলতর, কোনটার শাঁস অন্যগুলির চেয়ে কম বা বেশী, কোনোটার বীজ অন্যগুলির চেয়ে ছোট বা বড়, কোনটার স্বাদ অন্যগুলির চেয়ে মধুরতর বা অম্লতর, কোনোটার গন্ধ অন্যগুলির চেয়ে উগ্রতর বা মধুরতর। সুতরাং এক বৃক্ষ থেকে যে বীজগুলি পেলাম, তাদের দ্বারা সৃষ্ট নূতন বৃক্ষগুলির ফল সব একই রকম হ'ল না। অথচ মানুষ চায় যে, একটা নির্দ্দিষ্ট রকমের ফল যেন শত শত সহস্র সহস্র বৃক্ষে হ'তে পারে। এজন্য জগতে কলম-কাটা বিদ্যার সৃষ্টি হ'ল। বিশ্বনাথ মুখুজ্যে এমন এক গাছ সৃষ্টি কর্ল্লেন যার ডালে কলম বাঁধলে বিশ্বনাথ নামের

আমই হবে, অন্য ঢংয়ের আম হবে না। ল্যাংড়া মুখুজ্যে আবার এমন এক গাছ সৃষ্টি কর্ল্লেন বা বেছে নিলেন, যার ডালে কলম বাঁধলে ল্যাংড়া নামের আমই হবে, অন্য আম হবে না। আগেকার গুরুগৃহে যে লোকে ছেলেদের পাঠাত, সেটাও কতকটা এই জাতির, জান্‌বে। যে চারাটী বীজ থেকে জন্মাল, সেটা কিন্তু মধুসূদন পূততুণ্ডীর ছেলে, কিন্তু শিক্ষার্জ্জন কত্তে গেল শাণ্ডিল্য ঋষির ঘরে, শাণ্ডিল্য-ঋষির জীবনের সাধনা ও তপস্যাকে সে তার জীবনের মধ্যে রূপদান কর্ল্ল, তপস্বীর অসমাপ্ত সিদ্ধিকে জগতে সিদ্ধিমন্ত ক'রে তবে ছাড়্‌ল, কিন্তু দেহটার প্রাণশক্তি এল মধুসূদন পূততুণ্ডীর কাছ থেকে। মধুসূদন যদি নিজে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি হতেন, তবে নিজ পুত্রকে নিজেই শিক্ষা দিয়ে নিজের সাধনাকে তার মধ্যে রূপবন্ত ক'রে দিতে পাত্তেন। এভাবে দেখ্‌তে গেলে প্রাচীন গুরুগৃহের শিক্ষা যেন বীজু আমের চারাকে কলমী চারায় পরিণত করা।

সন্তানের জন্মদান এক মহাযজ্ঞ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এভাবে পিতার জন্মদানের চেয়েও গুরুর বিদ্যাদানকে অধিকতর প্রাধান্যপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জন্মদান একটা তুচ্ছ কাজ নয়। দেহের সাহায্যে পিতা জন্মদান করেন, এটা সত্য কিন্তু আসল জন্মদান ত' মনের ক্রিয়া। যে মানসিক চর্চ্চা নিয়ে বলবন্ত হ'য়ে পিতা পত্নীগর্ভে সন্তানের জন্মকে সম্ভব কর্ব্বেন, সেই মানসিক

চর্চাটার মূল্য জগতে খুবই বেশী, যদিও এই মূল্য জগতে আবার খুব কম লোকেই দিতে প্রস্তুত। তুমি কি আজীবন সংসঙ্কল্পের সাধনা ক'রে এসেছ? তুমি কি আমরণ সেই সংসঙ্কল্পের অনুশীলন কেবল ক'রেই যাবে? যদি তাই হয়, তবে তোমার চিন্তা তোমার দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুকে নূতন ক'রে গড়্‌তে থাক্‌বে। তার ফলে তোমার বীজ ক্রমশঃ দোষমুক্ত অসম্পূর্ণতাহীন ও পূর্ণতামণ্ডিত হবে। তার ফলে তুমি নূতন মানব-গোষ্ঠীর, নূতন মানব-জাতির সৃষ্টি-বিধাতা হবে। তোমাকে দিয়ে মানবজাতির এক নবদিব্যায়ন ঘটবে। তোমার বংশের প্রতিটি নব-জাতকের চরণ-চিহ্নে কেবলই ফুটে উঠতে থাকবে সিদ্ধিলক্ষ্মীর প্রসন্নতার স্বাক্ষর। এজন্যই প্রাচীন ঋষির দৃষ্টিতে পতিপত্নীর দৈহিক মিলন একটা কামজ আনন্দের অনুশীলন নয়, একটা মহাযোগের অভ্যাস, যেই যোগের প্রত্যক্ষ ফল সর্ব্বগুণান্বিত শক্তিমান্ পুত্রকন্যার জন্ম, আর যার পরোক্ষ সুফল সমগ্র জগতের পরম কুশল। এজন্যই সন্তানের জন্মদান প্রাচীনের শুদ্ধ দৃষ্টিতে একটা মহাযজ্ঞের সমান।

নিজ ব্রত-সাধনে অবিচল থাক

অপর একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার অন্তরঙ্গ আপন জনেরা তোমার কাজে বাধা দিচ্ছে এবং তোমার শুভাভিপ্রায়ের বিকৃত ব্যাখ্যা ক'রে ক'রে

তোমার লোকপ্রিয়তা কমাবার চেষ্টা কচ্ছে ব'লে তুমি তোমার কর্ত্তব্য কাজ ছেড়ে দেবে? কখ্‌খনো না। বাধাদানকারীদিগকে বাধা দিতে দাও, তারা তাদের সাধ্যমত যে যতটুকু বিঘ্ন সৃষ্টি করার, করুক কিন্তু তুমি তোমার নিজ ব্রতে, নিজ সঙ্কল্পসাধনে, নিজলক্ষ্যপথে সুস্থির ও অবিচল থাক।

ব্রহ্মচর্য্য ও স্বাবলম্বন

যুবক বলিল,—কিন্তু বাধা যে প্রচুর।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাধা যতই বিশাল হউক, তোমাকে তোমার কাজ কর্ত্তেই হবে। বাধাকে বন্ধু ব'লে জ্ঞান কর, বাধাকে বক্ষে আলিঙ্গন ক'রে ধ'রে তার গা বেয়ে তুঙ্গে উঠে যাও। ভয়ভীতি-দুর্ব্বলতা মন থেকে দূর ক'রে দাও। বাধাবিঘ্ন যখন যত বেশী দেখ্‌বে, ব্রহ্মচর্য্যের উপরে তখন তত বেশী খরদৃষ্টি হবে। ব্রহ্মচর্য্য যে মহাশক্তির মূল উৎস, এই কথাটী নিমেষের জন্যও ভুল ক'রো না। আমি জীবন ভ'রে মানুষকে খুব অনেকগুলি উপদেশ দেই নাই বা দিবার প্রয়োজন বোধ করি না। কিন্তু দুটী কথা অবশ্যই বলি। ব্রহ্মচর্য্য আর স্বাবলম্বন।

লালসাতুর মানুষ বড় দুর্ব্বল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বড় বড় কাজ ক'রেছ? আমি তার বেশী দাম দিব না, যদি স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে তাকে না

দাঁড় করাতে পেরেছ। অনেক সাধন, অনেক ভজন করেছ? তারও মূল্য আমার কাছে বড় কম, যদি এই সাধন আর এই ভজন তোমাকে ইন্দ্রিয়-সুখ-লিপ্সার উপরে কর্তৃত্ব প্রদানে সমর্থ না হয়ে থাকে। কীর্ত্তন, উপাসনা সবই চমৎকার, কিন্তু তারা যেন তোমার ব্রহ্মচর্য্য-পালনের মেরুদণ্ড হয়। ব্রহ্মচর্য্যকে অনাবশ্যক ব'লে কত জনে ব'কে বেড়াচ্ছে, তা' বেড়াক্, ওদের কথায় তোমরা কেউ কর্ণপাতও ক'রো না। যাঁরা সঙ্গোপনে নিজেদের ব্রহ্মচর্য্যের বল বাড়াচ্ছেন, দেশের ও জগতের তথা সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের কুশলকে তাঁরা নিশ্চয়াত্মক ও ত্বরান্বিত কচ্ছেন। সাধারণ মানবজাতি এক দেবমানব জাতিতে রূপান্তরের অভিপ্রায় নিয়ে সভ্যতার চর্চ্চা করেছে কিন্তু ইন্দ্রিয়লালসা তাকে প্রকৃত সভ্যতা অর্জ্জনে দিচ্ছে বাধা। কারণ, লালসাতুর মানুষের মতন দুর্ব্বল ব্যক্তি আর কেউ নেই।

প্রকৃত মানুষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষকে এই লালসাতুরতার উর্দ্ধে যেতে হবে, তবেই সে প্রকৃত মানুষ হ'ল। তার আগ পর্য্যন্ত সে দেখ্‌তেই মানুষ, প্রকৃত মানুষ নয়। প্রকৃত মানুষ জিতেন্দ্রিয়, বিগতকাম ও নিষ্কলুষ। তোমরা প্রকৃত মানুষ হবার আগ্রহ নিয়ে জীবন গঠন কর। হুজুগে আকৃষ্ট হ'য়ো না। জীবনের প্রচ্ছন্নতম অংশেও পূর্ণ পবিত্রতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত

করা তোমার জীবনের পরম লক্ষ্য হোক্। প্রকৃত মানুষ হও, নকল মানুষ সেজে কোনো লাভ নেই। ভিতরের পশুটাকে লুপ্ত ক'রে দিতে হবে এক দিব্যায়নের মধ্য দিয়ে, ভিতরের হিংস্রতা আর লোলুপতাকে আত্মোৎসর্গে সমর্থ, আত্মদানে মহীয়ান, পরকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ দেবত্বে রূপান্তরিত কত্তে হবে। ঈশ্বর-সাধন যদি আর কোনও হিত মানুষের নাও ক'রে থাকে, তবু এই একটা কাজ ক'রেছে এবং চিরকাল কর্ব্বে। এই জন্যই ঈশ্বরসাধনে মানুষের রুচি স্বভাবজ ও সহজাত এবং এই জন্যই হাজার বৎসর বিরুদ্ধ আন্দোলন ক'রেও জগৎ থেকে ঈশ্বর-সাধনকে কেউ কখনো লুপ্ত কত্তে পার্ব্বে না। পরমেশ্বরে নিবেদিত-চিত্ত মানুষই প্রকৃত মানুষ এবং সত্যিকারের সেই মানুষটীর প্রথম, প্রধান, প্রকট ও প্রকৃষ্ট লক্ষণ হচ্ছে সর্ব্বজীবে ভালবাসা।

প্রকৃত দান

অপর একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধনই বল, সম্পদই বল, শ্রদ্ধাই বল আর ভক্তিই বল, তুমি দিতে পেরেছ ব'লেই খুব একটা বড় কাজ কিছু ক'রে ফেল নি। এই দানটুকু তুমি কি ভঙ্গীতে করেছ, দেবার সময়ে কি ছিল তোমার মনোগতি ও প্রীতির বিশেষত্ব, এটাও একটা মস্ত বড় বিবেচ্য বিষয়। কতজন কতজনকে কত কিছু দেয়, কিন্তু দিলেই কেউ দাতা হয় না, পেলেই কেউ প্রকৃত

গ্রহীতা হয় না। যে দিয়েছে অন্তরের স্বার্থবোধহীন নিষ্কলুষ নিষ্কামতা থেকে আর যে নিয়েছে—নিজের প্রয়োজনে নয়—বিশ্ববাসী সকলের প্রয়োজনে, সে-ই প্রকৃত দান দিয়েছে, সে-ই প্রকৃত দান নিয়েছে। আজ সত্যিকারের দাতাও নেই, গ্রহীতাও নেই, তার জন্যই ত' প্রকৃত দানের অনুষ্ঠান বল্‌তে গেলে কোথাও নেই।

কথা ও কাজ

একটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণিকে বিশেষ করিয়া ধরিল যে, চট্টগ্রাম সহরে দুই একদিন থাকিয়া যাইতে হইবে, কারণ স্থানীয় অনেকেই শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা শুনিতে চাহেন। যুবক বলিলেন,—অত দেশে দেশে আপনি ভাষণ দেন, আর চট্টগ্রামই থাক্‌বে বঞ্চিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরমেশ্বর সে সুযোগ দেবেন কি না জানি না, কিন্তু এই চট্টগ্রামে আমি সত্যিকারের কিছু কাজ কত্তে চাই। তাই, এখানে কোনো ভাষণ দিব না। কাজের জায়গায় কথা বলা ভাল নয়। কথা যতই সুন্দর হোক্, কাজের দাম তার চেয়ে ঢের বেশী। কথা অনেক সময়ে কাজ পণ্ড করে। যেখানে বেশী কথা, কাজ সেখানে আপনা আপনি পিছিয়ে পড়ে। তদুপরি, অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে চট্টগ্রামে ব্রহ্মচারীজীর (শ্রীমৎ নগেশ ব্রহ্মচারী) আশ্রমে একটা দুটা দিন একটু বিশ্রামের জন্য আসি। সভা-সমিতি-

বক্তৃতা দিয়ে কি সেই বিশ্রামের নিশ্চিন্ততাটুকু নষ্ট করা উচিত?

জাতীয় জীবনে চরিত্র *

এমন সময়ে একটী যুবক খুব উৎসাহ সহকারে একটী ঘটনার কথা বলিল। কে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন বক্তৃতা দিতে। সভাস্থলে বেশ জনসমাগম হইল কিন্তু স্থানীয় যুবকেরা এমনই পিকেটিং করিলেন যে, একটী মহিলাও সভাস্থলে যাইতে পারিলেন না। বক্তাকে অভিনন্দন দেওয়া হইল, প্রশংসা-ভাষণ শুনান হইল কিন্তু বক্তা দুঃখ করিলেন যে, একটাও মহিলা শ্রোতা এই মজলিশে নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই ত'। ব্যাপারখানা কি বল দেখি।

একটী যুবক বলিল,—বক্তা ভদ্রলোকের সদ্‌গুণের অন্ত নেই কিন্তু তাঁর সম্পর্কে জন-প্রবাদ আছে যে, তিনি কথার মায়ায় মুগ্ধ ক'রে শতাধিক কুমারীর মর্য্যাদা নষ্ট ক'রেছেন। এমন ব্যক্তির বক্তৃতা শুনতে আমরা সেই চট্টগ্রামের মেয়েদের যেতে দেব, যারা কথায় কথায় ইংরাজকে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য অগ্নিনালিকা হাতে নিয়ে গর্জ্জে ওঠবার শিক্ষা

* জীর্ণ পাণ্ডুলিপির কাগজগুলি ওলট-পালট হইয়া যাওয়াতে ঠিক্ বুঝা যাইতেছে না যে, এই তারিখেই কথাগুলি হইয়াছিল কিনা।

পেয়ে এসেছে গত এক যুগ ধ'রে? আমরা বক্তার অন্য সব সদ্‌গুণের প্রতিবাদ করি না, বরং আমরা তাঁর অনুরাগী, কিন্তু তাঁর গুপ্ত লাম্পট্যকে আমরা অন্ততঃ আমাদের জেলায় প্রসারিত হ'তে দেব না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনুরূপ একটা ঘটনা অন্য অঞ্চলেও ঘটেছে। নারীদের নৃত্য দেখিয়ে পয়সা-কড়ি তু'লে সেই টাকা দিয়ে দেউলি না বক্‌শার রাজবন্দীদের অভিপ্রেত পুস্তকাদি ক্রয়ের বা জেল-জীবনকে একটু মধুরতর করার জন্য অন্য রকম আয়োজনের চেষ্টা কচ্ছিলেন কলকাতার এক নামী দেশনেতা। সঞ্জীবনী পত্রিকায় কৃষ্ণ কুমার মিত্র মশায় তার জোর প্রতিবাদ প্রকাশ কত্তে লাগ্‌লেন। তিনি বল্লেন,—সেকি, এ অর্থ কি সেই রাজবন্দীরা নেবে, যারা জীবন গঠন ক'রে এসেছে চরিত্রের ভিত্তিতে আর, দেশমাতৃকার চরণতলে জীবনোৎসর্গ করা যাদের মরণ-পণ? কার্য্যতঃও তাই হ'ল। জেলখানা থেকে রাজবন্দীরা জানিয়ে দিলেন, আমাদের বোনেরা নৃত্য-লীলা-লাস্য ক'রে টাকা তুলবেন আর সেই টাকা আমরা নেব? না, তা' কখনো হ'তে পারে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতীয় জীবনে চরিত্রের চেয়ে বড় সম্পদ, চরিত্রের চেয়ে বড় সম্বল, চরিত্রের চেয়ে বড় নির্ভরযোগ্য বস্তু আর কিছুই নেই। কি সাধারণ কর্ম্মী, কি লোকপূজিত নেতা, প্রত্যেকেরই জীবনে চরিত্রের অতুল বিভূতি

থাকা চাই, তবে দেশ এঁদের নিয়ে গৌরব করার অধিকারী। তবেই দেশমাতা এঁদের সেবা পেয়ে হবেন কৃতকৃতার্থা।

ভূতকে ভয় করিতে নাই

যুবকের জনতায় পাথরঘাটা আশ্রমটা যেন গম্‌গম্ করিতেছে। হঠাৎ দেখা গেল, সবগুলি যুবক যে দিক্ দিয়া পারিল, প্রস্থান করিল। ব্যাপার কি? ব্যাপার আর কিছুই নহে,—পুলিশ আসিয়াছে। লাল পাগড়ীতে আশ্রমটা ঘেরা হইয়া গেল। ঘণ্টা দুই তিন ধরিয়া দারুণ ভাবে খানাতল্লাস চলিল। শ্রীশ্রীবাবামণির লিখিত কয়েক দিস্তা পাণ্ডুলিপি বগল-দাবা করিয়া পুলিশেরা প্রস্থান করিলেন। সেই পাণ্ডুলিপিগুলি আর ফেরৎ পাওয়া যায় নাই।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবাবামণি নির্জ্জন আশ্রমে আশ্রমবাসীদের নিয়া স্তোত্র-কীর্ত্তনে বসিয়া গেলেন।—জয় জয় ব্রহ্ম পরাৎপর ঈশ্বর শমন-গর্ব্ব-পরিভঞ্জ। অনুষ্ঠান-শেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভূতভাবন পরমেশ্বরের অর্চ্চনার পথে ভূতের উৎপাত একটী অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। ভূতকে ভয় করিতে নাই।

কীর্ত্তন করা ও কীর্ত্তন শোনা

পাশের পল্লীর অধিবাসীরা মৎস্যজীবী। অদ্য তাহাদের পাড়ায় অহোরাত্র কীর্ত্তন চলিতেছে। সন্ধ্যার পরে আশ্রম নির্জ্জন হওয়াতে অদূরের সেই মধুর হরিনাম-কীর্ত্তন যেন

জোয়ারের জলের আবেগ নিয়া আশ্রমটার উপরে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওরা নিজ নিজ ফুসফুস ফাটিয়ে কীর্ত্তন করুক, আমরা সারারাত উৎকর্ণ হ'য়ে কীর্ত্তন শ্রবণ ক'রে বিনাশ্রমে নিজেদের লাভ উঠাব। কথা বন্ধ কর, লেখা বন্ধ কর, পড়া বন্ধ কর,—সবাই কেবল শোন, কান পেতে শোনো, ভক্তেরা ভাবের আবেগে কি মধুর নামগান গেয়ে যাচ্ছেন। কীর্ত্তন করার মত মন দিয়ে কীর্ত্তন শোনাও একটা মস্ত বড় যোগ-সাধনা।

১১ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৪১
(২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

কাল অপরাহ্ণে পাথরঘাটা আশ্রমে পুলিশের সমাগম ঘটায় অদ্য প্রাতে এখানে জনতার ভিড় একেবারেই নাই। শ্রীশ্রীবাবামণি দশটার ট্রেণেই চট্টগ্রাম ত্যাগ করিবেন। তিনি জিনিষ-পত্র গুছাইতেছেন।

মানুষের জ্যোতির্দ্দর্শন

কাল একজন রাত্রি নয়টার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রণাম করিতে আসিয়া আশ্চর্য্য এক জ্যোতির দর্শন পাইয়াছেন।* শ্রীশ্রীবাবামণির পাদস্পর্শ মাত্র তাঁহার ভ্রূমধ্যে এক তীব্র

* নামটী ইচ্ছা করিয়াই প্রকাশ করা হইল না। ইনি বর্ত্তমানে কলিকাতার নাকতলাতে শ্রীঅরবিন্দ-নগরে বাস করেন। ইনি বিপ্লব-যুগের একজন প্রখ্যাত রাজবন্দী।

আলোকরশ্মি ফুটিয়া ওঠে। যত পথ চলেন, ততই যেন আলোটা বাড়িয়া যায়। খানিকটা দূরে যাইতেই তিনি দেখিতে পান যে, সমস্ত রাস্তা, ঘাট, পথ, বাড়ী, যাবতীয় বস্তু আলোতে আলোময় হইয়া গিয়াছে। তিনি ত্বরিত-পদে পাথরঘাটা আশ্রমে ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীশ্রীবাবামণিকে নিজ প্রকোষ্ঠ হইতে ডাকিয়া বাহির করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলেন,—এসব নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, অলৌকিকও নয়, অস্বাভাবিকও নয়, সুতরাং ভাবনার কোনও কারণ নাই। তখন ভক্তবর পুনরায় প্রণাম করিয়া ঘরে ফিরেন।

উক্ত প্রসঙ্গটাই শ্রীমৎ নগেশ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে আলোচিত হইতেছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের শরীরে কোটি কোটি অণুপরমাণু আছে। এর প্রত্যেকটার নিজস্ব এক একটা জ্যোতি আছে। কিন্তু সাধারণত আমরা তা' দেখ্‌তে পাই না, কারণ ভিতরের দৃষ্টি আমাদের প্রায় সময়েই অবরুদ্ধ থাকে কামনা, বাসনা, লালসা, আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা ও লোভের দ্বারা। আমাদের শরীরে কোটি কোটি জীবকোষ আছে, এদের প্রত্যেকের ভিতরে এই শরীরটার মতই এক একটা পূর্ণাবয়ব আলাদা শরীর সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, অবশ্য যদি তারা উপযুক্ত পরিবেশ, পরিস্থিতি, পরিচর্য্যা ও সুযোগ পায়। এদেরও

প্রত্যেকের নিজস্ব এক একটা জ্যোতি আছে। যেমন জ্যোতি আছে আমাদের এই পৃথিবীটারও, যা' এই পৃথিবীর বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পার্লে একদিন আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। আকাশের কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের যেমন জ্যোতি আমরা এই পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পাই, ঐ সকল গ্রহ-নক্ষত্রে যদি মানুষ বা অন্য জীব কিছু থেকে থাকে, তবে তারাও তেমন এই পৃথিবীর অপরূপ জ্যোতি দূর থেকে দেখে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়। কিন্তু পৃথিবী-রূপ গ্রহে থেকে যেমন পৃথিবীর জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখা যায় না, ঠিক তেমনি কোটি কোটি জ্যোতির্ম্ময় অনুপরমাণুর সমষ্টি এই দেহটাতে অবস্থান ক'রে এই দেহের সেই বিমল জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মনটা যখন দেহাতীত স্থিতি পায়, তখন সে এই জ্যোতিকে দেখতে পায়। শ্রীমান অ-যে কাল জ্যোতি দেখেছিল, তার কারণ হচ্ছে এই। মানুষ নিজেই জ্যোতির্ম্ময়, দেহাতীত সত্তা লাভ করা মাত্র সে তার নিজের জ্যোতি দেখে অবাক্ হয়, আর এই জ্যোতিই যেন সন্ধানী আলোকের মতন মাঠে, ঘাটে, পল্লীতে, নগরে বিচ্ছুরিত দেখে অবাক্ হ'য়ে ভাবে, এ কি হ'ল। মানুষ জ্যোতির্ম্ময় এক বরবপুর অধিকারী বিবেকবান্ জীব। সে নিজের জ্যোতি নিজে দর্শন ক'রে কারণটুকু না বুঝতে পেরে কেবল বিস্ময়-সাগরে হাবুডুবু খায়।

জ্যোতির্দ্দর্শন কিসের ইঙ্গিত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জ্যোতির্দ্দর্শন কোনো একটা বাহাদুরীর ব্যাপার নয়, এটা মনঃস্থৈর্য্যের একটা স্তরের অতীব সাধারণ অবস্থা। এই অবস্থাটা এলে বুঝতে হবে যে, মনকে দেহাতীত ক'রে দেহাতীত সত্তায় প্রতিষ্ঠার অনুকূল অবস্থা এসেছে, অতএব এখন কষে সাধন কর্ত্তে হবে। জ্যোতির্দ্দর্শনকেই ব্রহ্মদর্শন মনে ক'রে থেমে গেলে চল্‌বে না, আরো আরো এগিয়ে যেতে হবে। সব-কিছুই যখন ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া যখন আর কিছুই কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও নেই বা থাক্‌তে পারে না, তখন যখন যেখানে যে ভাবে যা কিছুরই দর্শন লাভ হোক্, সবই এক হিসাবে ব্রহ্মদর্শন। কিন্তু সে হচ্ছে খণ্ডিত দর্শন। অনন্ত-কোটি দর্শনের অফুরন্ত সমুচ্চয় হচ্ছে প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন, অন্য সব দর্শন হচ্ছে প্রাকৃত দর্শন। অপ্রাকৃত দর্শনই প্রকৃত দর্শন এবং এই দর্শনের আদি নেই, অন্ত নেই, আরম্ভ নেই, শেষ নেই, এ দর্শন এক বিচিত্র দর্শন এবং এই জন্যই এর বর্ণনা নেই, মুখের ভাষা এখানে মূক, মনের তরঙ্গ এখানে স্তব্ধ ও নিশ্চিহ্ন। জ্যোতির্দ্দর্শন হ'লে বুঝতে হবে, আমার সেই প্রকৃত দর্শনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বাভিনিবেশ প্রয়োগের সময় এসেছে, আর দেরী করা, হেলা করা, আলস্য করা উচিত নয়। উপলব্ধির সাগরসম বিরাট, বিশাল, গভীর ও নিবিড় গহনে প্রকৃত সত্যের স্পর্শমণিটি যথার্থ সাধকের হাতের ছোঁয়াটী পাবার

জন্য চিরপ্রতীক্ষায় দিন গণছে, কারণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের যেদিন উদ্ধার, পরম-জ্ঞান-রূপ স্পর্শমণিটির জীবন তখনি সার্থক।

বার বার ঐ পাহাড়তলী

বেলা দশটায় চট্টগ্রাম হইতে ট্রেন ছাড়িল। পাহাড়তলী রেল-কারখানার কর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রজাপতি চট্টোপাধ্যায় ট্রেণের চলন্ত অবস্থায় সেই কামরায় উঠিলেন, যাহাতে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার কম্বল বিছাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি ত' খুব ভোরে উঠেই কারখানা চলে যাও। আজ যাও নাই?

—আজ্ঞে না। একটা জরুরী কাজ আছে। পাহাড়তলী ষ্টেশানে আপনাকে একটু নামতে হবে। কিছু লোকের দীক্ষা হবে।

—তারা কারা?

—কয়েকজন যুবক, যাদের ধ্যান ও জ্ঞান তাদের স্বদেশ, অন্য দেবতা তারা মানে না।

—কেন, পাথরঘাটা আশ্রমেই ত' তারা যেতে পাত্ত। কাল সন্ধ্যায় দীক্ষা হতে পাত্ত, আজ সকালেও হতে পাত্ত।

—কাল সন্ধ্যার মুখেই তারা আশ্রমে রওনা হয়, কিন্তু দূর থেকেই দেখ্‌তে পায়, আশ্রম লাল পাগড়ীতে ঘেরাও হয়ে আছে। রাত্রে তারা প্রায় দশটা এগারটার সময়ে আর একবার যায়। দূর থেকে দেখ্‌তে পায়, আশ্রমটা যেন একটা

সূর্য্যের মত উজ্জ্বল আলো বিতরণ কচ্ছে। এই অদ্ভুত দৃশ্যের কোনো মানে বুঝতে না পেরে, সবাই ফিরে এসেছে। এখনি গাড়ীটা পাহাড়তলী ষ্টেশনে থাম্‌বে। বাবা, আপনি নেমে পড়ুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বার বার ঐ পাহাড়তলীরই ষ্টেশান-প্লাটফরম? এবার নিয়ে ত' তিনবার হতে যাচ্ছে। কিন্তু বলতে পার, এরা দীক্ষিত হবার জন্য আমার কাছেই ছুটে আসে কেন? আর কি দেশে গুরু নেই?

শ্রীযুক্ত প্রজাপতি বলিলেন,—তার উত্তর আপনি জানেন, আমাদের জানার কথা নয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি পাহাড়তলী ষ্টেশানে নামিলেন এবং প্লাটফরমের উপরে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া যাঁহারা মুদ্রিত নেত্রে দীক্ষার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই যুবকদিগকে দীক্ষা প্রদান করিয়াই পুনরায় ট্রেণে চাপিলেন।

বিচিত্র ইতিহাস এই পাহাড়তলী রেলষ্টেশানের প্লাটফরমের। কে জানে, আরও কত কি ঘটনা এইখানে ঘটিয়া গিয়াছে জনশ্রুতির অতীতে লোকলোচনের অন্তরালে।

ধ্যানস্থ চিত্ত জ্যোতির উৎস

ট্রেণ ছাড়িলেও শ্রীযুক্ত প্রজাপতি নামিলেন না। বলিলেন,—আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

—বল।

কাল রাত্রে এই সকল যুবকেরা পাথরঘাটা আশ্রমটাকে এমন জ্যোতির্ম্ময় দেখেছিল কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাল আমি প্রায় সারারাত ধ্যানস্থ ছিলাম। ধ্যানাবস্থায় সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমার পূর্ণ যোগ সাধিত হয়েছিল। ধ্যানাবস্থাই হচ্ছে সকল জ্যোতির উৎস। আত্ম-সমাহিত হও, দেখবে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমার তপস্যার আলোকে পরম-জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে উঠেছে। শুধু চখের বলেই আমরা কিছু দেখতে পাই না। যা দেখ্‌ব, তার উপরে আলো পড়েছে বা তার ভিতর থেকে আলো উৎসারিত হচ্ছে ব'লেই দেখতে পাই। মানুষের উচ্চ চিন্তা আলোক বিকিরণ করে, এজন্য উচ্চচিন্তার আধারস্থলে চক্ষুষ্মানেরা আলো দেখতে পায়। কাল যারা গিয়েছিল পাথরঘাটা আশ্রমে মনে প্রাণে এক শুভ কামনা নিয়ে, তাদের মন একাগ্র ছিল ব'লেই তারা জড়বস্তু ঐ আশ্রমের গৃহাঙ্গন সব কিছু আলোতে আলোময় দেখেছে। ব্যাপারটা এর বেশী কিছুই নয়। ধ্যানস্থ একাগ্র চিত্ত জ্যোতির উৎস।

দলবৃদ্ধির আমার প্রয়োজন নাই

শ্রীযুক্ত প্রজাপতি বলিলেন,—আমার একটী ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বল।

—আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য কচ্ছি যে, আপনি যখনি

আসেন তখনি দলে দলে ছেলেরা এসে আপনার কাছে দীক্ষা নেয়। সকলের কত আগ্রহ। কিন্তু আমি ত' আপনার সঙ্গে কত মিশেছি, কিন্তু কৈ আমার ত' দীক্ষা নেবার আগ্রহ আসে না! আর, আপনিও ত' একটীবার বলেন না, প্রজাপতি দীক্ষা নে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আচ্ছা প্রশ্ন করেছ ত'! যার ইচ্ছা, সে দীক্ষা নেবে। আমি আবার বলতে যাব কেন? তারপরে তোমার ত' ঈশ্বরানুরাগ অমনিতেই প্রবল। তুমি ভগবানকে নিজের মনে নিজের মতে ডেকেও যাচ্ছ। তোমাকে তোমার মতটী আর পথটী থেকে ভ্রষ্ট ক'রে আমার দলে ঢুকালে জগতের কি লাভ হবে? ভগবান ভাবগ্রাহী। তোমার অন্তরের ভাব দেখে তিনি তোমাকে তাঁর কৃপানুগ্রহ বিতরণ কর্ব্বেন। আমি জোর ক'রে বা কৌশল ক'রে তোমাকে আমার দলে টেনে আনতে গেলে আমার দলটীর শ্রীবৃদ্ধি ঘট্‌তে পারে, ব্যাপক ভাবে জগতের বিশেষ কি হিত সাধিত হ'তে পারে বল ত'! দলবৃদ্ধির আমার প্রয়োজন নাই, এইজন্যই আমি কাউকে ডেকে এনে দীক্ষার আসনে বসাই না।

অবিরাম ডাকো

শ্রীযুক্ত প্রজাপতি প্রশ্ন করিলেন,—অদীক্ষিতের নাকি শত সহস্র লক্ষ জপেও কোন ফল হয় না।

—না, এমন কথা স্বীকার কত্তে পারি না। দীক্ষিত হও আর অদীক্ষিত হও, ব্যাকুল প্রাণে ভগবানকে যদি ডাকো, তবে তার ফল তুমি পাবেই। সেই ফল হচ্ছে কামের প্রবলতা থেকে আত্মোদ্ধার, ক্রোধের উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি, লোভের দুর্ব্বিপাক থেকে মুক্তি এবং অন্তরের অনাবিল শান্তি। ভগবানকে ডাকো, প্রাণভ'রে ডাকো, ভালবেসে ডাকো, আকুল হ'য়ে ডাকো, অবিরাম ডাকো, অবিশ্রাম ডাকো। এ ডাকা নিষ্ফল হ'তে পারে না। দীক্ষাটাই বড় কথা নয়, ডাকাটাই বড় কথা।

গুরুবাদ ও অবতারবাদ

গুরুবাদ ও অবতারবাদ সম্পর্কে কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেকেই নিজ নিজ গুরুকে অবতার-রূপে প্রচার কত্তে আগ্রহী হয় গুরুদেবের প্রতি অসাধারণ ভক্তির প্রবলতা থেকে। গুরুকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান কর্লে তাঁর প্রদত্ত উপদেশের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা জন্মে এবং তাতে সাধন-ভজনে দৃঢ়তা আসে। এ সম্পর্কে এইটুকু নিশ্চয়ই সুফল। কিন্তু তোমার গুরুকে অবতার ব'লে প্রচার কত্তে সুরু কর্লে আমিও আমার গুরুকে অবতার ব'লে প্রচার কর্ব্ব না কেন? শত শত অবতার ধর্ম্ম-জগৎটাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে শেষে অবতারে অবতারে লড়াই বেঁধে যাবে। কেউ বলবে আমার অবতার ষোলকলায় পূর্ণ, তোমার অবতার ত' মাত্র

আটটী কলার অধিকারী, কেউ বলবে, আমার অবতার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারি যুগেরই মান্য, আর তোমার অবতার ত' শুধু এই পাপাচ্ছন্ন কলিযুগের হে। কেউ বল্‌বে, আমার গুরু বিষ্ণুর অবতার, শিব ও ব্রহ্মা যাঁকে বন্দনা করেন। কেউ বল্‌বে, আমার গুরু শিবের অবতার, যাঁকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু নিরন্তর অর্চ্চনা করেন। এভাবে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লাঠালাঠি পিটাপিটি সুরু হ'য়ে যাবে। এ এক বিতিকিচ্ছি অবস্থা। তার চেয়ে ভাবা ভাল যে, জীবমাত্রই পরমেশ্বর থেকে অবতীর্ণ হ'য়ে এসেছে এবং যত্র জীব, তত্র শিব, এই বাক্যই পূর্ণ সত্য। প্রতি জীবে পরমেশ্বরকে আমরা দর্শন ক'রে কৃতার্থ হব। তার চেয়ে আনন্দের বিষয় জগতে আর কি হ'তে পারে?

জীবে জীবে ঈশ্বর-ভাবনার সুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবে জীবে ঈশ্বর-ভাবনার সুফল এই যে, যাকে দেখলে কাম আসা সম্ভব, তাকে দেখলেও কামভাব না এসে ভক্তিভাব আস্‌বে, যাকে দেখলে ক্রোধ বা ঈর্ষ্যার ভাব সম্ভব, তাকে দেখলেও মনে শান্ত ও নির্ব্বিদ্বেষ প্রেম জন্মাবে। মানুষ মাত্রকেই ঈশ্বরের কাছ থেকে অবতীর্ণ ভাবতে পারলে, যে মানুষটী যে পরিস্থিতির মধ্যে যে পরিবেশেই থাকুক না কেন, তাকে তদুচিত সেবা দেবার জন্য প্রাণে আকুলতা আসবে। পরকে সেবা দেবার আগ্রহ

ততক্ষণ আসে না, যতক্ষণ নিজের প্রবল স্বার্থবুদ্ধি কতকটা হ'লেও সঙ্কুচিত না হয়। জীবে জীবে ঈশ্বর-স্মরণের, ঈশ্বর-মননের, ঈশ্বর-চিন্তনের শুভফলে মন আপনা আপনি মোহমুক্ত হয় এবং আস্তে আস্তে স্বার্থসংস্কারের বাইরে চলে আসে। তাই, কোন্ যুগের কোন্ অবতার-পুরুষ কোন্ যুগের কোন্ অবতার-পুরুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট, সেই বিষয়ের জটিল তর্কে প্রবেশ না ক'রে সর্ব্বপ্রথমে নিজ পিতামাতাকে, তারপরে নিজ জ্ঞানদাতা গুরুকে, তারপরে আস্তে আস্তে ভগবৎকর্ম্মে সমর্পিতচিত্ত প্রতিটি সাধককে এবং পরিণামে ছোটবড় আপামর জনসাধারণকে ঈশ্বরেরই অবতার ব'লে মানুষ মনে কত্তে শিখুক। এটা বড়ই শ্লাঘ্য অবস্থা। কারণ এই অবস্থা এলে দুর্ভাবনা দূর হ'য়ে যায়, মনের উদ্বেগ কেটে যায়, সর্ব্ব অবস্থায় সন্তোষ আসে আর সর্ব্বমনের শুভকামনাজনিত বিমল আত্মপ্রসাদে মনঃপ্রাণ ভ'রে যায়।

সাম্প্রদায়িকতার প্রাথমিক প্রতীকার

ট্রেণ সীতাকুণ্ড ষ্টেশানে আসিলে কয়েকজন পরিচিত লোক কামরাটিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-চর্চ্চার বিষয় আলোচনা চলিতেছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতের হাজার হাজার সম্প্রদায় চিরকালই থাক্‌বে, সবাইকে এক সম্প্রদায়ভুক্ত কেউ কখনো কত্তে পারবে না। যে সব সম্প্রদায় বর্ত্তমানে খুব প্রবল, তারা অনেকে হয়ত নিমীলিত হ'য়ে যাবে, যে সকল সম্প্রদায় এখনো আত্ম-প্রকাশই করে নি, তারা হয়ত হঠাৎ জগজ্জয় ক'রে বস্‌বে। কিন্তু বাক্যবলেই হোক, শাস্ত্রবলেই হোক, অস্ত্রবলেই হোক আর অলৌকিকী শক্তির লীলাখেলা দেখিয়েই হোক, কোনো সম্প্রদায়ই সমগ্র জগৎকে নিজের কুক্ষিতে টেনে আন্‌তে পারবে না। সত্যের অনুভূতি নানা ভাবে নানা উপলক্ষ্যকে অবলম্বন ক'রে নানা জনের কাছে ধরা দেবে এবং নানা যুগে নানা রূপে নানা জনে তাদের স্বীকৃতিও দেবে। সত্য কোনও পেটেন্ট করা সীল-মারা মার্কা-ধরা সুনির্দ্দিষ্ট একটা গণ্ডীতে-আবদ্ধ ক্ষুদ্র এক জিনিষ নয় যে, তার বাইরে উকি মেরে কেউ কখনো কোনো সত্যকে লাভ কত্তে পার্ব্বে না। সত্যের নানাবিধ প্রকাশ ও আবেদন মানুষকে নানা যুগে ও যুগান্তরে আকুলিত কর্ব্বে এবং সেই সত্যকে প্রচারের জন্য নব নব নবী, ফেরেস্তা, সাধক, মহাপুরুষ, অবতার ও সিদ্ধপুরুষের আর্বিভাব ঘটবে। পরমেশ্বরের সৃষ্টি-লীলার এই বিচিত্র মহিমাকে যদি স্বীকার কর, তবে দেখ্‌বে কোনও সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেই অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ সম্ভব হচ্ছে না। এই যে একটা মস্ত বড় সত্য, একে যদি স্বীকার ক'রে নাও, তা'

হ'লেই দেখবে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি তোমার রুষ্ট দৃষ্টি আসবে না। সাম্প্রদায়িকতার এটা প্রাথমিক প্রতিকার।

সাম্প্রদায়িকতার স্থায়ী প্রতীকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত ও স্থায়ী প্রতীকার অন্যত্র। যে যেই সম্প্রদায়েরই হোক্, ভজনা যখন কচ্ছে বিশ্বভুবনের একমাত্র স্রষ্টা, পাতা ও বিলয়কারী পরমেশ্বরের, আর যে যে-ভাবেই তাঁর পূজাপদ্ধতি অনুসরণ করুক, লক্ষ্য যখন তার ঐ একই পরমমহান্, তখন তার প্রতি আমার বিদ্বেষ রাখা নিরর্থক,—তোমার মত আর পথ আমার মত আর পথ থেকে যতই পৃথক হোক্, তোমার ঈশ্বর আর আমার ঈশ্বর দুজন নন,—এই ভাবনার অনুশীলনের দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সমূলে নষ্ট হতে পারে। কেউ আমার মতে ও পথে ভগবদুপাসনা করে না ব'লেই সে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট বা হেয়, আর আমি অন্যের মতে বা পথে না চ'লে নিজে একটা আলাদা পথে চলি ব'লেই আমি তাদের চেয়ে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ, এই অভিমানকেও বিসর্জ্জন দিতে হবে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সম্ভব কি না

একজন প্রশ্ন করিলেন,—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি করা সম্ভব কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক এক ধাঁচের লোক নিয়ে এক একটা সমাজের পত্তন হয়। যে সমাজের লোকদের মধ্যে আমিষাহার হেয়, তারা তাদের ছেলেমেয়েকে পারত-পক্ষে মৎস্যমাংসসেবীদের মেয়ে বা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয় না। যে সমাজে শূকরমাংসের চল আছে, গোমাংস-সেবী সমাজের এমন অনেক লোক থাকবে, যারা সে সমাজে ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দেবে না। যে সমাজ পিতৃব্যকন্যা, পিতৃস্বসার কন্যা বা মাতৃস্বসার কন্যার সঙ্গে বরের বিয়ে চলে, সেই সমাজে তারা নিজ নিজ ছেলেমেয়েকে বিয়ে দিতে যাবে না, যাদের মধ্যে অত-নিকট আত্মীয়ের ভিতরে বিবাহ নিষিদ্ধ রয়েছে। এগুলি সামাজিক আচরণ। এগুলির সঙ্গে অন্তরঙ্গ ধর্ম্মের কি সম্পর্ক আছে বা কতটুকু সম্পর্ক থাক্‌তে পারে, তা' নিয়ে তর্কের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা যদি নিজ নিজ সামাজিক আচরণগুলিকে আস্তে আস্তে এমন একটা রূপান্তরের পথে নিয়ে আস্‌তে পারেন, যাতে বিভিন্ন সমাজের পক্ষে নিষিদ্ধ ব্যবহারগুলি সকল সমাজেই নিষিদ্ধ হ'য়ে যায়, তাহ'লে ভিন্ন-ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সামাজিক একতা স্থাপন হয়ত কঠিন হবে না। তবে এই বিষয়ে এখনো কেউ ধ্যান দেন নি বা চেষ্টা করেন নি, একথা সত্য। ভবিষ্যতে কে করবে তা' কর্ব্বেন, তাও এখন অনিশ্চিত।

জাতীয় ঐক্যবিধানের জন্য আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ

একজন প্রশ্ন করিলেন,—জাতীয় ঐক্য বিধানের জন্য বিভিন্ন সমাজের লোকেদের মধ্যে অবাধ বিবাহ-প্রথা সহায়ক হ'তে পারে না কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না। ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিকতার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অবাধে বিবাহ প্রচলিত হ'লেই জাতীয় ঐক্য সংস্থাপিত হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। বিবাহ প্রধানতঃ দুইটী নরনারীর একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। দুই মেরুর দুই প্রান্তবর্ত্তী দুইটী বিপরীতলিঙ্গী নরনারী বিবাহ দ্বারা আস্তে আস্তে একেবারে এক হ'য়ে যায় বা যেতে পারে, এটা পরীক্ষাসিদ্ধ সত্য। কিন্তু তারা দুজনে যেই দুটী আলাদা ও দূরবর্ত্তী সমাজের মানুষ, এইরূপ একটী বা দুটী বিবাহের দ্বারা সেই দুটী সমাজে ঐক্য আসে না, আসতে দেখা যায় নি। কিন্তু আলাদা আলাদা সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী দুটী পৃথক্ সমাজের লোক সুদীর্ঘকাল একই উদ্দেশ্য নিয়ে একটী লক্ষ্যে কাজ কত্তে কত্তে এমন সময় আসতে পারে, যখন তাদের সামাজিক অনুশাসন ও প্রতিষেধনগুলির মধ্য থেকে পার্থক্য ঘুচে যায় বা ঘুচে গেল, তখনই দুই, চার বা দশটী পৃথক্ সমাজের লোক ব্যাপক মিশ্রণে জৈবিক ভাবেই একটা জাতে পরিণত হ'য়ে যেতে পারে। তার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সে দেশের নানা

জাতির লোকের পার্থিব লক্ষ্য প্রচুর ধনসম্পদ অর্জ্জন করা, জাতীয় লক্ষ্য আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষা করা, জান্তব লক্ষ্য প্রত্যেক পুরুষের নিজের জন্য নিজের পছন্দমত পত্নী বা প্রত্যেক নারীর নিজের জন্য পছন্দমত পতি লাভ করা এবং তার জন্য বয়স, জাতি, ঐতিহ্য বা সমাজ-শাসনের বিশেষ পরোয়া না রাখা। কিন্তু অন্যান্য দেশে বেপরোয়া বিবাহ জাতীয় ঐক্য-বিধানের হেতুস্বরূপ নাও হ'তে পারে।

ভারতে আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের বাধা কি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতে আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের বহুল প্রচলনে প্রচণ্ডতম বাধা চিরকাল এসেছে এবং চিরকাল আসবে একটী অতীব গুপ্ত রহস্য থেকে, যার অনাবিষ্কৃত গুহামুখটী লুক্কায়িত রয়েছে একটী চমৎকার অঙ্গীকারে। তা' হচ্ছে এই যে, পিতার যে হবে পুত্র, সে পিতার উন্নত ভাবধারা, উচ্চগ্রামের আদর্শবাদ, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত চিন্তাপটলকে করবে প্রবাহিত, প্রবর্দ্ধিত, সন্তানিত,—এই জন্যই তার নাম সন্তান। সন্তান মানে সভ্যতার অনুশীলনকে সে করবে প্রোজ্জ্বল, প্রোচ্ছল, চিরপ্রবহমাণ ও চলিষ্ণু। হাত, পা, চখ, মুখ ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়ে একটা জানোয়ার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হ'লেই সে

সন্তান হ'ল না, তাকে ভূমিষ্ঠ হ'তে হবে পিতৃপুরুষগণের অতীত কালের যাবতীয় কল্যাণানুশীলনকে বিস্তারিত ভাবে এই জগতে জগদ্বাসীর কল্যাণের জন্য বিকশিত, সন্তানিত, বিসর্পিত, দীর্ঘায়িত ও অবারিত করার জন্য। তার জন্ম যাতে এই প্রতিশ্রুতিটীকে পালন কত্তে সমর্থ হয়, পিতাকে আর মাতাকে তারই জন্য সমিধ আহরণ কত্তে হবে, তাদের লোকলোচনাতীত সংগুপ্ত জীবনটুকুর মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ-সাধন ক'রে। কথাটা এক বিচিত্র হেঁয়ালি অথচ প্রকৃত ভারতীয় জীবনের এইটী হচ্ছে যাবতীয় মণি-মঞ্জুষার নিভৃত চাবিকাটি। ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকল জাতির সকল সমাজের লোকের মনে এই অনুশীলনের যেদিন প্রত্যক্ষ রেখাপাত হবে, সেদিন থেকে ব্যাপক আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের প্রকৃত বাধা অপসারিত হবে সুনিশ্চিত। পৃথিবীর সব জাতির মানুষ মিলে একটা জাতের মানুষ হোক, পৃথিবীর সব দেশের ভাষা একটা ভাষায় পরিণত হোক, পৃথিবীর সকল ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র মিলে একটা রাষ্ট্রের রূপ ধরুক, জাতিতে জাতিতে, ভাষায় ভাষায়, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধের অবসান ঘটুক, এ কামনা বিশ্বকুশলকামী কে না কর্বে? কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গার জলবায়ু, আবহাওয়া, শীতোষ্ণতা সর্ব্বঋতুতে সমান হোক, এটা কামনা কর্লেও হবার উপায় নেই। কারণ, সব দেশ একই সঙ্গে উত্তাপের মূলাধার সূর্য্য থেকে সমান দূরে থাকতে পারে না ত'!

ভারত স্বাধীন হইবে

একটী যুবক একটী রাজনৈতিক প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারত যে স্বাধীন হবে, একথা আন্দাজেও বলা যায়। কারণ, একদিন এদেশে পাঠানের রাজত্ব ছিল, আজ তারা নেই। একদিন এদেশে মোগলের রাজত্ব ছিল, আজ তারাও নেই। সুতরাং আজ যাঁরা রাজতক্তে ব'সে আছেন, একদিন তাঁরাও থাক্‌বেন না। অবশ্য, তাঁদের বদলে চীন আস্‌তে পারে, জাপান আসতে পারে, জার্ম্মাণরাও আসতে পারে। এসব জাতি যেভাবে নিজেদের সম্প্রসারণ করার চেষ্টা কচ্ছে, তাতে তাদের পক্ষে অচিরকালমধ্যে অতি বৃহৎ সাম্রাজ্য সৃষ্টি করা মোটেই বিচিত্র ব্যাপার নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তির সময় অতি সম্মুখে। অতএব অনুমান করা যেতে পারে যে, ভারত একদিন স্বাধীন হবে। এবং এটাই স্বাভাবিক যে, ভারত গণতন্ত্রই পছন্দ কর্ব্বে, রাজতন্ত্র নয়।

জাতিভেদ ও গণতন্ত্র

প্রশ্ন হইল,—গণতন্ত্রে কি জাতিভেদ থাক্‌বে না উঠে যাবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গণতন্ত্র একটা রাজনৈতিক ব্যাপার, জাতিভেদ একটা সামাজিক ব্যাপার। আমি ব্রাহ্মণের

ঘরে জন্মেছি, তুমি শূদ্রের ঘরে জন্মেছ, ইনি বৈশ্যের ঘরে জন্মেছেন, উনি চামারের ঘরে, মুচির ঘরে বা চণ্ডালের ঘরে জন্মেছেন, এই ভাবে নিজের জন্মগত পরিচয় প্রদান করার প্রথার নাম জাতিভেদ। গণতন্ত্রকে সফল কত্তে হ'লে জাতিভেদ-প্রথাকে তুলেই দিতে হবে কি না, এই রকমের চিন্তা বা দুশ্চিন্তা একসময়ে মানুষের মনে আসতে পারে। কিন্তু একমুখে বল্‌ব চামারেরা চামার প্রার্থীকে ভোট দাও, সাহারা সাহা প্রার্থীকে ভোট দাও, ভূমিহাররা ভূমিহারদের ভোট দাও,—রাজপুতরা রাজপুতদের ভোট দাও আর অন্য মুখে বল্‌ব জাতপাত তোড়ো,—এটা ভণ্ডামি হবে। যেই হেতু ইনি নির্দ্দিষ্ট একটী জাতির লোক, তজ্জন্য এঁকে যোগ্যতার অভাব-সত্ত্বেও বড় কেদারায় বসিয়ে দিতে হবে, এটা যদি হয় গণতন্ত্রের আচরণ, তবে এমন আচরণকারীদের পক্ষে জাতিভেদ-সংরক্ষণকামী সামাজিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আস্ফালন ও বিষোদ্গার সুনিশ্চিতই অন্যায় হবে। তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে ব'লে শূদ্রের মেয়ে বিয়ে কর্ব্বে না, এতে গণতন্ত্র বিপন্ন হয় না, ব্রাহ্মণের যদি চারটে ভোট, ক্ষত্রিয়ের যদি তিনটে ভোট, বৈশ্যের যদি দুটো ভোট আর শূদ্রের যদি একটা ভোটের ব্যবস্থা হয়, তবেই গণতন্ত্র বিপন্ন হয়। কে কার হাতে বা পাতে খাবে, কে কার মেয়ে বিয়ে কর্ব্বে, কার মৃত্যুতে কে শ্রাদ্ধ কর্ব্বে আর কে কার পোষ্যপুত্র হ'তে পার্ব্বে, এই নিয়ে সামাজিক লোকের আচার-বিচার যাই

হোক, রাজনৈতিক কর্ম্মে যদি যোগ্যের প্রতি অবিচার না থাকে, তবে গণতন্ত্র কদাচ বিপন্ন হয় না। আমাদের অঞ্চলের লোকেরা কেবল চাকুরী পাবে, স্কলারশিপ পাবে, তোমাদের অঞ্চলের লোকদিগকে নানা কৌশলে দাবিয়ে রাখব, এই যদি হয় গণতন্ত্রীদের আচরণ, তবে তখন বুঝতে হবে যে, এরা যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে আস্ফালন করে, সেটা না বুঝে করে বা ভণ্ডামি ক'রে করে অথবা সস্তায় হাততালি কুড়াবার জন্য করে। যখন যা' বল্‌লে ভোট পাওয়ার সুবিধা হবে, তাই ব'লে বেড়ানোর নাম গণতন্ত্র নয়।

জাতিভেদ দূর করার উপায়

প্রশ্ন উঠিল,—জাতিভেদ দূর করার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবে জীবে ব্রহ্ম-চেতনার প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে জাতিভেদ দূর করার প্রকৃষ্টতম উপায়। জীব যখন নিজেকে ব্রহ্ম ব'লে জানে বা নিজেকে ব্রহ্মদাস ব'লে বোঝে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত হয় নিজেকে একান্ত অভিন্ন ব'লে অনুভব করে, অথবা পরমপুরুষের শাশ্বত সেবক ব'লে নিজেকে জানে, তখন, হয় অভিন্নত্ব-বোধহেতু, নয় নিত্য-কৃষ্ণদাসত্বহেতু তার ভিতর থেকে অন্য জীবের প্রতি অবজ্ঞা বা হেয়ভাব দূর হ'য়ে যায়। তখন সামাজিক প্রথা তার কাছে অর্থহীন, নিষ্প্রয়োজন, অসম্বদ্ধ ও নিঃসম্পর্কিত মনে হয়। জাতিভেদ দূর করার এইটাই শ্রেষ্ঠ

উপায়। কেউ কেউ জাতিভেদ যুক্তি-বলে দূর কত্তে চেয়েছেন, কারো মন থেকে তা' দূর হয়েছে, কারো মন থেকে হয় নি। কেউ কেউ জাতিভেদ অস্ত্রশস্ত্র-প্রয়োগে দূর কত্তে চেয়েছেন, দলে দলে লোককে স্বধর্ম্মচ্যুত ক'রে সেই উদ্দেশ্য-সাধনে আংশিক বা তাৎকালিক সাফল্যও লাভ করেছেন কিন্তু বিপত্তিবহুল বাস্তুভূমি পরিত্যাগ ক'রে নিরুদ্দেশ যাত্রা ক'রে অনেকে নিজেদের সংস্কারকে রক্ষা করেছেন এবং অন্যত্র গিয়ে নিজেদের প্রথারই পুনরনুশীলন করেছেন। ফলে, অনেক ঝাঁড়া গিয়েছে, তবু প্রথাটা খাড়াই রয়েছে।

জাতিভেদ-রূপ মেঘের কোলে দুইটী রজত-রেখা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতিভেদ-রূপ মেঘের কোলে দুইটী চমৎকার রজত-রেখাও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। জাতিভেদ-রূপ একটী প্রথা ছিল ব'লেই গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে ধনী ব্রাহ্মণের পুত্রের সঙ্গে, গরীব তিলি বা সাহার মেয়ে একটী ধনী তিলি বা সাহার ছেলের সঙ্গে বিবাহিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। তা' নইলে ধনীর সঙ্গে ধনীরই কাজ-কারবার হ'ত, দরিদ্রকে কেউ পুছত না। জাতিভেদরূপ একটা প্রথা ছিল ব'লেই ধনী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন বা শ্রাদ্ধে গরীব ব্রাহ্মণেরাও নিমন্ত্রণ পায়। তা' নইলে ধনী ও গরীবের মিলিত হবার কোনো কারণই ঘটত না। এই হ'ল

একটী রজত-রেখা। আর একটী হচ্ছে এই যে, কারো ভিতরে জাতির গর্ব্ব থাক্‌লে সে সেই জাতির পক্ষে অমর্য্যাদাকর কর্ম্ম কত্তে কুণ্ঠিত হয়। কেউ নিজেকে চামার ব'লে মনে করে ব'লেই সে চামারের অযোগ্য নীচ কাজ কত্তে রুচি বোধ কর্ব্বে না। কেউ নিজেকে ক্ষত্রিয় বা বীরের জাত ব'লে মনে করে বলেই ক্ষত্রিয়ের অনুচিত কাজ কত্তে লজ্জা বোধ কর্ব্বে। কেউ নিজেকে ব্রাহ্মণ ব'লে জ্ঞান করে ব'লেই ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দনীয় কুকার্য্য কত্তে বারংবার বিবেকের বাধা পাবে। জাতিভেদ-বোধ অনেক ক্ষেত্রে এমন আত্মগরিমা দেয়, যার ফলে, সে যে জাতিরই হোক্, তার চেয়ে হেয় কাজ কত্তে পারে না। অপরকে ঘৃণা না ক'রে যদি কেউ অন্তরে নিজের জাতির গর্ব্ব পোষণ কত্তে পারে, তবে জোর ক'রে তার সংস্কারে আঘাত করার জরুরী প্রয়োজনটী কোথায়? নিজের জাতির প্রতি তীব্র সম্মাননা-বোধ অনেক দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষকেও ব্যভিচারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, এমন সহস্র দৃষ্টান্ত আছে।

ট্রেণ লাকসাম জংশন ষ্টেশানে আসিয়া পৌছিলে লাকসাম হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী অপর কতিপয় সহকারী শিক্ষক সহ এবং একদল ছাত্র লইয়া আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে ফুলমাল্যভূষিত করিলেন। সুরেশবাবু বলিলেন,—আজ আপনাকে এখানে নামতেই হবে, স্কুলের ছেলেরা আপনার উপদেশ-ভাষণ শোনার জন্য বড় ব্যগ্র।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্রীহট্ট আর শিলচরের সুদীর্ঘ বক্তৃতা-মালায় আমার স্বাস্থ্যকে বেশ কতকটা ক্ষুণ্ণ করেছে। এখন কয়েকদিন আর বক্তৃতা দিব না।

বক্তৃতাদানের দোষ ও গুণ

কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জলবুদ্বুদের মত মানুষের আশার তরঙ্গ কেবলি উঠ্‌ছে আর শূন্যে মিশে যাচ্ছে, ব্যারোমিটারের পারদের মত কেবলি উঠ্‌ছে আর নামছে। মানুষের কর্ম্ম এবং পুরুষকারও যদি সেই একই ভাগ্যকে বরণ করে, তবে কর্ম্মের চরম সুফল জগদ্বাসী কি পাবে? আমাদের প্রতিটি কর্ম্মকে যে শাশ্বত সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে যাওয়ার প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হ'তে হবে, এই কথাটা আমরা কেন ভুল্‌ব? অনেক বক্তৃতা দিতে গেলে এই কাজটা আর ঠিক মত করা হ'য়ে ওঠে না। বক্তৃতার অনেক গুণ আছে, দোষও আছে। গুণ অপরকে অনুপ্রাণিত করা, দোষ নিজের কাজে দস্তুরমত ফাঁকি দেওয়া।

সুরেশবাবু হসিলেন। বলিলেন,—আপনি ত' বক্তৃতা দেন পরকল্যাণ-মানসে, চাঁদা তোলবার জন্যও নয়, ভিক্ষার্জ্জনের জন্যও নয়। আপনার প্রতিটি কথা নিঃস্বার্থ পরোপকারার্থে। লাভলোভ নাই, শুধু বলা প্রয়োজন ব'লেই কথা বলেন।

ব্রহ্মচর্য্যই অভ্যুদয়ের মুলমন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথা জীবনে কম বলি নি।

ভবিষ্যতেও হয়ত আরও কত কথা বল্‌ব। সব কথাই সার্থক হয় না, যেমন মানুষের অনেক আশাই বৃথা হলনা। তবু কথা বলি। মনে মনে ভাবি, যদি কোনো একটী কথায় একটী প্রাণীরও এক কণা উপকার হয়। যখন কথা বলি, মনে হয় লক্ষ বৎসর একনাগাড়ে শুধু কথাই ব'লে যাব, দেখি মানুষে না শুনে কি ক'রে পারে। যখন লিখতে বসি, মনে করি, লক্ষ বৎসর ধ'রে রীমের পর রীম, বেইলের পর বেইল কাগজ লিখে যাব, দেখি, মানুষ না প'ড়ে কি ক'রে থাক্‌তে পারে। কিন্তু আসল গলদ ত' একেবারে গোড়ায়। শ্রোতার বা পাঠকের, কারুর নেই ব্রহ্মচর্য্য। এরা কথা শুনবেই বা কি ক'রে, লেখা পড়বেই বা কি ক'রে? মহতেরা যতই চীৎকার করেছেন "ব্রহ্মচর্য্য" "ব্রহ্মচর্য্য" ব'লে, শ্রোতারা আর পাঠকেরা যেন ততই জেদ ক'রে উন্মার্গগামী হয়েছে। ভাল কথা, দামী কথা, কাজের কথা মনে রাখতে হ'লে ব্রহ্মচর্য্য চাই। ভাল লেখা, দামী লেখা, কাজের লেখাকে প্রাণের পরতে খোদাই ক'রে নিতে হ'লে ব্রহ্মচর্য্য চাই। ব্রহ্মচর্য্যই সারাৎসার, ব্রহ্মচর্য্যই উন্নতির প্রাণ, ব্রহ্মচর্য্যই সত্যময় সুন্দর জীবনের ভিত্তি, ব্রহ্মচর্য্যই সূক্ষ্ম ও উন্নত উপলব্ধির সিংহ-দুয়ারের প্রথম সোপান। এই জিনিষটীতে অবহেলা ক'রে আমরা যে দিকেই যত উন্নতি কর্ত্তে চাই না কেন, সব মিথ্যা, সব ফক্কিকার, সব ক্ষণিকের ছায়াবাজি। আজ লক্ষ কণ্ঠে এই কথাটী উচ্চারিত হওয়া দরকার,—"ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের

অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র"। সহস্র লেখনীর মুখে এই কথাই আজ প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন যে, "ব্রহ্মচর্য্যই সকল তপস্যার মেরুদণ্ড।"

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু

কথায় কথায় ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধুর কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ফরিদপুরের শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ব্রহ্মচর্য্যের এক অত্যদ্ভুত প্রচারক। সুদীর্ঘকালব্যাপী তাঁর মৌন তাঁর মুখর-কণ্ঠ-কালের দুই চারিটি বাক্যকে যেন সজোরে দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, "ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও।" জাতি যদি ব্রহ্মচর্য্য-নিষ্ঠ হয়, তা'হলে নিশ্চয়ই পৌরুষ-প্রদীপ্ত এক মহাজাতির আবির্ভাব আমাদের মত সাধারণ মানুষ দিয়ে গড়া মানব-সমাজের মধ্য থেকেই সম্ভব হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী বিবেকানন্দ যে নবজাগ্রত এক শক্তিশালী জাতির আবির্ভাব প্রত্যাশা ক'রে জীবনব্যাপী প্রচারকার্য্য ক'রে গেলেন, তার ভিত্তি কি ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে? চালাকী আর চতুরতা দিয়ে যে সত্যিকারের জাতিগঠন হ'তে পারে না, এই কথাটী সবাইকে বজ্রকণ্ঠে তিনি শুনিয়েছিলেন। কিসের বলে তাঁর কণ্ঠে শতবজ্র যুগপৎ গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল? সে কি ব্রহ্মচর্য্যের নয়?

বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যিনি নিজে ছিলেন অমিত তপঃশক্তির একটী জীবন্ত ও অফুরন্ত আধার কিন্তু প্রচার ছিল না ব'লে জীবৎকালে অনেকেই যাঁকে চিনতে পারল না, মাত্র কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে তাঁর সংশ্রব পেয়ে ঐ ভোজবাজীকে তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষণ ব'লে ভেবে বস্‌ল, সেই অসামান্য সিদ্ধ-সাধক শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁর সুদীর্ঘ একশত ষাট বৎসরের জীবনটী দিয়ে কার মহিমা প্রচার ক'রে গেলেন? সে কি ব্রহ্মচর্য্যের নয়?

মহাপুরুষদের জীবন ও ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেকটী প্রকৃত মহাপুরুষের জীবনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত ব্রহ্মচর্য্য, মুখ্য ও গৌণ শিক্ষা ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত প্রভাব ব্রহ্মচর্য্যের। এটাই এ দেশের ধাত। আমাদের দেশের প্রকৃত ধাতকে যারা বোঝেন নাই, তাঁরা ভেবেছেন যে, ভোগবাদের মরীচিকা আর সম্ভোগ-শিল্পের চাকচিক্য দিয়ে এদেশের লোকের মন মাতান যাবে, পথ ভুলানো যাবে। ব্রহ্মচর্য্যকে উপজীব্য ক'রে এদেশে যে-কেউ নিজ জীবনের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করুন, তাঁরই পদাঙ্ক বিনা দ্বিধায়, বিনা কুণ্ঠায়, বিনা বিতর্কে এদেশের মানুষ অবনত শিরে, নম্র মনে অনুসরণ কর্ব্বে। ব্রহ্মচর্য্যকে উপজীব্য ক'রে এ দেশে যে-কেউ জনসাধারণকে জীবনের মান উন্নীত

করার সদুপদেশ দেবেন, এ দেশ তাঁর কথাই শ্রদ্ধা সহকারে মেনে নেবে, আমরণ নিষ্ঠায় পালন কর্ব্বে। প্রাচীন গ্রীস পারেন নাই, প্রাচীন রোম পারেন নাই, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য পেরেছিলেন, এমন একটী অদ্ভুত ব্যাপার ভারতের ইতিহাসে আছে। সেইটী হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিকে আবিষ্কার এবং জীবনের মূলদেশে ব্রহ্মচর্য্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার জন্য গুরুগৃহের সৃষ্টি। যেই সত্য আবিষ্কৃত হ'লে এমনটী সম্ভব, সেই সত্যই ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্মস্থল। এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আমাদের ভোলা উচিত নয়।

সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ট্রেণ ছাড়িবার হুইসিল পড়িল। সুরেশবাবু ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিলেন,—আপনি যে বিরাট চিঠির বাণ্ডিলটা সিলেট থেকে রেজিষ্টার্ড পার্শ্বেলে পাঠিয়েছিলেন, তার সবগুলি চিঠি আমি একজন একজন ক'রে আমার স্কুলের প্রায় আড়াই শত ছাত্রকে বিতরণ ক'রে দিয়েছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই পুণ্য কাজটীর জন্য ভবিষ্যতে বহুবার মানুষ আপনার কথা শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ কর্ব্বে। এরূপ সহযোগ যদি সকল স্থানের সকল স্কুলের হেড-মাষ্টাররা আমাকে দিতেন, তবে আমি দশ বৎসরে এই বিরাট দেশের সর্ব্বত্র প্রত্যেকটী চারাগাছকে কীটমুক্ত ক'রে দিতে পারতাম। আপনি ধন্য।

সুরেশবাবু বলিলেন,—মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদে আমি ত' যেন ধন্যই হলাম, কিন্তু এত ছেলের নামঠিকানা আপনি কেমন ক'রে জোগাড় কর্ল্লেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমার একটা গুপ্তচরবিভাগ আছে। একাজ তাদের।

আমি কেউ নই

শ্রীযুক্ত সুরেশবাবু বলিলেন,—অমৃতবাজার পত্রিকায় আপনার সিলেটের বক্তৃতাবলির রিপোর্ট পড়েছি। কি যে দারুণ শ্রম আপনি শ্রীহট্টে করেছেন, ভাব্‌তে অবাক্ লাগে। এত কাজের মধ্যে এতগুলি চিঠি, প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ক'রে লিখলেন কখন? প্রত্যেকটীর রচনা ভঙ্গী আলাদা, বিষয়বস্তু পৃথক্। আশ্চর্য্য ব্যাপার।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আমিও ত' অনেক সময়ে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে যাই। মনে মনে ভাবি, যাঁর কাজ তিনি কচ্ছেন। আমি আবার কে? আমি কেউ নই।

চাঁদপুর
১৪ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৪১
(২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

চাঁদপুরের শ্মশান ডাকাতিয়া নদীর পারে। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্মশানে আসিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার চাঁদপুরে আগমনের বার্ত্তা কোথাও প্রচারিত হয় নাই তথাপি যুবক-

সমাজের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কত জনের যে কত রকমের সমস্যা, এত অবাধে ও নিঃসঙ্কোচে মনের কথা ইহারা আর কোথায় খুলিয়া বলিবে?

শ্মশান দর্শন

যুবকদের ভিড় দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি প্রথমে ইহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। বলিলেন,—শ্মশানে কি লোকে আসে বাচালতা কত্তে? এখানে এলে ধীর স্থির চিত্তে মানব-শরীরের নশ্বরতা চিন্তা কত্তে হয় আর প্রতিজ্ঞা কত্তে হয় যে, বৃথা আড়ম্বরে জীবনাতিপাত না ক'রে জীবনের স্বল্প পরমায়ুটুকুকে প্রকৃত সদ্ব্যবহারে আন্‌তে হবে। মরা পোড়ার প্রয়োজন ছাড়া অন্য সময়ে যদি কেউ শ্মশানে আস, তাহ'লে এ ভাবেই সময়টুকুর ব্যবহার ক'রো। দৃশ্য হিসাবে শ্মশান একটা খুব দর্শনীয় স্থান নয়, এখানে এলে অল্প চেষ্টায় বা অনায়াসে মনের ভিতরে ভোগ্য-বিষয়ে বৈরাগ্য আসে, এইটাই হচ্ছে শ্মশান-দর্শনের শ্রেষ্ঠ লাভ।

পিতৃ-চরিত্র সংশোধন

একটী যুবক বলিল,—আমি অন্য প্রয়োজনে এসেছি। আমার একটা গুরুতর সমস্যা আছে। তার সমাধান চাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বেশ ত' বল।

—সবাইকে স'রে যেতে হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাও হে তোমরা, সবাই স'রে পড়।

যুবক বলিল,—আমার সমস্যা অত্যন্ত সঙ্গীণ। আপনি ত' উপদেশ দেন, নির্ব্বিচারে পিতামাতাকে ভক্তি কর্ব্বে। আমার মাতা জীবিত নন। পিতা আছেন কিন্তু তাঁকে ভক্তি কত্তে পাচ্ছি না। তিনি নারীতে আসক্ত। রাত্রিকালে তাঁর ঘরে রমণী-সমাগম হয়। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এগুলি আমাকে জানতে হয়েছে। পিতা যদি দুশ্চরিত্র হন, তবু তাঁকে ভক্তি কত্তে হবে? তিনি যদি মদ্যপান করেন, তবু তাঁকে ভক্তি কত্তে হবে? তিনি যদি আর্থিক ব্যাপারে পর-প্রবঞ্চক হন, তবু তাঁকে ভক্তি কত্তে হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভক্তি ত' কেউ কাউকে জোর ক'রে কত্তে পারে না বাছা। কাউকে ভক্তির যোগ্য ব'লে মনে হ'লেই ভক্তি করা যায়। তুমি তোমার পিতার যে ভাবে গুণ-বর্ণনা কচ্ছ, তিনি যদি তাই হ'য়ে থাকেন, তবে তাঁর প্রতি ভক্তির চেয়ে তোমার বেশী প্রয়োজন তাঁর প্রতি কর্ত্তব্য পালনের চেষ্টা করা। পুত্র গণিকাসক্ত হ'লে পিতা কি করেন? তাকে হিতোপদেশ দিয়ে কুপথ থেকে ফিরাবার চেষ্টা করেন। পুত্র সুরাপায়ী হ'লে পিতা কি করেন? ঠিক ঐ একটী কাজই করেন। পুত্র পরপ্রবঞ্চক হ'লে পিতা কি করেন? পুত্রকে ঐ কুপথ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা তিনি করেন। পুত্রকে তাই কত্তে হবে। কিন্তু এতে জ্যেঠামোর

ভাব প্রকাশ হবে। এজন্য পুত্র পিতাকে পাপ-পথ থেকে টেনে আনবার জন্য নিজেই উদ্যোগী না হ'য়ে, পিতা যাঁদের মানেন, গুরুজন ব'লে ভাবেন, তাঁদের দ্বারা চেষ্টা করাতে হবে। অবশ্য আসক্ত ব্যক্তিকে অনাসক্তির জগতে টেনে আনা সহজ কথা নয়। এরূপ চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে নিতান্তই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। তবু চেষ্টা কত্তে হবে। নিজেকে একটু আড়ালে রাখাই ভাল। কারণ, পুত্রের মুখে হিতোপদেশ শুনতে কোনো পিতাই বোধ হয় প্রীতি অনুভব করেন না।

যুবক বলিল,—আমার ইচ্ছা করে রাত্রিকালে সেই মেয়ে-মানুষটা যখন বাবার ঘরে প্রবেশ করে, তখন নিজে গিয়ে ঘাড়ে ধ'রে দুই থাপ্পড় মেরে তাকে বাড়ীর সীমানা পার ক'রে দিয়ে আসি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' পার না। বাড়ীর মালিকের অনুমতি ছাড়া সে এ বাড়ীতে ঢোকে নি, তাকে মারবার বা দূর ক'রে দেবার তুমি কে? দ্বিতীয়তঃ যেই মেয়ে-মানুষটার প্রতি তোমার পিতা আসক্ত, সে সম্পর্কে তোমার কেউ না হ'লেও, তোমার কাছে মাতৃবৎ সম্মাননীয়া। অর্জ্জুনকে যখন ভোগবাসনা পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ইন্দ্র উর্ব্বশীকে সমর্পণ করেছিলেন, তখন অর্জ্জুন উর্ব্বশীর মধ্যে এই সম্ভোগ-সুখ-দাত্রী রমণীকে দেখেন নি, দেখেছেন তাঁর পূর্ব্বপুরুষ পুরুর প্রীতিপাত্রী একটী নারীকে, যে নারী তাঁর মাতৃসমা। একটী গণিকাকে যে অর্জ্জুন এমন পবিত্র দৃষ্টিতে দেখতে সমর্থ

হয়েছিলেন, এটা অর্জ্জুনের দুর্ব্বলতা নয়, এটা তাঁর এক অসামান্য সবলতার পরিচায়ক। হোক্ না কোনও নারী গণিকা, অসতী, অপবিত্রা বা পাপাচারিণী, তোমার পিতার যদি সে অঙ্কগতা ক্ষণকালের জন্যও হ'য়ে থাকে, তবে তুমি তাঁকে সন্তানের যোগ্য মায়ের দৃষ্টিতেই দেখ্‌বে। এই কাজটী যদি কত্তে পার, তা' হলে ঐ রমণীর সহায়তাতেই হয়ত একদা তুমি তোমার পিতাকে পাপ-পঙ্ক হ'তে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসতে পার্ব্বে।

—আমি কি ঐ রমণীর সঙ্গে তাহ'লে পরিচয়-স্থাপন কর্ব্ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না, তা' তোমাকে কত্তে হবে কেন? আর কর্ব্বেই বা কেন? যে নিজের দেহকে পর-পুরুষের দ্বারা কলঙ্কিত কত্তে পারে, তার সঙ্গে যেচে সেধে পরিচয় স্থাপন করা কারো উচিত নয়। কিন্তু তুমি যদি নিজের মনকে পরিচ্ছন্ন রাখ এবং ভগবানের চরণে অবিরাম প্রার্থনা জানাতে থাক, একদিন হঠাৎ ঘটনাবলীর এক অত্যাশ্চর্য্য আবর্ত্তন হবে, সঙ্কট-মোচন ঘ'টে যাবে। নিজ পত্নী ব্যতীত অপর সকল নারী মাত্রেই যার নিকটে মা, তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নেই। তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং কালপ্রতীক্ষা কর। যা' চেষ্টা চালাবার, অন্যকে দিয়ে চালাও।

—আমি যদি নিজে গিয়ে সেই রমণীর শরণাপন্ন হই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঘটনাবলীর আবর্ত্তন যদি

তদনুকূল হয়, তবে তুমি তা' কত্তে পার। কিন্তু তুমি যুবক, তোমার পিতা প্রৌঢ়। তুমি নিজে গিয়ে যেচে যদি তার শরণাপন্ন হও, তবে কথার ছলে তোমাকে ভুলিয়ে দিয়ে সে আস্তে আস্তে তোমার বাবার ঘাড় মটকাবার পরিবর্ত্তে তোমারই ঘাড়ের কচি মাংসে তার দংষ্ট্রাপংক্তি বসিয়ে দিতে যে পারে না, তা' নয়। সুতরাং এ বিষয়ে তোমার সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দুষ্টা নারীর অসাধ্য কাজ নেই, আর পিতাকে পাপ থেকে রক্ষা করার চেয়ে বড় কাজ তোমার নিজেকে অপাপ-বিদ্ধ রাখা।

শ্মশানের শিক্ষা

ইহার পরে অপর যুবকেরা আসিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই শ্মশানটাতে আমি আমার কিশোর বয়সে বহুবার এসেছি, দিনে রাত্রে যখন খুশী বহুক্ষণ থেকেছি, নানা ভয় এখানে পেয়েছি আবার অভয়ও এখান থেকেই সংগ্রহ করেছি। কত রকমের কুলাচারী, তান্ত্রিক, অঘোরপন্থী দেখেছি এবং তাঁদের দুর্ব্বোধ্য কার্য্য-কলাপ দেখে অবাক্‌ও হয়েছি, দুঃখিতও হয়েছি, সুখীও হয়েছি। তোমরা আবার কল্পিত গল্প তৈরী ক'রে আমার অদ্ভুত মহিমা প্রচারের চেষ্টায় লেগে যাবে আশঙ্কায় আমি এখানকার তুচ্ছতম কথাটিও কারো কাছে বলি নাই বা বলব্ না। কিন্তু শ্মশান সত্যই এক শাশ্বত শিক্ষাদাতা। এখানে এলে ধনী-দরিদ্র সবাই সমান, জাত-

পাতের পার্থক্য এখানে বিলুপ্ত, পুণ্যবান্ আর পাপী, সকলের দেহ ঐ একই অগ্নিদেব তাঁর লেলিহান রসনা বিস্তার ক'রে উদরস্থ ক'রে নিচ্ছেন, কি বিচিত্র শিক্ষা!

ঘোড়ামারার মাঠ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাল্‌কে আমরা যাব ঘোড়ামারার মাঠে। রেল-রাস্তার দক্ষিণে বিস্তীর্ণ মাঠ। কেন এর নাম ঘোড়ামারা হ'ল সঠিক জানি না, কিন্তু আমি আমার কচি কৈশোরে সেখানে ব'সে অনেক কাজ করেছি, যার সবকথা আজ আর সম্পূর্ণ মনেও নেই।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। সঙ্গীরাও যার যার রুচি অনুযায়ী ধ্যান করিতে বসিল।

চাঁদপুর

১৫ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৪১

(২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

মাগুড়ার সুরেন্দ্র বাবু

যশোহর জেলান্তর্গত মাগুড়া হইতে ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী একখানা পত্র লিখিয়াছেন,—"বাবামণি, আপনার প্রেরিত প্রায় হাজার খানিক চিঠির একটা পার্শ্বেল আমি যথা-সময়েই পাইয়াছি। এতদিন পত্রগুলি বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই বলিয়া পত্র দিতে কুণ্ঠিত ছিলাম।

কাজ না করিয়া কেবল পত্র দিয়া আপনাকে বিরক্ত করিবার কোনও মানে হয় না। তবে একটী কথা না লিখিয়া পারিব না। তাহা এই যে, লক্ষ্য করিয়া যাইতেছি যে, আপনি অবিরাম ভ্রমণে থাকেন এবং কোথাও যদি স্থিতিকাল কিছু হয়, তবে সেইটুকু প্রাতে যোগাসন-শিক্ষাদানে এবং বিকালে ভাষণ-দানে ব্যয়িত করেন। আপনি যে একটা মহাশক্তির অফুরন্ত আধার, তাহা আপনার চরণ-সান্নিধ্যে দুই এক ঘন্টা অবস্থান করিলেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যে আপনি এত পত্র লিখেন কি করিয়া? কখন আপনি সময় পান? আপনার লেখনী কি ঝড়ের গতিতে চলে, না বিদ্যুতের গতিতে? একথা ভাবিতে ভাবিতে হতবুদ্ধি হইয়া যাই। আজ আপনাকে কেহই চিনিতেছে না বা জানিতেছে না, কিন্তু একদা আপনার এই দিব্য শ্রম-শক্তির প্রকৃত পরিচয় যুগযুগান্ত কাল পার হইলেও মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসাকে আকর্ষণ করিবে। আশ্চর্য্য হইয়া যাই যে, আপনি বিকাশোন্মুখ তরুণদের নাম ও ঠিকানা এত অধিক সংখ্যায় এবং এমন নির্ভুল ভাবে সংগ্রহ করেন কি করিয়া? পত্রগুলি বিতরণ-কার্য্যে নিয়োজিত আমার প্রিয় ব্যক্তিরা বলিয়াছে যে, আপনার এক একখানা পত্র ঠিক যথাপাত্রেই পড়িয়াছে। যে পানাসক্ত ব্যসনী, তাহাকে আপনি ঠিক ঐ বিষয়টাতেই লিখিয়াছেন। যে নারীলুব্ধ লম্পট, তাহাকে আপনি ঠিক যথাস্থানে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিয়াছেন। যে জীবন-

গঠনে বিশেষ ভাবে আগ্রহী, তাহাকে আপনি ঠিক সময়োপযোগিনী মৃতসঞ্জীবনী সুধা পরিবেশন করিয়াছেন। যোগীদের যোগশক্তিকে মানুষে বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমি এসব দেখিয়া করিতে বাধ্য হইয়াছি।”—ইত্যাদি।

আত্মসমর্পণে অভেদত্ব আসে

পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি সংক্ষেপে লিখিলেন,—

“আমার কর্ম্মকৌশল পরমেশ্বরে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ। তাহাকে সব দিতে পারিলেই, যাবতীয় লভ্য লাভ করিব। এই সংক্ষিপ্ত কথাটুকুর মধ্যেই আমার চিন্তা, আচরণ, কর্ম্ম ও শ্রমের রহস্যটুকু পাওয়া যাইবে। যন্ত্র যখন যন্ত্রীর হাতে পূর্ণতঃ গৃহীত হয়, তখন যন্ত্র আর যন্ত্র থাকে না। তখন সে যন্ত্রীর সহিত অভেদ হইয়া যায়। আত্মসমর্পণে অভেদত্ব আসে।”

ছোট ভাবেই কাজ সুরু কর

জনৈক জিজ্ঞাসু-মহিলা মেয়েদের হিতার্থে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মেয়েদের হোক্ আর ছেলেদের হোক্, কোনো প্রতিষ্ঠান গড়্‌তে হ'লেই গোড়াতেই একটা বিশ্ববিদ্যালয়রূপে তাকে খাড়া কত্তে হবে, এমন সঙ্কল্পের কোনো মানে হয় না। সৎ-প্রতিষ্ঠান ছোটো থেকেই ক্রমশঃ

বড় হয়। তোমার শক্তি-সাধ্য যদি অধিক থাকে কিম্বা অনুকূল সুযোগ সব যদি আসে, উত্তম, বড় ভাবেই কাজ সুরু কর। কিন্তু খুব বিরাট ক'রে যদি প্রতিষ্ঠান না কত্তে পারি, তবে আর এ কাজে হাত দিবই না, এরূপ জেদকে গোঁয়ার্ত্তুমি ছাড়া আর কোনো আখ্যা দেওয়া যায় না। অবশ্য, তুমি যদি একটা জাহাজ তৈরীর কারখানা বা কামানের কারখানা স্থাপন কর, তবে যত ছোট ক'রেই তা' কর, নিম্নতম হিসাবে কত্তে গেলেও তা' একটা বিরাট ব্যাপারই হবে। সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সে কথা খাটে না। ছোট ভাবেই কাজ সুরু কর, দুটী শিক্ষার্থিনী নিয়েই প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হোক্, একজনমাত্র শিক্ষাদাত্রী দ্বারাই সূচনা কর, কিন্তু সাময়িক বা আকস্মিক কোনও বিঘ্ন-বিপত্তিতেই কখনো টল্‌বে না। নিজের কাজ শক্ত ভাবে ধ'রে রাখ্‌বে। ঝড় যত প্রবল হবে, তুমি তত জোরে হাল ধর্‌বে, তত জোরে দাঁড় টান্‌বে। এর ফলে একদা তোমার প্রারব্ধ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানই একটা মহৎ প্রতিষ্ঠানে, বিরাট, বিশাল, বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হ'য়ে একদা ব্যাপক জনহিতের ব্যবস্থা কর্ব্বে।

প্রতি পল্লীতে মহিলা-প্রতিষ্ঠান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেক গ্রামে, এমন কি বড় বড় গ্রামের প্রত্যেক পাড়ায়, এক একটা ক'রে এমন প্রতিষ্ঠান মেয়েদের জন্য গ'ড়ে তোলা দরকার, যাতে ঐ গ্রামের বা ঐ

পাড়ার প্রত্যেক মেয়ে অবসর সময়ে হাতের মুঠার মধ্যে একটা কাজ পায়, যে কাজ বিত্তশালিনী মেয়েকে কুচিন্তার অনুশীলন থেকে রক্ষা কর্ব্বে, যে কাজ দরিদ্র মেয়েকে দুমুঠা ক'রে সদুপায়ে অর্জ্জিত পবিত্র অন্ন দান কর্ব্বে, যে কাজ মধ্যবিত্ত অবস্থার স্বল্পদারিদ্র্য মেয়েদের হাতে সৎকাজে ব্যয়ের জন্য অল্প হ'লেও অর্থ তুলে দেবে। শুধু প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপিত হ'লেই খুবকিছু হ'য়ে গেল, একথা মনে করা ভুল। তারপরেও প্রয়োজন এমন শিক্ষা, সংস্কার ও অনুশীলনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা, যার ফলে প্রত্যেক মেয়ের মনে সতীত্বের জাগ্রত মহিমা দৃঢ়মূল হয়, যার ফলে সতীত্ব রক্ষার জন্য প্রত্যেক মেয়ে অবহেলে প্রাণ দিতে পারে, যার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ধনাধীশ্বরের কুবের-ভাণ্ডারকেও যে তার সতীত্বের সম্ভ্রমের সাথে তৌলের অযোগ্য ব'লে জ্ঞান করে। কিন্তু এতেও হবে না। তার পরে তার প্রয়োজন এমন দক্ষতাকে আয়ত্ত করা, এমন সুযোগকে প্রাপ্ত হওয়া, এমন ব্যবস্থাকে কাজে আনা, যার ফলে সে নিজের মুখের গ্রাসের জন্য নিজ স্বামী ব্যতীত অপর কাহারও মুখাপেক্ষিণী হ'তে বাধ্য না হয় এবং যেখানে স্বামীর সে মুখাপেক্ষিনী হবে, সেখানেও তার দ্বারা যাতে স্বামীর অন্নার্জ্জনের শ্রম লঘু হ'তে পারে, সে যেন স্বামীর শুধু সহধর্ম্মিণী না থেকে, সহকর্ম্মিণী, সহশ্রমিণী এবং সহার্জ্জিনী হ'তে পারে। যারা কুমারী বা বিধবা, তাদের ত' এই বিষয়ে পূর্ণ নির্ভর নিজের উপরেই থাকা দরকার।

মহিলা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে দশটা ভিন্ন ভিন্ন মহিলা-প্রতিষ্ঠান যখন এভাবে গঠিত হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন এই দশটার মাঝে যোগসূত্র সৃষ্টি করা প্রয়োজন হবে। একের সাথে এক মিলে দুই হয়, দশের সাথে দশ মিলে বিশ হয়, এভাবে মালার মত একটা সুশৃঙ্খল সঙ্ঘ গ'ড়ে উঠ্‌বে। তখন যদি এখানে ওখানে একটা দুটা বিক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠান একই ভাবের অনুপ্রেরণায় গ'ড়ে উঠে, তাহ'লে সেই ফুলগুলিকে মূল মালাটীর সাথে জু'ড়ে নিয়ে ক্রমশঃ মালাটী বড় হবে। দেশজননীকে যদি আমরা নিষ্কাম নিঃস্বার্থ সেবা-প্রতিষ্ঠানের দিব্য-সুরভি মালা পরাতে চাই, তবে কিন্তু মা এই ভাবে পারি।

শিক্ষা ও সতীত্বের সংস্কৃতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিক্ষা, সংস্কৃতি আর সুভিক্ষতা, এই তিনটী সমবায়ে হবে মহিলা-প্রতিষ্ঠানের পূর্ণতা। শিক্ষা মানে আক্ষরিক শিক্ষা, লেখাপড়া শিক্ষা। সংস্কৃতি মানে সতীত্বের প্রতি সম্ভ্রমবোধের, সতীত্বের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনপনেয় দৃঢ় বিশ্বাসের, সতীত্বরক্ষার প্রয়োজনে আত্ম-বিসর্জ্জনের ও আততায়ী হননের কঠোর সঙ্কল্পের এবং অপরের সতীত্ব রক্ষার সাহায্যার্থ অগ্রসর হবার রুচির সংস্কৃতি। একবার নয়, দুবার নয়, শতবার সহস্রবার, মনের ভিতরে সতীত্বের

মহিমাকে, সতীত্বের মর্য্যাদাকে পূজা দিতে হবে। দিতে দিতে যখন এটা তোমার স্বভাবে গিয়ে পরিণত হবে, তখন বলব, এটা তোমার সংস্কৃতি। এদেশের অনেক মেয়ে, নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু অপর অভাগিনী সীতার মর্ম্মবেদনায় তাকে সাহায্যহস্ত প্রসারিত ক'রে দিতে কুণ্ঠিত। এই ত্রুটি, এই অসম্পূর্ণতা দূর কর্ত্তে হবে।

সুভিক্ষতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তারপর হচ্ছে, সুভিক্ষতা অর্থাৎ সহজে অন্নার্জ্জনের উপায় হওয়া, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অন্নার্জ্জনের পথ সুগম হওয়া। সুভিক্ষতার মানে এই নয় যে, সবাই ভিক্ষা কর্ব্বে এবং সেই ভিক্ষা সুলভ হবে। শাব্দিক মানে যাই হোক, সুভিক্ষতার প্রকৃত মানেই হচ্ছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ যোগ্য জীবিকায় লেগে থেকে সৎপথে সদুপায়ে আবশ্যকীয় পরিমাণ অন্ন অর্জ্জন কর্ত্তে পারে। প্রয়োজনের চেয়ে সহস্রগুণ উপার্জ্জনে প্রলুব্ধ হ'য়ে একদল চতুর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপর দল অপেক্ষাকৃত সরল ও কালানভিজ্ঞ ব্যক্তির পকেট কাট্‌তে সুযোগ পাক্, এর নাম সুভিক্ষতা নয়। সুভিক্ষতার মানে, যার যেমন আবশ্যক, সে তেমন পাবে, কেউ অনাহারে থাক্‌বে না, কেউ শীতে বস্ত্রহীন, বর্ষায় ছত্রহীন, ভ্রমণে পাদুকাহীন, নিদ্রায় শয্যাহীন থাক্‌বে না।

সুভিক্ষতার আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুভিক্ষতা ব্যতীত কোনও সভ্যতার প্রকাশ, বিকাশ বা বিস্তার সাধিত হ'তে পারে না। ভারতের শ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্রগুলি সেই সময়কার প্রণয়ন, যেই সময়ে দুর্ভিক্ষ কেউ জানত না। হজরত মহম্মদ আর গুরুগোবিন্দ সিংহ যে দুই জনে দুই শক্তিশালী সম্প্রদায় দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সৃষ্টি কর্ত্তে সমর্থ হলেন, তার পশ্চাতের অর্থনৈতিক ভিত্তির কথা অনেক ইতিহাসবেত্তারই হয়ত চখে পড়ে না। তা' হচ্ছে এই যে, তুমি যদি মুসলমান হও বা শিখ হও, তুমি সঙ্গে সঙ্গে তোমার জীবিকার জন্য নিশ্চিন্ত, তোমার ধর্ম্মের সেবায় তোমাকে সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ কত্তে হবে, তোমার জীবিকার ব্যবস্থা কর্ব্বেন তোমার রসুল, কর্ব্বেন তোমার গুরুজী।

মহিলাদের সুভিক্ষতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মায়েরা তোমরা প্রতিষ্ঠান সুরু কর ছোট ক'রেই, কিন্তু তার ভবিষ্যৎকে ভাবো খুব বড় ক'রে। প্রত্যেকটী মেয়ের সুভিক্ষতার ব্যবস্থা তোমরা করবে। প্রত্যেকটী মেয়ে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে অতিক্রম কর্ব্বার শক্তি অর্জ্জন কর্ব্বে, তাদের আত্মশক্তির এক পৌরুষপূর্ণ প্রবোধন ঘটাতে হবে। এই ভাবে তোমরা কাজ ক'রে যাও।

বিরাট ভবিষ্যৎ তোমাদের এই চেষ্টাকে অভিনন্দন কর্ব্বার জন্য জয়মালা-হস্তে দাঁড়িয়ে আছে।

পুরাতন দীক্ষাকে ঝালাইয়া লওয়া

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত জারইলতলা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দশ বৎসর যাবৎ দীক্ষা নিয়াছ, কিন্তু এযাবৎ দীক্ষা-প্রাপ্ত মন্ত্রের সাধন কর নাই, ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মন্ত্র নেয় লোকে সাধন করিবারই জন্য, কিন্তু তুমি সাধন-মন্ত্রকে যত্ন করিয়া আলমারিতে তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছ। কিন্তু তজ্জন্য অনুতাপ করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আজ দশ বৎসর পরেও যখন সেই মন্ত্রের কথা মনে পড়িয়াছে, তখন আর বৃথা কালহরণ না করিয়া অবিলম্বে মন্ত্রের সুতীব্র সাধনে প্রবৃত্ত হও এবং মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন সঙ্কল্প কর। এতদিন সাধন কর নাই বলিয়া এখন আর একবার সেই মন্ত্রেরই নূতন করিয়া দীক্ষা ঝালাইয়া লইবে, এইরূপ কোনও আবশ্যকতা আমি দেখি না। পূর্ণ দশ বৎসর পূর্ব্বে তোমাকে যখন আমার প্রাণারাম প্রিয়তম মন্ত্র দান করিয়াছিলাম, সেই দিন তোমার প্রতি আমার অন্তরের বিগলিত স্নেহ-ধারা যে পরিমাণ মধুর ও কোমল ছিল,

আজও তাহাই আছে। মন্ত্রের সাধনে এতদিন অনাদর করিয়াছ বলিয়া আমার পর হইয়া যাও নাই এবং আমার স্নেহচ্ছায়াতল হইতে দূরেও যাইতে সমর্থ হও নাই। অনুদিন অনুক্ষণ আমার স্নেহদৃষ্টি তোমার পিছন পিছন ধাইয়াছে। চঞ্চল মনের অনিবৃত্ত কৌতূহলের অদমিত তাড়নায় তুমি কত বার কত দিকে ধাবিত হইয়াছ, কিন্তু আমার স্নেহ তোমাকে একবারের জন্যও এক অনুপলের জন্যও পরিত্যাগ করে নাই। এই কথা বিশ্বাস করিয়া সেই দশ বৎসর পূর্ব্বেকার প্রাপ্ত দীক্ষাকেই অদ্যকার প্রাপ্ত দীক্ষার ন্যায় একেবারে সতেজ, সজীব, টাট্‌কা ও তরুণ জ্ঞান করিয়া নবোৎসাহে নবোদ্যমে নবপৌরুষে সাধনব্রতী হও। পুরাতন দীক্ষাকে নূতন করিয়া ঝালাইয়া নেওয়া কখনও কখনও সত্যই আবশ্যক হয়, কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন দেখি না। যে স্থলে দীক্ষা গ্রহণের পরে কেহ অতি গুরুতর ভাবে বিপথগামী হইয়া স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে, কিম্বা যেখানে কাহারও বলপ্রয়োগ, ভয়প্রদর্শন, অমানুষিক উৎপীড়ন প্রভৃতির দরুণ কেহ অনিচ্ছায় নিজ ধর্ম্মের প্রধান প্রধান অনুশাসনকে পদবিদলিত করিতে বাধ্য হইয়াছে, সেই স্থলে তাহার মনে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, নির্ভর ও বিশ্বাসের শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য পুরাতন দীক্ষাকে নূতন করিয়া ঝালাইয়া লওয়া আমি অনর্থক মনে করি না। কিন্তু তোমার পক্ষে ঝালাইবার কোনও আবশ্যকতা নাই। যোগি-ঋষি-দেবগণের চিরারাধ্য নামকে বিনা ক্লেশে ও অতি সহজে

পাইয়া তাহার প্রতি তোমার অবহেলা জন্মিয়াছিল, এই মাত্র তোমার অপরাধ। আজ যখন সেই নামের পবিত্র সেবায় জীবনোৎসর্গ করিবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা অন্তরে উত্তাল তরঙ্গ মালার সৃষ্টি করিতেছে, তখন একটী মুহূর্ত্ত দেরী না করিয়া এবং পুরাতন দীক্ষাকে নূতন করিয়া ঝালাইয়া নিবার চেষ্টামাত্রও না করিয়া প্রেমময় হৃদয়ে নামের অকপট সেবায় লাগিয়া যাও বাবা।"

নিষ্ঠা ও মত-পরিবর্ত্তন

যশোহর জেলান্তর্গত লক্ষ্মীপাশা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে কোনও একটা গোঁড়ামিকে জেদ করিয়া ধরিয়া রাখার মত মূর্খতা আর কিছু নাই। অথচ, জগতে গোঁড়ামি না থাকিলে, জেদ না থাকিলে অনেক অসাধ্য-সাধন সম্ভব হইত না। বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া ক্ষুদ্রতর কর্ম্মের কৌশল পরিবর্ত্তন করা চলিতে পারে, ইহাতে দোষের কিছু নাই। লোকে নিন্দা করিতে পারে, কিন্তু সেই নিন্দা অর্থহীন। নিন্দা-রূপ বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে লোকের আচরণের দোষ এবং ত্রুটি সংশোধনের জন্যে। যেরূপ মত-পরিবর্ত্তনের দ্বারা তুমি তোমার বৃহত্তর উদ্দেশ্যের আনুকূল্যই সাধন করিয়াছ, যেরূপ মত-পরিবর্ত্তনের দ্বারা তুমি তোমার মূল লক্ষ্যকে অধিকতর আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছ বা হইতেছ, সেইরূপ

মত-পরিবর্ত্তন সরল লোকের চক্ষে দোষ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দোষ নহে। যাহা চক্‌চক্ করে, সব সময়েই তাহা সোণা নহে, আবার যাহা লম্বা হইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকে, সব সময়েই তাহা সাপ নহে। পরিস্থিতির বিবেচনায় গোঁড়ামি এবং জেদ অথবা মত ও পথের পরিবর্ত্তন প্রশস্য বা দূষ্য হইয়া থাকে। একটা নির্দ্দিষ্ট মতে বা পথে দৃঢ় অবিচল অটল নিষ্ঠা, কঠিন মেরুদণ্ড ও অনুশীলিত চরিত্রের পরিচয় দিয়া থাকে। আবার, প্রয়োজনস্থলে কৌশল ও চলনভঙ্গীর পরিবর্ত্তন-সাধন রণক্ষেত্রের সৈন্যাধ্যক্ষের পক্ষে কার্য্যকালাভিজ্ঞতা, দক্ষতা, রণ-চাতুর্য্য এবং বুদ্ধিশক্তির পরিচায়ক হইয়া থাকে। সুতরাং আমি স্বীকার করিব যে, দুইটীরই নিজস্ব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র আছে।

সাধনে নিষ্ঠার আবশ্যকতা

"কিন্তু একজন তপঃপথাবলম্বী আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষে নিষ্ঠার অভাব এক অতীব মারাত্মক ব্যাপার বলিয়া আমি মনে করি। মানুষের জীবনে এত বড় দুর্দ্দৈব আর কিছু হইতে পারে না। প্রাণ গেলেও যেমন সতী নারী নিজ সতীত্ব-গৌরবকে লজ্জিত হইতে দিতে পারেন না, প্রাণ গেলেও তেমনি কোনও সাধক-ব্যক্তি নিজের সাধন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্য দিকে দৃষ্টি দিতে অধিকারী নহেন। ধর্ম্মতত্ত্ব যে শুনিবে, সে গুর কাছে যাইবে, তার কাছে যাইবে, দশজনের কাছে

দশ রকম কথা শুনিবে এবং হাঁ-জী হাঁ-জী করিতে থাকিবে। কিন্তু সাধন যে করিবে, সে একটী মত লইয়া একটী পথ লইয়া একটী মন্ত্রে একটী তন্ত্রে পরম সত্য লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবিচল ভাবে লাগিয়া থাকিবে। সে তাহার নিষ্ঠার ব্যভিচার কিছুতেই ঘটিতে দিবে না।"

সিরাজগঞ্জগামী ষ্টীমারে
১৮ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৪১
(২রা মার্চ্চ, ১৯৩৫)

ষ্টীমারে উঠিয়াই নিজের হারিকেনটী জ্বালাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন,—

আত্মদান মহাব্রত

যশোহর জেলান্তর্গত নড়াইল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রত্যেক আত্মোৎসর্গপরায়ণ মহান্ কর্ম্মী নিজ নিজ ভঙ্গীতে এক একজন স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁহারা নিজেদের এবং জগতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন অনেক স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, যাহাকে সাধারণ মানুষ বাস্তব-বুদ্ধি-সম্মত বা কাণ্ড-জ্ঞান-সম্মত বলিয়া মনে করিবে না। এই কারণেই সাধারণের দৃষ্টিতে তাঁহারা পাগল ব্যতীত আর কিছুই নহেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, পাগল না হইলে কেহ কোনও একটা মহৎ কর্ত্তব্যের যূপকাষ্ঠে ধন, মান, প্রাণ, জীবন, যৌবন-

সুখাভিলাষ বলি দিতে পারে না। যে নিজেকে বলি দিতে পারে নাই, সে নিজের জীবনকে আপন বলিয়া কখনো পায় না। মনুষ্য-জীবন পশুর জীবন নহে। এই জীবন নিজেকে দান করিয়া দিয়াই হয় সার্থক। কি তোমার সুমহৎ লক্ষ্য, তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু এইটুকু সত্য বলিয়া জানি যে, নিষ্কাম নিঃস্বার্থ হিতবুদ্ধিতে নিজের জীবনকে বিলাইয়া দিবার সামর্থ্যের মধ্য দিয়াই তুমি তোমার মনুষ্যত্বকে জানিবে, জাগাইবে এবং সার্থক করিবে। আত্মদানই মহাব্রত। সেই আত্মদানে স্বার্থগন্ধ থাকিবে না। সেই আত্মদান কাম-কলুষে কলঙ্কিত হইবে না। সেই আত্মদান বিশ্বাত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তির জন্য। সেই আত্মদান মনুষ্য-জাতিকে উন্নততর এক দেবজাতিতে পরিণত করিবার জন্য।"

জীবনদানের খেলা

ঢাকা জেলান্তর্গত রোয়াইল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবন-দানের খেলাই প্রকৃত খেলা। সৎকার্য্যে, সদুদ্দেশ্যে, সৎ-প্রেরণায়, সদ্‌বুদ্ধিতে, সৎসাহস-সহকারে জীবনের পূর্ণ মূল্য আদায় করিয়া নিয়া ইহা নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দেওয়াই জীবনের পরম সার্থকতা। কোন্ জাতি, কোন্ সমাজ, কোন্ দেশ, কোন্ ধর্ম্ম তাহার ছায়াশীতল পরিবেশ দিয়া তোমাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা যদিও ভুলিয়া থাকা

তোমার পক্ষে সম্ভব নহে এবং সেই জাতি, সেই সমাজ, সেই দেশ ও সেই ধর্ম্মের প্রতি তোমার পূর্ণ আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতা-বোধ অটুট রাখিয়াও তোমাকে চিন্তায় ও কার্য্যে একটী বিশ্বমানবে রূপান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। নিখিল বিশ্বের মানবজাতি একটা সুনির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা-পরম্পরায় নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীনে ক্রমশঃ উন্নততর ও বিকশিততর হইতে হইতে যদি আজিকার মানবে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই মানবজাতিকে সামগ্রিক ভাবে এমন একটা ভাবী জীবনে প্রবেশ করিতে হইবে, যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদবুদ্ধি তিরোহিত, সবলে দুর্ব্বলে অকারণ সংঘাত নির্ব্বাসিত, যেখানে মানুষের ভিতরে দৈবী সম্পদ সহজাত সংস্কারের ন্যায় প্রতিভাত এবং যেখানে তোমার আমার আজিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্যাসায়ত্ত সদ্‌গুণ বিরাট স্বাভাবিক চারিত্রিক অলঙ্কার-রূপে আপনা আপনি বিকশিত। স্বাভাবিক পশুত্বের সহিত পুরুষানুক্রমে সংগ্রাম করিয়া মানুষ বর্ত্তমান সামাজিক মনুষ্যত্বে ও যূথ-বন্দিত সদাচারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই পুরুষানুক্রমিকতার অভ্যস্ত-পথে চলিয়াই তাহাকে তাহার সুপ্ত পশুত্বের দিব্যায়ন বিধান করিয়া নূতন দেবজাতির পত্তন করিতে হইবে। আজিকার যুগের মানুষ হইয়া জন্মিয়াছ বলিয়াই তোমার উপরে এই দায়িত্ব আপনা আপনি চাপিয়াছে। এই দায়িত্ব তুমি এড়াইয়া যাইতে পার না এবং এই দায়িত্বকে স্বীকার করিতে হইলেই নিজের

স্বার্থকে সঙ্কুচিত করিবার প্রশ্ন প্রবল ভাবে আসিয়া পড়ে। সমগ্র বিশ্বের যে হিতসাধন করিবে, বিশ্ববাসী প্রতি-জনের সুখের জন্য তাহার আত্মোৎসর্গ করা ছাড়া আর গত্যন্তর কি? কেবল নিজেকে নিয়া ব্যস্ত, ত্রস্ত ও প্রমত্ত রহিলে এই বালাই নাই। কিন্তু তুমি সব খেলার সেরা খেলাটি খেলিতে চাহ এবং বিবেকবান্, বিচারশীল, বিবেচক মন কখনো হেলায় খেলায় জীবন কাটাইয়া দিতে পারে না। সে চাহে খেলার মতন খেলা। যে খেলা সুরু করিলে আর শেষ নাই, যে খেলা শেষ হইলে আর নূতন করিয়া সুরু করিতে হয় না। সেই খেলা জীবনদানের খেলা। আমি দিনরাত্রি গুণগুণ করিয়া কেবল গান গাহি,—

আমায় তুমি শিখাও প্রভো
জীবন-দানের খেলা,
কেমন ক'রে ভাসাতে হয়
অকূল-মাঝে ভেলা।"

বড় কাজ

ঢাকা জেলান্তর্গত আড়াইহাজার-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একা একা কেহ হয়ত মহৎ কাজ করিলে করিতে পারে কিন্তু বৃহৎ কাজ করিতে পারে না। বৃহৎ-কিছু করিতে হইলেই দশ জনের সহযোগ চাই, বিশ জনের সমর্থন চাই,

পঞ্চাশ জনের সাগ্রহ সশ্রদ্ধ সুস্মিত স্নিগ্ধ দৃষ্টি চাই। বহুজনের জন্য যে কাজ, তাহাতে বহু জনের বাহু-সংযোগ করাইতেই হইবে। তোমার অহং বা আমার দাম্ভিকতা যদি বহুজনের একত্র সমাবেশ এবং বহু জনের ঐক্যতানকে বিঘ্নিত বা ছন্দোভ্রষ্ট করে, তবে তোমার বা আমার দ্বারা হয়ত কখনো মহৎ কর্ম্ম কিছু হইলেও হইতে পারে কিন্তু বৃহৎ কর্ম্ম কখনো হইবে না। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে, সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে—কলিযুগে সঙ্ঘবদ্ধতার মধ্যেই শক্তি রহিয়াছে নিহিত। কিন্তু কলিযুগে কেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগেও সঙ্ঘের মহিমা প্রকীর্ত্তিত রহিয়াছে। দেবী ভগবতী যে মহিষাসুরমর্দ্দিনী হইলেন, তাহা কি একার বলে, না তেত্রিশ কোটী দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রভাবে? রামচন্দ্র যে লঙ্কাজয় করিলেন, তাহা কি একার শক্তিতে, না কোটি কোটি বানর-সৈন্যের সহায়তায়? সঙ্ঘবদ্ধতার মহিমাতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগুলির মধ্যেও মহদ্‌গুণের বিকাশ ঘটে, মহাবলের প্রকাশ হয়। নীরব পল্লী-কুটীরে যোগাসনে বসিয়া ধ্যান-চর্চ্চা করিতে হইলে একা একা সাধনের চেয়ে ভাল পন্থা নাই কিন্তু বিশ্বব্যাপী অজ্ঞতা-বিদূরণ, অন্ধতা-বিদূরণ, দারিদ্র্য-বিদূরণ, কুসংস্কার-মোচন, কুক্রিয়াসক্তির অপসারণ প্রভৃতি ব্যাপক কর্ম্মায়োজন চালাইতে হইলে একা একা মাত্র সদভিলাষ পোষণই করিতে পার, সেই অভিলাষের পূরণ আর সম্ভব হয় না। এই জন্যই বৃহৎ, ব্যাপক, সুবিস্তারিত কর্ম্মসূচী নিতে হইলে চারিদিকে

নিজের ভাবগুলির প্রচার করিয়া সমভাবের ভাবুকদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, তাহাদিগকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের আপন হইতে হয়, নিজের কর্ম্মানুরাগ ও নিষ্ঠাকে তাহাদের ভিতরে সঞ্চারিত করিয়া দিতে হয়, তাহাদের শ্রম, তাহাদের সেবা, তাহাদের ত্যাগ যে জগৎকে এক অভিনব সুষমায় মণ্ডিত করিবে, তাহার বিমোহন আলেখ্য তাহাদের মানস-নয়নের সুমুখে তুলিয়া ধরিতে হয়। তাহাদিগকে নূতন জীবনের নূতন জগতের স্বপ্ন দেখাইতে হয়, এবং নিজেও সেই স্বপ্নে মজিয়া যাইতে হয়। বড় কাজ বড় কাজ বলিয়া চীৎকার করিলেই বড় কাজ হয় না, যে-কোনও ছোট কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া সেই কাজে দশের হাত, দশের মন, দশের প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারিলেই অতীব ছোট্ট তুচ্ছ কাজটীও একটী বৃহৎ ব্যাপারে পরিণত হইয়া যায়। সকলের প্রাণে প্রাণ মিলাও, বড় কাজ আপনি সমাধা হইবে।"

স্বদেশসেবা ও বিশ্বমুখীনতা

পাবনা জেলান্তর্গত স্থল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যখনই যে কাজটী কর, মনে মনে একটা সূক্ষ্ম চিন্তার অবিরাম ধারা রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করিও যে, তোমার প্রতিটি কর্ম্মের শুভফলের অধিকারী কেবল, তুমিই নহ,

তাহার অংশভাক্ বা অধিকারী হইতেছে তোমার জাতি, তোমার সমাজ, তোমার দেশ, তোমার এই বিশাল ভুবন এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের নিখিল মানবজাতি। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যত কাজ করিতেছ, মন ও মননের দ্বারা যত বিষয় অনুধাবন করিতেছ, কল্পনা ও ভাবুকতা দ্বারা যত বিষয়কে স্পর্শ করিতেছ, একাগ্র ধ্যান ও পরম নিবিষ্টতা দ্বারা যত বিষয়ে প্রগাঢ় ভাবে ডুবিতেছ, সব-কিছুর শুভফল একা তোমার নহে, নিখিল বিশ্বের সকলের। এই শুভফল তোমাকে নিজ হাতে বিতরণ নাও করিতে হইতে পারে কিন্তু যাহারা অধিকারী, তাহারা ঠিক সময় মতন নিজ নিজ পানপাত্র পূর্ণ করিয়া এই ফুলের মধু, এই ফলের রস নিশ্চিতই পান করিয়া লাভবান্ হইবে, ধন্য হইবে, কৃতার্থ হইবে। নিজের দেহ, মন, প্রাণকে, নিজের হৃদয়, চিত্ত ও চেতনাকে, নিজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে, নিজের কল্পনা, ধ্যানকে, নিজের আগ্রহ ও উত্তরণকে, নিজের গতি, মতি ও প্রকৃতিকে এই ভাবে বিশ্বকুশলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবার যৎসামান্য অভ্যাসই তোমাকে এমন অসাধারণ শক্তিমত্তার আধার করিবে যে, আজ তুমি তাহা শত কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারিবে না। আমি তোমাদের প্রতিজনকে বারংবার যে নিজ নিজ পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে উপদেশ দেই, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা কেবল তোমার পিতামাতা নহেন, তাঁহারা এক হিসাবে সমগ্র ভাবী

বিশ্বের জনক ও জননী। আমি তোমাদের প্রত্যেককে যে বারংবার নিজ সমাজের ও জাতির প্রতি কৃতজ্ঞ ও সেবাপরায়ণ থাকিতে উপদেশ দেই, তাহার কারণ এই যে, এই সমাজ এবং এই জাতি সমগ্র বিশ্বসমাজের ও বিশ্বজাতির একটী অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ। ইহার সুস্থতার ও সবলতার প্রয়োজন জগতেরই কল্যাণের জন্য রহিয়াছে। আমি যে তোমাদের প্রত্যেককে স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল দেখিতে চাহি, আমি যে তোমাদের প্রতিজনকে হৃৎপিণ্ডের শোণিতোৎসর্গের বিনিময়েও দেশমাতৃকার চরণবন্দনা করিবার বীর্য্যময়ী প্রেরণা নিরন্তর বিলাইয়া যাইতেছি, তাহাও কেবল এই, তোমার স্বদেশ ঐ সমগ্র বিশ্বের একটী অপরিহার্য্য, অপরিবর্জ্জ্য অংশ বলিয়াই। বিশ্বমুখী মন কদাচ নিঃস্ব হয় না। অনন্ত অফুরন্ত অপরিমেয় ও অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের তুমি অধিকারী হইবে তখন, যখন তোমার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিশ্বমুখী হইবে। স্বদেশ-সাধনায় নামিয়া বিশ্বমুখীনতা হারাইও না। বিশ্বমুখী হইতে গিয়া স্বদেশকে ভুলিও না।"

পিতামাতাকে ভুলিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—"আরও ভুলিও না তোমার পিতামাতাকে। জগতের মানুষের যত শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ, সব-কিছুই পিতামাতার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধাকে

অবলম্বন করিয়াই বিকশিত হইয়াছে। ঐখানে জীবনের প্রথম ভালবাসাকে শিখিলে, যেই ভালবাসা রূপান্তরের পর রূপান্তর পাইতে পাইতে কত পাত্রে, কত অপাত্রে, কত পুরুষে, কত নারীতে, কত পূজ্যজনে, কত স্নেহভাজনে, কত বিচিত্রতায়, কত মঞ্জুলতায়, কত সৌন্দর্য্যে, কত কবিত্বে নানা দিকে নানা ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিল। জগতের সব রকমের সবটুকু ভালবাসা তোমার মাতারই স্তন-যুগলের মধ্যস্থলে যেন সহস্র কৌস্তুভের মত সুসজ্জিত হইয়া সংগুপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছিল। কোটি কোটি ভৃঙ্গ-কোকিলের মধু-গুঞ্জন তাহার মধ্য ছিল সম্পুটিত। যাহা কিছু মধুর, মেদুর, মহনীয় ও আশ্চর্য্য, সব কিছুই ঐ স্নেহময়ী মায়ের বক্ষ-স্পন্দন হইতে তুমি আহরণ করিয়াছ। একথা তোমার রক্তমাংসের প্রতি পরতে, প্রতি অণুতে, তোমার শরীরের প্রতি তন্তুতে, প্রতি গ্রন্থিতে, প্রতিটি শোণিত-বিন্দুতে, প্রতিটি জীবকোষে অলোপ্য অক্ষরে লিখিত আছে। পিতা ও মাতা তোমার যাবতীয় সদ্‌গুণাবলির প্রথম মূলধন প্রদান করিয়াছেন, যাহার যোগ্য বিকাশ সাধিতে থাকিলে তুমিই একদা দোষেগুণে গড়া তুচ্ছ এক মানব-সমাজের মধ্য হইতে সর্ব্বগুণান্বিত স্বাভাবিক সম্পদ-সমূহের সহজাত প্রতিভায় দেদীপ্যমান দিব্য এক নব-নর-সমাজ গড়িয়া তুলিবার গোত্র-প্রতিষ্ঠাতা পিতৃপুরুষে পরিণত হইবে।"

গুরুভক্তি ও পিতৃমাতৃভক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"আরও একটী কথা বলিব। তোমরা প্রায় প্রতি জনেই গুরুভক্তি, গুরুভক্তি বলিয়া খুব উৎসাহ সহকারে বাক্যোচ্চারণ করিয়া থাক, কিন্তু তোমাদের নিকটে আমার প্রশ্ন এই যে, যে নিজ পিতামাতাকে ভক্তি করিতে পারে না, সে কি সত্য সত্যই গুরুতে ভক্তিমান্ হয়? অশেষরূপে ঋণী রহিয়াও যে নিজ পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে পারে না, সে কি একটী মন্ত্রদানের জন্য তার গুরুদেবের কাছে সত্য সত্য কৃতজ্ঞ হইতে পারিবে? পিতার দুঃখে, মাতার ক্লেশে যাহার প্রাণ কাঁদে না, সে কি গুরুদেবের কোনও ব্যাপারে সেইরূপ প্রাণবত্তা নিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে, যাহা প্রকৃত গুরু প্রকৃত শিষ্যের কাছে প্রত্যাশা করিতে পারেন? তোমাদের অধিকাংশেরই যে গুরুভক্তি একান্ত মেকী এবং একেবারে বন্ধ্যা, তাহার প্রধান কারণ ত' হইতেছে এই যে, তোমরা মাতাপিতার প্রতি অকৃতজ্ঞ। না, পিতামাতাকে অবহেলা করা চলিবে না। তাঁহাদের সেবা তোমাকে করিতেই হইবে। তাঁহারা তোমার নিকটে যতগুলি আশা-প্রত্যাশার দাবী রাখিয়াছেন, সবই তুমি পূরণ করিতে সমর্থ না হইতে পার কিন্তু তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও ভক্তিমান্ তোমাকে হইতেই হইবে। ভক্তির যোগ্য আচরণ কেহ না করিলে গায়ের জোরে ভক্তি আদায় করা যায় না, এই কথা

মানি কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তোমার জন্মদানের কারণ হইয়া ইঁহারা ভাবী মানবজাতির জন্য নূতন সেবককে জগতে অবতরণের সুযোগ দিয়াছেন, এই কথাটি অস্বীকার করিবে কি করিয়া? কৃতজ্ঞ তোমাকে থাকিতেই হইবে, নতুবা ভাবী মানবকুলের ধারাবাহিক উন্নয়নের স্বাভাবিক স্রোতের মাঝখানে তুমি জটিল আবর্ত সৃষ্টি করিয়া স্বাভাবিক বিবর্তনকে এবং সাধককুলের উদ্বর্তনকে বিঘ্নিত করিবে।"

গুরু কি ভগবান্

দুই জনের ভিতরে তুমুল তর্ক চলিতেছিল। বিষয়—গুরু কে। অনেক যুক্তি-বিনিময়ের পরে দুই পক্ষই যখন নিরস্ত হইলেন, তখন শ্রীশ্রীবাবামণি লেখনী থামাইলেন। কাগজ-কলম গুছাইয়া সুটকেসে ভরিলেন এবং নিজের হারিকেনটী নিবাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নিয়া বলিতে লাগিলেন,—কে গুরু হয় আর কে গুরু নয়, এ নিয়ে কলহে কোনো লাভ নেই। গুরুই পরমেশ্বর কি না, এই তর্কও নিষ্প্রয়োজন। কারণ পরমেশ্বর-বোধ এসে গেলে আর কথা কইবার ভাষাও থাকে না, কথা কইবার শক্তিও থাকে না। কোনও বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে পরমেশ্বর-বোধ না আসা পর্য্যন্ত তাকে পরমেশ্বর ব'লে বর্ণনাও ঠিক নয়, ওটা বরং এক হিসাবে মিথ্যা কথা বলা বা অতিশয়োক্তি করা। স্ত্রী স্বামীকে প্রাণেশ্বর বলে কিন্তু সত্য সত্যই কি স্বামী তার প্রাণের ঈশ্বর? স্বামী তার স্ত্রীকে

প্রাণেশ্বরী বলে, কিন্তু সত্য সত্যই কি স্ত্রী তার প্রাণের ঈশ্বরী। প্রাণেশ্বর বা প্রাণেশ্বরী সম্বোধন একটা অতিশয়োক্তি বা আংশিক মিথ্যাকথন, কিন্তু এটা একটা কাব্য। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক কাব্যময়, তাই এখানে অতিশয়োক্তিকে মিথ্যাকথন বলি না, বলি এটা কাব্যের একটা অলঙ্কার, ভাষার একটা মধুর প্রয়োগ, মনোভাব ও মনোভঙ্গীর এক বিচিত্র মধুময়ত্ব। এই কাব্যে আনন্দ আছে কিন্তু পাপ নেই। এই কাব্যে আবেগ-বিভোরতা আছে কিন্তু দোষ নেই। কেউ যদি অন্তরের গভীর আবেগে গুরুকেই "ভগবান্ স্বয়ং" ব'লে মনে ক'রে থাকে, তবে ওটা তার একান্ত নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র, ওটার সঙ্গে তার কাব্যময়ী অনুভূতিরই যোগাযোগ, আমার বা তোমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, সে তার গুরুকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর জ্ঞান ক'রে তৃপ্তি পায় ব'লে আমার বা তোমার নিন্দার বা সমালোচনার কিছু নেই। কিন্তু আমি নিজে যতক্ষণ নিজ গুরুতে ভগবানের সত্তাকে স্পষ্ট অনুভব না কর্ব্ব, ততক্ষণ তাঁকে ভগবান্ ব'লে প্রচার করা আমার পক্ষে অসত্যাচরণ ও কপটতা হবে।

আদি দীক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রকৃত গুরু ত' তিনি, যিনি সকলের গুরু। যেমন বলতে পারি, প্রকৃত পিতা ত' তিনি, যিনি সকলের পিতা। পরমপুরুষ পরমেশ্বরই সর্ব্বজীবের

একমাত্র গুরু, আদি গুরু, নিত্যকালের গুরু এবং অবিকারী গুরু। তিনি রূপ ধ'রে মানুষের কাছে আগে ধরা দেন নি, ধরা দিয়েছেন নাম ধ'রে, নাম রূপে, নাদ স্বরূপে, জ্ঞানের ভিতর দিয়ে হোক্ বা না হোক্ প্রাণের ভিতর দিয়ে সঙ্গীত-ঝঙ্কারে, গুরু মানুষের কাছে ধরা দিলেন। গর্ভস্থ শিশু ভ্রূণাবস্থায় মাতৃজরায়ুতে ব'সে ব'সে নিজ হৃৎস্পন্দনের মধ্য দিয়ে তাঁকে শুনল, তাঁকে শুন্‌ল ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণে নিজের ফুস্‌ফুসে বায়ুগ্রহণ-ব্যপদেশে নিঃশ্বাসরূপে আর চীৎকার ক'রে ওঁয়া ওঁয়া ডাকবার কালে নিজ কণ্ঠে। তাঁকে শিশু শুন্‌ল তার মাতার, ধাত্রীর, পিতার, পরিজনবর্গের সাদর সস্নেহ সম্বোধনের মধ্য দিয়ে। চোখে দেখার আগেও সে কাণের চোখে গুরুকে এভাবে বারংবার নানা পরিচ্ছদে দেখতে পেল। এগুলিই তার দীক্ষা এবং একে বল্‌তে পারি আদি দীক্ষা, যেখানে মানুষ বা উপলক্ষ্যটী অপ্রধান। কাণের ভিতর দিয়ে যিনি মরমে প্রবেশ কর্লেন, সেই নাদব্রহ্মকে বারংবার শোনাই তার দীক্ষা এবং শিক্ষা আর এই নাদই তার আদি-গুরু।

মানুষ-গুরুর আবির্ভাব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু শব্দ ব্রহ্মেরই কত বিচিত্রতা। হৃদ্‌স্পন্দনে তাঁর যা' রূপ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ঠিক্ তাই নয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁর যা' রূপ, ক্রন্দনে বা

বাক্যোচ্চারণের চেষ্টায় তা' নয়। ক্রন্দনে বা কথনে তাঁর যে রূপ, সঙ্গীতে বা মন্ত্রোচ্চারণে ঠিক তাই নয়। একটা জীবন্ত সত্তাই যেন একবার উচ্চ হ'য়ে, একবার নীচ হ'য়ে, একবার কোমল হ'য়ে, একবার কঠোর হ'য়ে, একবার বীণাবিনিন্দিত হ'য়ে, একবার বজ্রগর্জ্জনের দম্ভকেও চূর্ণ ক'রে দিয়ে কত বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে এসে কাণের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছেন। যিনি এই নানাত্ব বা বিচিত্রতার চিত্তচমৎকারী চাপল্যের ভিতরে একত্বের সরল রেখাটি দেখিয়ে দিয়ে বললেন,—ইদমেব নিত্যং, ইদং ব্রহ্ম, সব-কিছুর ভিতরের অবিনাশী অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত সত্য এই মহামন্ত্র, এঁকে ব্রহ্ম ব'লে জানো,—তাঁকে আমরা গুরু ব'লে বন্দনা ক'রে ব'লে থাকি, শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্—এই আমি শিষ্য হ'লাম, আমাকে শাসন কর, পরিচালন কর, আমি তোমার কোমল চরণকমলে অন্তর-প্রার্থী। মানুষ এভাবেই জীবের গুরু হ'লেন।

গুরু তর্কাতীত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুকে নিয়ে তর্ক কর্ত্তে নেই। যার গুরু যিনিই হৌন আর শিষ্যের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গুরুর যে ক্ষেত্রে যা-ই হ'য়ে থাকুক, গুরু-স্মরণে পরোক্ষ ভাবেও যদি পরমবন্ধু পরমপাবক পরমেশ্বরের কথা স্মৃতিপথে জাগে, তবে বৃথা কথায় কালক্ষেপ ক'রে সময় নষ্ট না ক'রে তৎক্ষণাৎ নামের সাধনে একাগ্র মনে লেগে যেতে হয়।

গুরুদেব সম্পর্কে পাঁচ জনের পাঁচ রকমের মন্তব্য বা অভিমত থাকতে পারে বা থাকাই স্বাভাবিক কিন্তু কার দৃষ্টিতে গুরু কি বস্তু, এই কথাটার চেয়েও দামী কথা হচ্ছে এই যে, গুরুদেবের কথা স্মৃতিপথে জাগরিত হ'লে কার অন্তরে সাধন-রুচির জোয়ার বইতে শুরু করে বা কার করে না। আমি কিম্বা তুমি একাগ্র মনে একান্ত চিত্তে অসীম বিশ্বাস সহকারে সাধন কর্ব্ব, এই জন্যই ত' গুরুর আবশ্যকতা। আমরা আমাদের গুরুদেবের মহিমা নিয়ে তর্কাতর্কি কর্ব্ব, এজন্য কেউ কদাচ গুরুবরণ করে না। গুরুকে রাখ তর্কাতীত এবং তাঁর কথা স্মরণ পড়া মাত্র তাঁর প্রদত্ত প্রেমময় নামের সাধনে মগ্ন হ'য়ে যাও,—গুরুতে অনুরক্তির এইটী হবে সব চেয়ে বড় শুভফল।

গুরুবাদ ও অবতার-বাদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুকে ভগবান্ ব'লে ভাবা এবং প্রচার করা গুরুবাদের বিশেষত্ব। গুরু মেনেও অনেকে গুরুবাদের ধার ধারেন না, এরূপ দেখা যায়। তাঁরা যদি গুরুদত্ত সাধন মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে কেবল সাধন ক'রে যান, তবে তাঁরাও জীবনে নিশ্চয় পরমা সিদ্ধি অর্জ্জন কর্ত্তে সমর্থ হবেন। গুরুবাদের সহোদর ভাই হ'ল অবতার-বাদ। স্বয়ং ভগবান্ যুগে যুগে মানুষ-রূপে আবির্ভূত হন এবং সাধুদের পরিত্রাণ করেন, দুষ্কৃতের বিনাশ করেন, এইটী হ'ল অবতার-

বাদের মূল সূত্র। কোন্ দিন ভগবান্ কোন্ ভাগ্যবানের ঘরে মানুষ-রূপে আবির্ভূত হ'লেন, তা' তুমি আমি কেউ জানি না। হঠাৎ জ্ঞানিজনদের আবির্ভাব হ'ল, তাঁরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা এবং মনের ধারণা অনুযায়ী নিজ নিজ প্রাণমনোহর কোনও মহাজনকে অবতার ব'লে চিনিয়ে দেবার চেষ্টায় নামলেন। কেউ বল্ল, শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাও। কেউ বল্ল, তোমার প্রমাণ গ্রাহ্য নয়। কেউ বল্ল, তোমার ঐ অবতারের চেয়ে বড় অবতার আমাদের গ্রামে আবির্ভূত হ'য়েছেন, আমরা তার সাক্ষী। কেউ বল্লেন,—অতীতে হাজার হাজার অবতার আবির্ভূত হয়েছেন, ভবিষ্যতে আরও কত জন আবির্ভূত হবেন, তার ঠিক কি? তোমার এই নূতন অবতার আমরা মানি না। জোর ক'রে মানাতে চাইলে আমরা লাঠি ধ'রে প্রতিবাদ কর্ব্ব। ইত্যাদি কত রকমের যে আন্দোলন আর প্রত্যান্দোলন হ'তে থাক্ল, ঠিক নেই। কালচক্র আবর্ত্তিত হ'তে লাগল। অনেক অবতার চির-বিস্মৃত হ'য়ে গেলেন, কোনো কোনো অবতার এক এক যুগে এক এক রকম ক'রে ব্যাখ্যাত হ'তে লাগ্‌লেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বয়ং বিশ্বপতি অবতার হ'য়ে এলেও সমগ্র বিশ্ব একবাক্যে কোনও একজনকেও মানল না। এক এক দেশে এক এক অবতার এক এক যুগে এক এক প্রকারে পূজিত হ'তে লাগ্‌লেন আর আমরা অবতারের ভক্তেরা নিজেদের মধ্যে

কলহ বাধিয়ে প্রাণপণে কখনো যুক্তির লড়াই কখনো বা কুস্তির লড়াই কত্তে লাগ্‌লুম। গুরুবাদে যেমন ঝামেলা, অবতারবাদে তেমন নানা ঝামেলার সৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল। আমরা নিরীহ জীব, আমরা একবার এদিকে একবার সেদিকে তাকিয়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে ভাবতে থাকি কোন্ দিকে যাই। এই নিদারুণ দুঃসময়ে আমাদের একমাত্র ভরসা ভগবানের নাম। গুরু মানো আর না মানো কিম্বা গুরুকে ঈশ্বর ব'লে ভাবো আর না ভাবো, নাম কর। অবতার মানো বা না মানো, ভগবানের নামকে সত্য ব'লে জানো এবং সেই নামের সেবায় অকপট হও।

বলাই বাহুল্য, কথা শুনিতে চারিদিকেই অনেক লোকের ভিড় হইয়াছিল। তাঁহারা প্রত্যেকটী কথা যেন স্তব্ধ-শ্রবণে শুনিতেছিলেন।

সমবেত জপযজ্ঞ এক মহামিলন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এতক্ষণ ত' কেবল কথাই হ'ল। কথা শুনতে সকলেই তো বোধ হয় ভালবাসেন। আসুন না আমরা একটু কাজও করি। যে যেমন অবস্থায় আছেন, নিজ নিজ স্থানে ব'সে পড়ুন। চক্ষু বুজুন। মনে মনে ভাবুন যে, পবিত্র সলিল-প্রবাহ আপনার সমস্ত শরীরের

উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে, আপনার দেহ যাবতীয় অপবিত্রতার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে।—এর নাম হ'ল মানস স্নান। মানস স্নানটী সমাপ্ত ক'রে নিজ নিজ ইষ্টনাম জপে লেগে যান। ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ, ভিন্ন ধর্ম্মের লোক পাশে ব'সে আছে ব'লে কুণ্ঠার প্রয়োজন নেই। যার মত-পথ যত ভিন্নই হোক, সব মত-পথই ভগবানকে নিয়ে। যার যার ভগবৎ-সম্বন্ধীয় ধারণা পরস্পর থেকে আলাদা হ'লেও যেই ভগবানকে নিয়ে এত ধারণা আর চিন্তা, সেই ভগবান্ দুই নন, তিনি এক এবং সকলের পক্ষেই অপরিহার্য্য। বাইরের চোখ্‌টা খুললেই মাত্র দেখতে পাই, তুমি একরূপ বেশধারী, আমি অন্যরূপ বেশধারী, বাইরের কাণ খুললেই শুনতে পাই, তুমি এক দেশের ভাষাভাষী, আমি আর এক দেশের ভাষাভাষী। কিন্তু চোখ-কাণ বুজে যখন তুমি আমি সকলে নিজ নিজ জীবন-প্রভুর স্মরণ নেই, তখন যুগপৎ আমাদের বহু ভাষার, বহু মন্ত্রের, বহু তন্ত্রের আরাধনার প্রতিটি বিন্দুবিসর্গও তিনি স্পষ্ট শুনতে পান, তিনি বধিরও নন, তিনি জগতের কোনো ভাষাতেই অপণ্ডিতও নন। সবাই মিলে চোখ বুজে যে অভিনিবিষ্ট চিত্তে নামজপ করা, একে আমি নাম দিয়েছি জপযজ্ঞ। এস যারা ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাঁরা ব'সে পড়। সবাই মিলে এক সাথে আমরা পরমেশ্বরের নামে লীন হব। এ মিলন এক মহামিলন।

ষ্টীমারে জপযজ্ঞ

যতক্ষণ ষ্টীমারটী সিরাজগঞ্জ-ঘাটে আসিয়া না পৌছিল, ষ্টীমারের অন্যান্য যাত্রীদের নানা রূপ কোলাহলের মধ্যেও, ততক্ষণ নীরব নাম-জপযজ্ঞ চলিতেই থাকিল। দুই চারিজন অল্প কিছু সময় চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় জপ করিবার পরে সম্ভবতঃ শারীরিক ক্লেশ বোধ করার দরুণ উঠিয়া গেলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপর দর্শকেরা আসিয়া ঐ শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে লাগিলেন এবং নয়ন নিমীলিত করিয়া জপে বসিলেন। সমস্ত ষ্টীমারটী জুড়িয়া কাণে কাণে এই কথাটী পৌছিয়া গেল যে, কোথা হইতে কে একজন সাধু আসিয়া সব জাতির লোককে লইয়া জপে বসিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক প্রস্তাবে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান তিন ধর্ম্মের লোকই এই পুণ্য কাজটীতে ছিলেন। ইহা এক মহাবিস্ময়।

মনের কাজই আসল কাজ

ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিবার সময়ে ষ্টীমারের সারেং আসিয়া দেখা করিলেন। বলিলেন, ষ্টীমার-পরিচালনের দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া আসা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, নতুবা তিনিও এই জপাধিবেশনে নিশ্চয় যোগ দিতেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি প্রসন্ন কণ্ঠে বলিলেন,—মনে মনে যে যোগ দিয়েছেন, তাতেই আপনার কাজ হয়েছে। জপ আর

ধ্যান দুটোই মনের ব্যাপার। আমরা মন দিয়ে যে কাজটী করি, সেটাই আমাদের আসল কাজ। শরীর দিয়ে বা লোক দেখিয়ে যে কাজটী করি, সেটা মনের কাজের তুলনায় অনেক গৌণ, কারণ, হয় এটা মনেরই চিন্তার প্রতিফলন, নয় এটা শুধু অভ্যাসের দাসত্ব।

পরম লাভ

সিরাজগঞ্জে পৌছিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার শ্রীরমেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের বাড়ী উঠিলেন। শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শৈলবালা সেন শ্রীশ্রীবাবামণির আগমন-প্রতীক্ষায় সারাদিন উপবাস করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—সারাদিন সবাই উপবাসী থাকতে গেলে কেন গো!

শ্রীযুক্তা শৈলবালা বলিলেন,—যতক্ষণ উপোসে ছিলাম, ততক্ষণ অবিরাম আপনার শ্রীচরণ চিন্তা করেছি। এটা কি আমাদের কম লাভ?

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বলিলেন,—পরম লাভ, পরম লাভ।

পরম সত্য

শ্রীমতী শৈলবালা বলিলেন,—বাবামণি, আপনার কৃপা পেয়ে আমার জীবন আলোকিত। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও

আমি এখন আমার পথটুকু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমি আপনাকে নিয়ে অনেক অলৌকিক ব্যাপার দেখেছি। আপনার নিষেধ, তাই আমি সেগুলির বর্ণনা কারো কাছে করি না। কিন্তু আমার নিকটে কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রভৃতি সব দেবদেবী একটী মাত্র বিগ্রহে লীন হ'য়ে গেছে। আমি আপনার ভিতরে এঁদের সবাইকে দেখতে পাই। এঁদের সকলের ভিতরে এক আপনিই পরম সত্য রূপে বিরাজ কচ্ছেন, এটা আমি অনুভব কত্তে পারি। এমনকি আপনি ছাড়া জগতে আর কোনও বস্তুর যে অস্তিত্বই নেই, তাও অনেক সময়ে আমার কাছে একেবারে প্রত্যক্ষ ও প্রকট হ'য়ে পড়ে। আমার এ সব অনুভূতি কি সত্য?

শ্রীশ্রীবাবমণি বলিলেন,—মাগো, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন যাঁর কৃপায়, তুমি আমার মধ্যে তাই দর্শন কচ্ছ তাঁরই কৃপায়, তাঁরই মহিমায়। এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। কিন্তু তবু যদি জিজ্ঞেস কর, সত্যই আমি ব্রহ্মা কি না, বিষ্ণু কি না, মহেশ্বর কি না, কালী কি না, দুর্গা কি না, লক্ষ্মী বা সরস্বতী কি না, তা' হ'লে আমাকে স্বীকার কত্তেই হবে, আমিই সব, সবই আমি। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে কেন, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত-কোটী সৌরজগৎ এবং ততোধিক গণনাতীত দেবগণ সহ সবই আমাতে, আমিই সবকিছুর রূপায়ণ ক'রে বহির্বিশ্বে বিকশিত হয়েছি। কিন্তু এ'ত হচ্ছে অনুভূতির কথা। একথা বাইরে

প্রচার কত্তে নাই। অন্তর দিয়ে সাধন কর আর যখন যা বুঝতে পার, যত্ন ক'রে হৃদয়ে ধ'রে রাখ। অন্তরের ধন বাইরে প্রকাশ ক'রে হাটুরে এক সস্তা জিনিষে পরিণত ক'রো না।

শ্রীমতী শৈলবালা বলিলেন,—কিন্তু এটা যে আমার পক্ষে পরম সত্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য চিরকাল সব চেয়ে গোপনে সুরক্ষিত থাকে। তাকে কেউ বাজারে বের করে না।

সিরাজগঞ্জ
১৯শে ফাল্গুন, ১৩৪১
(৩রা মার্চ্চ, ১৯৩৫)

সাম্প্রদায়িকতার প্রতীকার

শ্রীশ্রীবাবামণির আগমন-বার্ত্তা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এমন ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, নানা সম্প্রদায়ের বহু লোক প্রাতঃকাল হইতেই দর্শনার্থে ভিড় করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় মুসলমানও ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাম্প্রদায়িকতার অবসান কি ক'রে হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাম্প্রদায়িকতার মত ক্ষতিকর বস্তু জাতির পক্ষে আর কিছু নেই। কিন্তু এর প্রতীকার কত্তে হ'লে আগে স্থির হওয়া চাই যে, সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হ'ল

কিসের প্রশ্রয়ে। আমার ধর্ম্ম ভাল, তোমার ধর্ম্ম মন্দ,—সাম্প্রদায়িকতার এটা একটা লক্ষণ। আমি উচু, তুমি নীচু,—সাম্প্রদায়িকতার এটা একটা স্থায়ী কারণ। কিন্তু যার ধর্ম্মমত আর কর্ম্মপথ যাই হোক্, আমাদের পরমোপাস্য পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, দুই নন, ভিন্ন নন, আমাদের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্ত্তা এক,—এই বোধ অন্তরে জাগলে সাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারে না।

আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ ও সাম্প্রদায়িকতা

প্রশ্ন হইল,—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বীদের মধ্যে অবাধ বিবাহ প্রচলিত হ'লে কি সাম্প্রদায়িকতা দূর হবে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হ'তেও পারে, নাও পারে। কারণ, দুই বিভিন্ন সমাজের নরনারীর মধ্যে বিবাহ হ'লে ঐ দুইটী নির্দ্দিষ্ট নরনারীর মধ্যে হয়ত ঐক্য আসা সহজ কিন্তু সামাজিকবর্গ ত' সঙ্গে সঙ্গে একত্র মিশে যাবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তা' হতে দেখা যায়ও না। সুতরাং মনের ভাবের দিক থেকে উদারতার চর্চ্চা হচ্ছে প্রকৃত প্রতীকার, কারণ এই চর্চ্চা প্রথমে গুটিকতক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক্‌লেও আস্তে আস্তে বিরাট্ ও ব্যাপক বিস্তারের বিপুল সম্ভাবনা রাখে। যেই চেষ্টায় বাধাবিঘ্ন যত কম, তার দ্রুত সফলতার সম্ভাবনা তত বেশী। সবাইকে সবার ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথের সম্পর্কে

জ্ঞান সংগ্রহ কত্তে হবে, তবেই জন্মাবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা ছাড়া প্রকৃত ঐক্যবোধ আসে না।

অন্যান্য অনেকে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সহাস্য আননে উত্তর দিয়া যাইতে লাগিলেন।

ভগবৎ-সাধন ও রোগারোগ্য

জিজ্ঞাসুদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভগবদুপাসনা করলে কি রোগ সারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ বাবা, ভগবদুপাসনা করলে রোগও সারে। শরীরের রোগ সারে, মনের রোগ সারে, জ্ঞাত রোগ সারে, অজ্ঞাত রোগ সারে। কোনোটা সম্পূর্ণই সারে, কোনোটা বা আংশিক সারে। অল্প হোক, অধিক হোক, রোগ সারে, এটা ধ্রুব সত্য। কেন সারে? মনটী স্থির হয় ব'লে সারে। দেহেরই বল আর মনেরই বল, আমাদের যখনি যে রোগ হয়, তার অনেকেরই উৎপত্তিস্থল মনের অস্থিরতা, চঞ্চলতা, উদ্বেগ এবং অশান্তি। আর, আমাদের যখনি যে রোগ হোক্, মন যদি থাকে অশান্ত ও চঞ্চল, তাহ'লে সুচিকিৎসার স্থলেও রোগ সারতে দেরী হয়। কিন্তু ভগবানে মন সমর্পণ কত্তে পারলে মনের উদ্বেগ, অশান্তি, অস্থিরতা ও উচ্চাটন অবস্থা দূর হ'য়ে যায়। এই জন্যই বল্‌ছি যে, ভগবৎসাধনে রোগ সারে, দেহ-রোগও সারে, ভব-রোগও সারে।

ভগবৎ-সাধন না করিলে কি নীরোগ থাকা যায় না

প্রশ্ন হইল,—যারা ভগবৎ-সাধন করে না, তারা কি নীরোগ থাকতে পারে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খুব পারে, যদি বুদ্ধিতে হয় স্থির, বিশ্বাসে হয় অকপট, শরীরের যত্নে থাকে আগ্রহ, শরীরকে কর্ম্মোপযোগী এবং সুস্থ রাখার জন্য যে যে নিয়ম-পালন আবশ্যক, যদি সেগুলি করে পালন এবং যদি বিপদে না হারায় ধৈর্য্য, দারিদ্র্যে না হারায় চরিত্রবল, প্রলোভনে না ভুলে যায় জীবনের সৎসঙ্কল্প। কিন্তু ভগবৎসাধন ধৈর্য্য দেয়, চরিত্রবল দেয়, দেয় সঙ্কল্পকে নিয়ত সুস্থির রাখার রুচি, প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য।

ভগবৎ-সাধকের রোগ

প্রশ্ন,—কেন, সাধক পুরুষদের কি রোগ হয় না? অনেক মহাপুরুষকেও ত' কলেরা, বসন্ত, ক্যানসার প্রভৃতি রোগে ভুগে মরতে দেখা যায়!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে কথা ঠিক। শরীর যখন আছে, তখন তার অন্তটুকু কোনো ব্যাধি হ'য়ে গেলে ওটা অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছু হয় না। কিন্তু যে অসুখ সাধারণ লোকের হয়, ভগবৎ-সাধকদের তা' বড় হয় না। আর যে

পরিমাণ ক্লেশ ভগবৎ-সাধকেরা দেহের উপর দিয়ে সহ্য ক'রে যেতে পারেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা' কল্পনাতীত ব্যাপার। এ সামর্থ্য আসে তাঁদের ভগবন্নির্ভর থেকে আর এই নির্ভর আসে তাঁদের ভগবৎ-সাধন থেকে। তাঁরা এটা জানেন। তাই, নিম্নস্তরের সাধক বা উচ্চকোটির সাধক প্রত্যেকেই দুঃখার্ত্ত জীবকুলকে ডেকে ডেকে বল্ছেন, কেউ বা কেঁদে কেঁদে অশ্রুধারায় বুক ভাসাতে ভাসাতে বল্ছেন, ওরে তোরা ভগবানকে ভুলে থাকিস না রে, তাঁকে ডাক, তাঁর মধুময় নাম বারংবার মনন ক'রে, স্মরণ ক'রে, কীর্ত্তন ক'রে মনকে ধন্য কর, স্মৃতিশক্তিকে কর সার্থক, রসনাকে কর মধুময়।

ভগবানের নাম প্রচারোপলক্ষ্যে লোকপ্রবঞ্চনা

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—ভগবানের নাম কর, নাম কর ব'লে আন্দোলন তুলে একদল বিচক্ষণ ও চতুরলোক নির্ব্বোধ লোকদের ঠকিয়ে ঠকিয়ে বেশ একটা প্রবঞ্চনার ব্যবসা খুলে বসেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ কেউ যে এরূপ করেছেন বা কচ্ছেন, একথা গায়ের জোরে অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। কিন্তু একশত জন প্রবঞ্চক যদি মানুষকে ঠকিয়েও থাকে

আর মাত্র একজন খাঁটি লোক যদি মানুষকে না ঠকিয়ে তার উপকারার্থে ভগবানের নামকে প্রচার ক'রে থাকেন, তবে তৌল করলে দেখা যাবে যে, একশত জন জগতের যতটুকু ক্ষতি করেছে, একজন লোক, মাত্র একজন খাঁটি লোক, তার দশগুণ উপকার জগদ্বাসীর করেছেন, করতে পেরেছেন।

মহতের আবির্ভাবের জন্য পবিত্র পরিবেশ চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা নিজেরাই প্রবঞ্চিত হ'তে ভালবাস। এই জন্যই ত' দিকে দিকে প্রবঞ্চকদের আবির্ভাব ঘট্‌ছে! তোমরা যদি খাঁটি মানুষকে পাবার জন্য ব্যগ্র থাক্‌তে, তা হ'লে অধিক সংখ্যায় খাঁটি লোকের আবির্ভাব নিয়তই ঘট্‌ত। তোমরা তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে জুচ্চোরী ক'রে ধরা না পড়্‌লে নিজেদিগকে মনে মনে তারিফ দাও, তোমাদের প্রিয়জনেরা জুচ্চোরী ক'রে ধরা না পড়লে তাকে বাহাদুর ব'লে অভিনন্দন জানাও, যে যত বেশী ঘুষ খায়, সেই লোকটাকে তোমরা তত কাজের মানুষ ব'লে জ্ঞান কর, তোমাদের সামনে ভগবানের দোহাই দিয়ে জুয়াচোরেরা এসে দাঁড়াবে না, আর দাঁড়াবেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিররা, এমনটা আশা কর কি ক'রে? প'ড়ে পরীক্ষায় পাশ কর্ব্বে না, তোমাদের ছেলেরা খাতা টুকে নকল ক'রে

অসদুপায়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তারপরেও তোমরা লজ্জিত হও না। পাওনাদার বাড়ীতে এলে ছেলেকে মিথ্যা কথা শিখিয়ে দিয়ে তাকে চ'লে যেতে কর বাধ্য। তোমাদের কাছে ধর্ম্মরাজ আর দেবরাজ এসে হাজির হবেন ধর্ম্মদেশনা কত্তে, এটা আশা কর কেন? একটা জাতির যখন অভ্যুদয় ঘটে, তখন তার সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পায় সততার দ্যুতি, স্বচ্ছতার জ্যোতি, স্বচ্ছন্দতার ভাতি। চাকুরে, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ছাত্র, উকিল, মক্কেল, বিচারক ও আসামী সকলের মধ্যে যখন খেলা চলেছে দুর্নীতির তাসের, তখন তুমি কি ক'রে আশা কর্ব্বে যে, ভজনে ভজনে সৎলোকেরা আবির্ভূত হ'য়ে তোমাদের কাছে ভগবানের নামের মহিমা কীর্ত্তন কত্তে থাকবেন? একটা জাতি যখন ঊর্দ্ধমুখে ওঠে, তখন কেবল তার ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, নাট্যকার, গায়ক, বাদক শ্রেণীর মধ্যে উন্নতস্বভাবের বিকাশ ঘটে না, তার চোর, ডাকাত, গণিকার পর্য্যন্ত চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটে। সবাই সেই কথাটী মনে রেখে যখন কালের বালুকা-বিস্তারের উপরে চরণ-চিহ্ন অঙ্কন কত্তে সুরু করে, তখন ভণ্ড সাধুর সংখ্যা আপনা আপনি কমে যায়। প্রবঞ্চকের প্রাদুর্ভাবকে যদি সীমিত কত্তে চাও, তবে প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা কর যে, নিজে নিজের জীবনে কোনও অবস্থায় প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিবে না।—আসল ঔষধ এইখানে। মহতের আবির্ভাবের জন্য সুপবিত্র পরিবেশ চাই।

মহাপুরুষের আবির্ভাবের পটভূমিকা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশ, জাতি বা জগৎ যখন গুরুতর ভাবে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয় বা মারাত্মক কোনও দুরবস্থায় উপনীত হয়, সেই সময়ে কখনো কখনো অলোকসামান্য কোনও শক্তিধর অত্যাশ্চর্য্য মহাপুরুষ দুই-চার জন আবির্ভূত হন এবং অবনতির স্রোতকে বিপরীতগামী ক'রে মানুষের জীবনাদর্শকে উচ্চস্তরে তোলেন, একথা সত্য। কিন্তু প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, প্রতি বৎসরে এমন শক্তিধরের আবির্ভাব সম্ভব নয়। প্রতিদিন বা প্রতি মাসে যাঁরা জন্মাচ্ছেন, এমন আদর্শদাতা পুরুষেরা যাতে সত্যি সত্যি আদর্শদাতাই থাকতে পারেন, তার জন্য তাঁদের চাই অনুকূল পরিবেশ, অনুপন্থী পরিজন। দুর্জ্জনেরা বাধা দিবে, পরিবেশ থাক্‌বে দারুণভাবে বিরুদ্ধকারী, চতুষ্পার্শ্বের বাতাস, বাষ্প, জল, স্থল সবকিছু থাক্‌বে বিষাক্ত গ্যাসে পরিক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ, আর তার মাঝ থেকে কর্দ্দমজাত পঙ্কজের মত ঝুড়িতে ঝুড়িতে কুড়িতে কুড়িতে কেবল মহাপুরুষ আবির্ভূত হ'তে থাকবেন, এটা আশা করা চলে না। একটা সত্যিকারের মহাপুরুষের আবির্ভাবের পিছনে হাজার হাজার লোকের তপস্যার পুঞ্জীভূত আবেদন থাকে, এই কথাটা তোমরা অনেকে জানো না। একটা অসাধারণ মানুষ কেবল

একার সুকৃতিতে অসাধারণ হন না, আরো কত কত জনের কত ত্যাগ, কত শ্রম, কত ঘর্ম্মবিন্দু, কত অশ্রু তাদের গমনপথের মসৃণতা বাড়িয়েছে, একথা কয় জনে জানে? দেশে সজ্জনের সংখ্যা যদি বাড়াতে চাও, তাহ'লে দিকে দিকে আত্মগঠনের, আত্ম-শোধনের, আত্মোৎসর্গের এবং আত্মিক অনুশীলনের উদ্যম বাড়াতে হবে। সৎ, সাধু, মহৎ মানুষ নেই ব'লে ব'লে আক্ষেপ করলে বা কারো উপরে আক্রোশ রাখলে ফল হবে না।

মহত্তের আবির্ভাবের জৈবিক পটভূমিকা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একজন মহাপুরুষের আবির্ভাবের জৈবিক পটভূমিকাটুকু ত' নির্ম্মাণ করেন তার মা ও বাবা। পিতামাতা যে তপস্যায় নিজেদের তনুমনকে করেছেন উৎসর্গীকৃত, সেই তপস্যার অনুকূল মনোবৃত্তি, রুচিপ্রবৃত্তি, ও প্রবণতাগুলি নিয়ে যে তাঁদের সন্তান আবির্ভূত হবে, এটা একটা সহজ যুক্তির কথা। অনেকে লক্ষ্য করলে এর প্রমাণও নিজেদের সংসারে অহরহ পেয়ে থাকে। খেয়াল-খুশীর মারফতে নয়, প্রবল সৎসঙ্কল্পের মধ্য দিয়ে পিতামাতা যখন পুত্র বা কন্যার জনকজননী হন, তখন পিতামাতার অধিকাংশ সদ্‌গুণের বৃহত্তর বিকাশের সম্ভাবনা ঐ পুত্র বা

কন্যার মধ্যে প্রত্যাশা করা সঙ্গত হয়। সুতরাং সাধু-নামধেয় মানুষগুলি সত্য সত্য যে সাধু হবার সুযোগ পাবেন, তার প্রথম আনুকূল্য পিতামাতার কাছ থেকে আসা প্রয়োজন। এইজন্যই আমরা বারংবার বলি ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিজনে নিজ নিজ সাধ্যমত পরিনিষ্ঠিত হও, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের সাধনার প্রতি রুচিমান্ হওয়ার ফলেই দিকে দিকে দেশে দেশে সৎপ্রবৃত্তির, সৎপ্রয়াসের, সৎ অনুশীলনের বিকাশ ঘটবে। একটা মানুষ ভাল বা মন্দ একথা নিয়ে দুশ্চিন্তা না ক'রে আমাদের ভাবতে হবে, সবগুলি মানুষ কি ক'রে মন্দ হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে, সবগুলি মানুষ কি ক'রে ভাল হ'তে পারে।

দৃষ্টান্তের সুফল ও কুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পিতামাতার কাছ থেকে তুমি পেলে তোমার জৈবিক সম্বল, সুস্থ সবল দেহ, কর্ম্মপরায়ণ বাহু এবং শ্রমক্ষম মন কিন্তু চক্ষু যখন চারিদিকে চাইতে শিখ্‌ল, তখন থেকেই সুরু হ'ল তোমার অনুকরণ। যাকে যা' কত্তে দেখ, তারই কর অনুকরণ। ভাল লাগ্‌লে অনেক সময়ে আসল দৃষ্টান্তকে ডিঙ্গিয়ে চলে যায় অনুকরণ। তোমার যা' ভাল লাগছে, তা' যদি সত্যি ভাল কাজ হয়, তবে ত' সকলেরই মঙ্গল কিন্তু তোমার যা' ভাল লেগেছে ব'লে তুমি

জিদ ক'রে অনুশীলন করে যাচ্ছ, তা' যদি খারাপ কাজ হয়, তাহ'লে এই ভাল লাগা তোমাকে রসাতলে নিয়ে যেতে পারে, আবার তোমার দৃষ্টান্ত দেখে দেখে অন্য আরো পাঁচ জন নিজের পায়ে হাসতে হাসতে কুঠারাঘাত কত্তে পারে। দৃষ্টান্তের সুফল ও কুফলের কথা বিবেচনা ক'রে তোমাকে পরিবেশের দিক থেকেও নিরাপদ থাকতে হবে বা অন্যকে নিরাপদ হবার সহায়তা কত্তে হবে, আমাদের পণ হওয়া উচিত যে, আমরা প্রতিজনে যতটুকু পারি সৎ হব এবং অন্যকে যতটা পারি সৎ হবার বা সৎ থাকার সহায়তা কর্ব্ব।

চিন্তার শক্তিই প্রকৃত শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎ চিন্তাই যে-কোনও অভ্যুদয়াভিলাষী জাতির সত্যিকারের পাথেয়। দিগ্‌বিদিকে সৎ চিন্তাকে ছড়িয়ে দাও। সহস্র প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সৎ চিন্তা দিকে দিকে নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করুক। সৎ চিন্তার শক্তিতে দুর্ব্বল জাতি সবল হবে, নিরুদ্যম জাতি উদ্যমী হবে, চঞ্চল বিক্ষিপ্ত ঐক্যহীন ভেদবুদ্ধিপরায়ণ আত্মহননরত জাতি ঐক্যবদ্ধ, একনিষ্ঠ এবং আত্মপ্রত্যয়শীল হবে। তোমার দেশের একটী প্রাণীও যদি মনুষ্যত্বের বিচারে ঊন বা হীন থাকে, জান্‌বে, সে তোমাকে নিয়ত পিছন দিকে টান্‌বে, নীচের দিকে ঠেল্‌বে। কেউ যাতে কোনো গুণে ঊন বা

কোনো কৃতিত্বে হীন না থাকে, তার জন্য অবিরাম অবিশ্রাম চিন্তার বৈদ্যুতিক ধারাকে কেবল প্রবাহিত কত্তে থাক। এই ধারায় অবগাহন ক'রে অসাধু সাধু হবে, সাধু সাধুত্তম হবে, পশু মানুষ হবে, মানুষ পুরুষোত্তম হবে। চিন্তার শক্তিই প্রকৃত শক্তি। কারণ, চিন্তা মানুষের আভ্যন্তর জীবনটী গ'ড়ে দেয় বিশ্ববাসী সকলের একেবারেই অজ্ঞাতসারে।

জগদ্বাসীর কাছে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অপরের যৌন আচরণ সম্পর্কে চিন্তা করা একেবারেই ছেড়ে দেবে। নরনারীর বা পশুপক্ষীর যৌন আচরণ দর্শন করা থেকে সম্পূর্ণ-রূপে দূরে থাক্‌বে। তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে কোনও কামাচরণের চিন্তা কর নাই ব'লে একথা মনে ক'রো না যে, অন্যের কামাচার দর্শনে বা অন্যের কামাচারের বার্ত্তা শ্রবণে কিম্বা অন্যের ইন্দ্রিয়-বিলাসের চিত্ররূপ অবলোকনে তোমার ভিতরে চঞ্চলতা আসে না। যে যা' দেখে, যে যা' শোনে, যে যা' ভাবে, সে তা' হ'য়ে যায়। তোমার অধঃপতনের সুরু এইখানেই ঘটে। কে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, কে ব্যভিচারী, কে কদর্য্য কার্য্যে আসক্ত, এই সকল বিষয়ে কৌতূহল তোমাকে তোমার অজ্ঞাতসারে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ব্যভিচারী ও কদর্য্য কার্য্যে আসক্ত কত্তে পারে। অথবা, পারে বলব কেন, ক'রে থাকে। ব্যাপক ভাবে যদি

একটা দেশের লোকের ভিতরে অপরের কামক্রিয়াদির বিষয়ে একান্ত নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা জেগে ওঠে এবং জাতিগত ভাবে যদি সে দেশের লোক কুদৃশ্য দর্শনে, কুচরিত্র অঙ্কনে, কুকার্য্য বা কুচিত্র প্রদর্শনে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বিরত থাকে, তাহ'লে দশটী বৎসরের মধ্যে এই জাতির শক্তিমত্তার পরিচয় দেবার মত যোগ্যতা ও ক্ষমতার বিকাশ ঘট্‌তে পারে। জগদ্বাসীর কাছে স্ফীত বক্ষে উন্নত মস্তকে দাঁড়াবার এইটী হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়। সাধুনামধারী কিছু লোক অসাধু জীবন-যাপন কচ্ছে, আমাদের দুশ্চিন্তা মাত্র অতটুকু পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বে না, আমাদের চাই এমন চেষ্টা যাতে সাধু-অসাধু সকলের ভিতরে ভাবান্তর, রূপান্তর ও যুগান্তরের সৃষ্টি হতে পারে।

রিপুর উত্তেজনায় কর্ত্তব্য

একটী যুবক আসিয়া প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। যুবকটা একটু নিরিবিলি খুঁজিতেছিল। তাহার মুখ দেখিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি যেন তাহার অন্তরের অভিপ্রায় কতকটা অনুমান করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি আমাকে একা চাও?

—হাঁ বাবা, যা' বল্‌বার, গোপনেই বল্‌ব,—যদিও কথাটা নিতান্ত সাধারণ।

শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাকে পাশের ঘরে নিয়া বসাইলেন। বলিলেন,—বল, তোমার কি বল্‌বার আছে?

বালকটী বলিল,—আপনার স্নেহ ও করুণা দেখে সব প্রশ্ন ভুলে গেছি। তবু একটী প্রশ্ন কর্‌ব। আমার কামোত্তেজনা এত বেশী কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিধাতার বিধানই এমন আশ্চর্য্য যে, কামভাব না থাক্‌লে অধিকাংশ জীবের জন্মলাভ এক অসম্ভব ব্যাপার হ'ত। বৃক্ষ-গুল্ম-লতা প্রভৃতি উদ্‌ভিদ্ যে বীজ ধারণ করে ভাবী বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-ফুলের সৃষ্টির জন্য, তার মধ্যে কামভাব আছে কিনা কিম্বা থাক্‌লেও তা' কি ভাবে আছে বা কি ভাবে কার্য্যকরী হয়, তা' হয়ত ভবিষ্যতের বিজ্ঞান-চর্চ্চা একদিন আবিষ্কার কর্ব্বে। একটী বৃক্ষের একটী পুষ্প থেকে অন্য একটী বৃক্ষের আর একটী পুষ্পে যখন ভ্রমর বা মৌমাছি বা অন্য কোনও কীট অথবা মৃদু পবন-হিল্লোল পরাগরেণু ব'য়ে নিয়ে যায়, তখন নিশ্চয়ই ঐ রেণু-গ্রহণকারী পুষ্পটীর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পাদপটীর সর্ব্ব অঙ্গে এক আনন্দ-শিহরণ জেগে ওঠে। এটা স্বাভাবিক। বৃক্ষের জীবন সার্থক আরও শত শত বৃক্ষের উৎপাদনের শ্রেষ্ঠতম সহায়-রূপে আত্মপ্রকাশ করার ভিতর। তাই পরাগরেণু ধারণের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে অফুরন্ত আনন্দের তরঙ্গমালা খেলতে থাকে। এই স্বাভাবিক আনন্দকে বোধ হয় কাম বলা চলে না। কিন্তু স্বাভাবিক এই আনন্দকে যখন উদ্ভিদের চেয়ে অধিকতর জাগ্রত-চেতনা-সম্পন্ন পশু, পক্ষী বা মানুষ নিজেদের জৈব পিপাসার তাড়নে বা জৈব প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবহার

কত্তে উন্মত্ত হয়, তখন সে কামরূপ ধারণ করে, তখন সে কাম আখ্যা পায়। কিন্তু এটা ত' সুনিশ্চিত যে, পক্ষিজাতি, পশুজাতি বা মনুষ্যজাতি সমগ্র জগৎ জুড়ে সংখ্যা-প্রাচুর্য্যে কেবল বেড়েই চল্‌বে, এই এক নিদারুণ প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাগিদেই এরা জননের অনুকূল চিন্তা ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। পক্ষীর কাম পক্ষীর সৃষ্টি করে, পশুর কাম পশু সৃষ্টি করে, মানুষের কাম মানুষ সৃষ্টি করে। এই সৃষ্টির ভিতরে পৃথক্ একটা আনন্দও আছে, যে আনন্দটা ইন্দ্রিয়-ভোগ-সুখ-চরিতার্থতার আনন্দের থেকে একেবারে দূরে। বাচ্চাটা জন্মাবার পরেও বাচ্চাটার প্রতি পক্ষীর বা পশুর একটা আলাদা আকর্ষণ থাকে, যার মধ্যে ইন্দ্রিয়-সুখাকুলতার কোনো স্থান নেই। এই আকর্ষণটা মানুষের মধ্যে সহস্র গুণ বেশী এবং মানুষের এই আকর্ষণ শুধু নিজ সন্তানটীর প্রতিই নয়, মনটা স্বচ্ছ ও সুন্দর হ'লে, সে এই আকর্ষণ পরের ছেলেমেয়েদের প্রতিও অনুভব করে। এইখানটায় মানুষের দেবত্বের হয় শুরু। নিজের ছেলেমেয়েকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন পরের ছেলেমেয়েকেও নিজের আদরণীয় ব'লে জ্ঞান কত্তে সুরু করে, তখন তার মানবিক দুর্ব্বলতার ঊর্দ্ধে সে চলা আরম্ভ করে এবং সূচনা হয় তার দেবত্বে উত্তরণের অভিযানের। কিন্তু জীব-হিসাবে মানুষের মনে অতীব সূক্ষ্ম ভাবে মানব-কুলের সংখ্যাবৃদ্ধির আদিম যুগের পুরোণো তাড়নাটী চিরকালই থেকে যায়। সেই তাড়নাই মাঝে মাঝে

নানা রূপ ধ'রে তার কাছে আসে এবং তাকে উচ্চাটিত, উচ্চকিত ও তুমুল ভাবে আন্দোলিত করে। এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, এতে অস্বাভাবিকতা কিছুমাত্রও নেই। সুতরাং কামোত্তেজনা আছে ব'লে তুমি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে ছিঃ-ছিঃ শোনাতে পার না।

যুবকটী নিজের দুরবস্থার কথা আরও বিস্তারিত করিয়া বলিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অত্যন্ত দুষ্ট-প্রকৃতির দুর্ব্বৃত্ত ছেলেকে নিয়ে বুদ্ধিমান্ বাপ-মা কি করেন? শাসনও করেন, প্রশ্রয়ও দেন। শাসন করেন ততটুকু, যতটুকু শাসনে সুফল হবে। প্রশ্রয় দেন ততটুকু, যতটুকু প্রশ্রয়ে ক্ষতি কম। তোমার উত্তেজনা মুহুর্মুহু চল্‌ছে, তোমাকে একটু জিরুবার অবকাশও দিচ্ছে না, যেখানে যখন যাচ্ছ তোমার সঙ্গে সঙ্গে এ উত্তেজনা পিছু-ধাওয়া কচ্ছে। শ্মশানে, মন্দিরে, নদীতীরে, তুলসী-বিল্বাদি পবিত্র বৃক্ষমূলে, সজ্জন-সমাবেশে, হাটে, বাজারে, বিদ্যালয়ে, কাছারীতে, ডাকঘরে, রেলষ্টেশনে, সর্ব্বক্ষণ তোমাকে একেবারে তোল্‌পাড় করে তুল্‌ছে। সব মানি। কিন্তু একথা মানি না যে, তোমাকে নতি স্বীকার কত্তেই হবে, পরাজয়ের গ্লানি মাথায় তুলে নিতেই হবে। দুর্ব্বৃত্ত কামকে ডেকে ব'লে দাও যে, তোমার এখন সন্তান-জননের সময় হয় নি, যার গর্ভে যোগ্য সন্তানের জন্ম হবে, তাকে তুমি এখনো পাও নি, অতএব উত্তেজনার অসময়োচিত

অসঙ্গত নির্দ্দেশ তুমি শুন্‌বে না, তার অন্যায় হুকুম তুমি তামিল কর্ব্বে না, তোমার জীবনের উপরে তার অধিকার তুমি স্বীকার কর্ব্বে না, এইটী হ'ল তোমার শাসন। যদি খুব দৃঢ় কণ্ঠে এ কথাটী বলতে পার, দেখবে দুর্ব্বৃত্তের দস্যুমূর্ত্তির পরিবর্ত্তন ঘটেছে, সে তখন শান্ত মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছে এবং মোহিনী মায়া বিস্তার ক'রে তোমাকে সৌন্দর্য্যের পূজারী এক সুমহান্ কবিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা কচ্ছে। তখন সে তোমাকে কুবুদ্ধি জোগাবে, বল্‌বে অনভিপ্রেয় ক্রিয়াতে লিপ্ত বরং নাই হ'লে কিন্তু দূরে থেকে পরমেশ্বরের সৃষ্ট সৌন্দর্য্য-সুষমার পূজা কত্তে ক্ষতিটা কি? থাকো তুমি দূরদূরান্তে আড়ালে, কেউ তোমার টিকিটীরও নাগাল পাবে না কিন্তু দূর থেকে তাকে কেন ভালবাসার পবিত্র-অর্ঘ্য নিবেদন কর্ব্বে না, যাকে দেখতে ভাল লেগেছে, যাকে কাছে পেতে প্রাণে কতবারই না ইচ্ছা জেগেছে? রাবণ যখন আয়ুধ-ধারী যোদ্ধা, তখন তাকে চিনে ফেলতে সীতার কখনো ভুল হ'তে পারত না, কিন্তু সে যখন গৈরিকধারী জ্ঞানী বা কবি, তখন তাকে চেনা বড়ই কঠিন। তখন তার সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হ'তে হয়। সে যা' ইচ্ছা তাই ব'লে যাক্, কাণ পাতা হবে না। এটা হ'ল প্রশ্রয়। তার মুখচাপা দিতে গিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তির মুখে নিজেই মুখ থুবড়ে পড়ার অপসম্ভাবনাটীকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। মারো আর কাটো আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো, বক আর ঝক আমি কাণে দিয়েছি তুলো, এই হবে

তোমার মনোভঙ্গিমা। এই ভাবে একদিকে হও কঠোর শাসনকর্ত্তা, অপর দিকে হও একেবারে উদাসীন। মনের কোণে কুবুদ্ধি এসে গুঞ্জন কর্ল্লেই তার প্রতি দৃকপাত কত্তে হবে কেন? অনাগ্রহশীল উপেক্ষাপরায়ণ হ'য়ে শক্ত ভাবে নিজের আসনে নিজে ব'সে থাক্‌বে।

শারীরিক উত্তেজনাকে মনোনিরপেক্ষ রাখ

যুবকটী আরও কিছু নিবেদন করিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শরীরের অংশ-বিশেষে একটা উত্তেজনা অনুভূত হচ্ছে বলেই মনে ক'রে ব'সো না যে, এটা তোমার মনেরও উত্তেজনা। উদ্বেগজনক দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক, অতিক্রোধ, নিদারুণ ভীতি, নিদ্রালুতা, অজীর্ণ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও যকৃতের ক্রিয়া-বৈষম্য প্রভৃতি নানা কারনে জীব-শরীরের অংশ-বিশেষে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, যা' সম্পূর্ণ রূপেই মনোনিরপেক্ষ ব্যাপার, অর্থাৎ মনের ভিতরে কুপ্রবৃত্তির অবস্থানের সহিত যার কোনও সম্পর্কই নেই। তাই দেখে অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি মনে মনে ভাবে যে, তবে তার মনে বুঝি দারুণ সম্ভোগলিপ্সা জাগ্রত হয়েছে, তবে ত' তার আর রক্ষা নেই। কিন্তু এসব ধারনা অবাস্তব ও অলীক, এসব দুশ্চিন্তা অমূলক এবং ভিত্তিহীন। শরীরের এই রূপ উত্তেজনার সময়ে শীতল-জল-প্রক্ষেপের দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশে, মস্তক, গ্রীবার পশ্চাদভাগ প্রভৃতির

শিরা-উপশিরাতে স্নিগ্ধ ক্রিয়া কত্তে হয়। এই জাতীয় উপদ্রব অনেকের কৃমির উৎপাত থেকেও যে হয় না, তা' নয়। মাদক দ্রব্য ব্যবহারেও এরূপ হ'তে পারে। অতএব, এ সব শারীরিক কুলক্ষণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মূল কারণটিকে খুঁজে বের ক'রে তা' দূর করার চেষ্টা কত্তে হয়। হতাশ হ'তে নেই। শরীর গরম হয়েছে ব'লেই মনকে গরম হ'তে দিতে হবে, এর কোনো মানে নেই। শরীর শারীরিক ধর্ম্মে যখন যা' হবার হোক, তাকে মনের উপরে কর্তৃত্বাধিকার বিস্তারিত কত্তে দিও না। শারীরিক উত্তেজনাকে সম্পূর্ণ-রূপে মনোনিরপেক্ষ রাখ। শরীর উত্তেজিত হয়েছে ব'লেই তাকে কুক্রিয়াতে লিপ্ত হ'তে দিতে হবে, এইরূপ উক্তি এবং যুক্তি একমাত্র অপদার্থ লোকদেরই সাজে। শরীর ক্ষিপ্ত হ'য়ে গেলেও কখনো ভেবো না যে, মন তোমার হাত ছাড়া হ'য়ে গেছে। শারীরিক ক্ষিপ্ততা অধিকাংশ সময়েই শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ মাত্র, মনের সঙ্গে তার অধিকাংশ সময়েই কোনও সম্পর্কই থাকে না। তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার মনটী সেই সময়ে উদাসীনই ছিল, যেই সময়ে শরীরের তুমুল উত্তেজনা তোমাকে মনে করিয়ে দিল যে, তুমি কামোপভোগের জন্য একেবারে তৈরী। কিন্তু শরীর তোমাকে বারংবার ভুল বুঝাচ্ছে। শরীরের উত্তেজনার সময়েও তোমার মন একবারে নির্ব্বিরোধ ও কামলিপ্সাহীন নির্ব্বিকার

থাকতে পারে। অন্ততঃ, যাতে মন তেমন থাকে, সে ভাবে তোমার চলা এবং চিন্তা করা উচিত। জীবনের কোনও সমস্যাই সমাধানের অতীত নয়। যত আছে ব্যাধি, তত আছে ঔষধ আর যত আছে বিপদ, তত' আছে তার উদ্ধার। ক্ষণকালের জন্যও বিশ্বাস হারাবে না।

নিজ দুর্ব্বলতার গাথা গাহিয়া বেড়াইও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজের দুর্ব্বলতার কথা লোকের কাছে গেয়ে বেড়িও না। ধন আর ঋণ, বল আর দুর্ব্বলতা, পুণ্য এবং পাপ সব সময়েই লোকের কাছে গোপন রাখা ভাল। নিজের সৌভাগ্যের কথা বাইরে প্রচার ক'রে বেড়ালে গর্ব্ব, দম্ভ, অহঙ্কার আসে, আর অহঙ্কারই মানুষের পতনের প্রথম সোপান। নিজের দুঃখ, দুর্ভাগ্য, দুর্ব্বলতার কথা বাইরে প্রচার কর্ল্লে আত্ম-অবিশ্বাস এসে যায়, আত্মশ্রদ্ধা কমে, দুর্ব্বলতা বাড়ে। অনেকে আগ্রহ ক'রে তোমার দুর্ব্বলতার কথা শুনতে চাইবে শুধু তোমার দুর্ব্বলতাকে আরও বাড়িয়ে দেবার জন্য। অন্যের দুর্ব্বলতার খবরও শুনতে যেও না। অপরের চরিত্রের হেয় অংশগুলি শুনতে শুনতে নিজের চরিত্রের হেয় অংশের সংশোধনের ইচ্ছা আস্তে আস্তে লোপ পায়। কামের উৎপীড়নে ক্লেশ পায়

নাই, জগতে এমন মানুষ খুব কমই আছে কিন্তু প্রকৃত মানুষেরা নিজ নিজ জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়-চরণে দাঁড়িয়ে থেকে কঠোর সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন। তাঁরা বিনিয়ে বিনিয়ে নিজেদের দুঃখের গাথা গেয়ে গেয়ে মানুষের করুণা-কণা আহরণের চেষ্টা করেন নি।

ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ তোমার নিজেরই হাতে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জন্ম যখন লাভ করেছ পিতামাতার কামক্রিয়ার ফলে, তখন এই দেহটা যতদিন আছে, ততদিন তোমার উপরে কামের কিছুটা হ'লেও অধিকার দাবী করা স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ কামক্রিয়াটুকুই তোমার পিতামাতার জীবনের সব কথা বা শেষ কথা নয়। সুতরাং তোমার জীবনের উপরে আরও বহু বহু সংস্কারের অধিকার দাবী করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণ বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়েই হবে তোমার মনুষ্য জন্ম লাভের পরম সার্থকতা প্রমাণিত। পৃথিবীতে যে পিতৃপুরুষদের পূজা এক সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, তারও প্রকৃত উদ্দেশ্য এই। আজকাল পিতৃশ্রাদ্ধ, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি পুণ্যজনক কার্য্য তাদের প্রকৃত লক্ষ্যকে ভুলে গিয়েছে ব'লেই মনে হয়। যা' ছিল সদ্‌গুণ তোমার পিতৃপিতামহবর্গের, সেগুলিকে ক্রমান্বয়ে

বাড়িয়ে চলার দিকে বংশধারাকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টার ইচ্ছাকৃত অধ্যবসায়ই মানুষকে পশু বা পক্ষীর জীবন থেকে আলাদা ক'রে দিয়েছে। ভুল জীবনে যাই ক'রে থাক, সব-কিছুর স্মৃতি মন থেকে একেবারে মুছে দাও। ভাবী মানবকুল যে অভ্যুন্নত মহিমার স্বাভাবিক প্রকাশে দীপ্যমান হবে, তুমি যে তাতে ঔজ্জ্বল্য-বিধানের বিশেষ উপকরণে সংযোগ ঘটিয়ে যেতে অধিকারী, এই কথাটী বিশ্বাস ক'রে চল। অতীত নিয়ে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন কি? এখনো ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ তোমার নিজেরই হাতে।

পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—নিজেকে নিজের ভাগ্য-বিধাতা ব'লে জ্ঞান কত্তে হ'লে চাই জীবন্ত, জাগ্রত, অফুরন্ত আত্ম-বিশ্বাস। সেই আত্মবিশ্বাস আপনা আপনি আসে না। আসে, একান্ত ভাবে নিজেকে পরমেশ্বরের চরণে সমর্পণে। নিজেকে জেনে নাও ভগবানের হস্তধৃত যন্ত্র। নিজেকে বিশ্বাস কর পরমেশ্বরের নিজ হস্তে পরিচালিত একটী বিনীত, বিশ্বস্ত, অনুগত কর্ম্মী-রূপে। বিশ্বাস-কর, তোমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ দিয়ে পরমেশ্বর তাঁর অপূর্ব্ব সৃষ্টি স্থিতি-বিনাশ-লীলার এক নবতর আলেখ্য বিস্তার কর্ব্বেন। বিশ্বাস কর, তোমার কাম, তোমার ক্রোধ, তোমার লুব্ধতা, তোমার মাৎসর্য্য, তোমার দৈহিক উত্তেজনা, তোমার মানসিক অস্থিরতা সব-

কিছুর জন্য পরমেশ্বরই নটরাজ বা সূত্রধর। তুমি তোমার উদ্বেগগুলিকে তাঁর হাতে তুলে দাও, তুমি তোমার দুশ্চিন্তাগুলিকে তাঁর কাছে ঠেলে দাও, তুমি তোমার ছট্‌ফটানি নিবারণের দায়িত্ব তাঁর পায়ে সঁপে দাও। একদিনে আর দুদিনেই সফলতার স্বর্ণচূড়ায় আরোহণ কত্তে পারবে না কিন্তু এই পথেই তোমার সফলতা সুনিশ্চিত। পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণই মনুষ্য-জীবনের পরম পন্থা, এর চেয়ে ভালো পথ এখনো কেউ আবিষ্কার করেন নি।

দীক্ষার চেয়ে বড় জিনিষ

চঞ্চল, উৎকণ্ঠিত, উদ্বেগ-বিধ্বস্ত-তনু যুবকটী হাসিমুখে দীপ্ত চোখে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

শ্রীমতী শৈলবালা সেনগুপ্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবামণি ছেলেটাকে দীক্ষা দিলেন নাকি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না দীক্ষা নয়, দীক্ষার চেয়েও বড় জিনিষ দিলাম। তার নাম আত্মবিশ্বাস।

গণসংযোগ ও আত্ম-জাগরণ

কতিপয় যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গণসংযোগ একটা বড় কথা, যে কথার মূল্য কোনো গাণিতিক সংখ্যা দিয়ে নির্ণয় সম্ভব নয়। রাজনৈতিক নেতারা যতক্ষণ

পর্য্যন্ত না গণ-সংযোগ কত্তে সমর্থ হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁদের আন্দোলনে কদাপি প্রাণ-সঞ্চার হয় না। আধ্যাত্মিক আন্দোলনকারীদের সম্পর্কেও এটা পরম সত্য। অধিকাংশ নেতা বা মহাপুরুষই নিজ নিজ জায়গায় বসে থেকে লক্ষ লক্ষ লোককে আকৃষ্ট করেন নিজ নিজ প্রতিনিধিদের দ্বারা গণসংযোগ ঘটিয়ে। গণসংযোগের মানে সর্ব্বস্তরের সকল মানুষের অন্তরকে নিজেদের অন্তর দিয়ে স্পর্শ করা। তা' কত্তে হ'লেই তোমার নিজের অন্তরকে সর্ব্বাগ্রে এক নবচেতনায় সঞ্জীবিত এবং উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা প্রয়োজন। তুমি নিজে যদি না জাগো, তবে অন্যের-জাগরণ সম্পাদন করবে কি ক'রে।

আত্ম-জাগরণের মূলই চরিত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আত্মজাগরণেরও মূল কথা চরিত্রবল। যার চরিত্রবলের সাধনা নাই, তার জাগরণ ক্ষণিকের। কারণ, হয় ভয়ে, নয় প্রলোভনে, নয় বুদ্ধিভ্রষ্টতাহেতু অকস্মাৎ তার জাগৃতির দীপশিখা নিবে যেতে পারে। যার নিজের গৃহই অন্ধকার, সে অপরের গৃহ আলোকিত কর্ব্বে কিসের বলে? দেশ ও সমাজের উন্নতির জন্য নানা নেতা, নানা মহাপুরুষ নানা পন্থার নির্দ্দেশ দিতে পারেন কিন্তু চরিত্রহীন মানুষেরা কোন্ পথে দীর্ঘকাল চল্‌বে? অবিরাম,

অবিশ্রাম, অক্লান্ত পৌরুষে, দ্বিধাহীন ধৈর্য্যে, কুণ্ঠাহীন প্রাণে তোমাকে যে নিয়ত চলবার যোগাবে প্রবৃত্তি, প্রেরণা ও ভরসা, তারই নাম চরিত্র।

তোমরা চরিত্রবান্ হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার অল্পাধিক সৎসাহস আছে, আমি সতর্ক কিন্তু ভয়ভীতি আমার কম। আমার কর্ম্মশক্তি আছে, আমার বাগ্‌বিভূতি আছে, তথাপি আমি রাজনৈতিক আন্দোলন করি না শুধু এই জন্যেই। দেশব্যাপী চরিত্রবত্তার যদি না হয় সুপ্রতিষ্ঠা, তা' হ'লে হাজার রাজনৈতিক আন্দোলন ক'রেও তোমরা কোনও সুনিশ্চিত কল্যাণকে আয়ত্ত কত্তে পার্ব্বে না। শক্ত ক'রে হাতের মুঠা বেঁধেছ, দেখ্‌বে, দুশ্চরিত্রতার দুর্ব্বলতা তোমাদের সেই শক্ত গেঁরোর মাঝখান দিয়ে তোমাদের সকল সুখ-সৌভাগ্যকে গলিয়ে ঠেলে ঠেলে বের ক'রে দিচ্ছে। মানুষ যদি মানুষ না হয়, তবে রাজসিংহাসনে বস্‌লেই সে কর্ত্তব্য পালন কত্তে পারে না। এই জন্যই আবাল্য ব'লে এসেছি, "তোমরা চরিত্রবান্ হও", আমৃত্যু ব'লে যাব, "তোমরা চরিত্রবান্ হও।"

চরিত্রের সংজ্ঞা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে জিনিষগুলি তোমার মধ্যে

সুপ্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাক্‌লে লোকে বলতে বাধ্য হবে যে, তুমি একটা সত্যিকারের মানুষ, যে জিনিসগুলি তোমার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হ'লে তুমি নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই অবাক্ বিস্ময়ে উচ্চারণ ক'রে বস্‌বে,—"না, আমি সত্যই একটা মানুষের মত মানুষ, আমি অমানুষ নই, আমি জন্তু-জানোয়ার নই",—সেই জিনিষগুলির একত্র সমাবেশের নামই হচ্ছে চরিত্র। এই ভাবে প্রত্যেকে চরিত্রকে বুঝতে চেষ্টা কর। চরিত্রকে অতি মহৎ ও শ্রদ্ধেয় জ্ঞান ক'রে মনে, প্রাণে, কর্ম্মে, চিন্তায়, বাক্যে এবং অনুরাগে তার উপাসনা কর। চরিত্রকে জীবনের সার এবং সর্ব্বাবলম্বন কর। নিশ্চয়ই তোমাদের দ্বারা জগতের অশেষ হিতসাধন সম্ভব হবে। চরিত্র মানুষকে আত্মপ্রসাদই দেয়, গ্লানিরাশি উপহার দেয় না, একথা ধ্রুবসত্য ব'লে জেনো।

সার্থক কথা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি ত' শুধু কথা ক'য়েই যাচ্ছি, কাজ কিছুই কচ্ছি না। কথা কওয়াটাকে যদি কাজ ব'লে মেনে নাও, তবে বলা চলে যে, আমি কাজও কিছু কচ্ছি। কি কথা বল্‌ছি? যে কথার সঙ্গে আমার কর্ত্তব্যপালনজনিত আত্মপ্রসাদ ব্যতীত আর কোনও ব্যক্তিগত লাভ নেই। কথা আমাকে অর্থ দেয় না, কথা ব'লে অর্থ

অর্জ্জন আমি চাইও না। কথা আমার কর্ম্মসম্পাদনের পথ সুগমতর করে না, কারণ আমি চাঁদা তুলি না, ভিক্ষা সংগ্রহ করি না। সত্য কথা সকল সময়েই সুপ্রিয় হয় না, কখনো কখনো তা' নিতান্তই কটু এবং অপ্রিয় হ'তে পারে। তখন আমার কথা আমার বিঘ্ন উৎপাদন করে। তবু কথা বলি। বলি সদুদ্দেশ্যে, সদভিপ্রায়ে, সকলের অবিমিশ্র হিতকামনায়। জগতে কথা না ব'লে থাক্‌তে পারে কয় জন? যত লোক যত কথা বলে, তার সবই যদি সৎকথা হ'ত, তবে তার এক অসামান্য প্রভাব সমগ্র মানব-সমাজের উপরে নিশ্চয়ই পড়ত। সবাই যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, আমরা কুকথা বল্‌ব না, অন্যের অনিষ্টজনক একটী শব্দও উচ্চারণ করব না, যে কথা বললে মানুষের হিতসাধন সম্ভব, মাত্র তেমন কথাই বলব, তা' হ'লে সকল লোকের কথাগুলির সম্মিলিত শক্তির এক অভাবনীয় প্রভাব মানব-সভ্যতার উপরে পড়তে পারত। তখন কথা বলাও সত্য সত্য একটা সুমহৎ কাজে পরিণত হ'তে পাত্ত। কথা মানুষকে নরকেও ডুবাতে পারে, কথা মানুষকে স্বর্গেও তুলতে পারে। কথার এই শক্তিকে যাঁরা জানতেন, তাঁরা বলতেন,—শব্দই ব্রহ্ম। কথা বলছি, না ব্রহ্মারাধনা কচ্চি,—এই ভাব নিয়ে যারা কথা বলেন, তাঁদের কথাই সার্থক।

মানুষই বড়

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রতিষ্ঠান গড়তে চাও, গড়। প্রতিষ্ঠান গড়বার উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি কত্তে চাও, কর। কিন্তু দুটি কাজই একই লোকের দ্বারা সম্ভব কিনা, বিবেচ্য। যে-কোনো প্রতিষ্ঠান গড়তে হ'লেই তার কাজে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হ'য়ে যেতে হয়। আজ পর্য্যন্ত কেউ কোনো প্রতিষ্ঠানকে সার্থক রূপদান কত্তে পারেন নি, যদি তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার ক'রে ঐ একটী কাজেই নিমগ্ন না হ'য়ে থাকেন। এজন্যই আমি পুপুন্‌কীতে প্রতিষ্ঠান গড়্‌ব ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলে জীবনের পরমায়ুর মস্ত বড় একটা অপব্যয় ক'রে ফেলেছি ব'লে মনে কচ্ছি। প্রতিষ্ঠান গড়া বরং সহজ কিন্তু তাকে গ'ড়ে তোলার যোগ্য আবহাওয়া সৃষ্টি অতীব কঠিন। আমি ত' অযাচক, অভিক্ষু, অপ্রার্থী ও স্বাবলম্বী, তবু আমাকে লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে, কেন প্রতিষ্ঠান তাড়াতাড়ি গ'ড়ে উঠ্‌ছে না। কেন জনসাধারণের সহস্র প্রকারের হিতকর্ম্মের দ্বারা পুপুনকী গ্রামের নামটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিস্তার ও সম্মান লাভ কচ্ছে না, অথচ আমার যা' কাজ, সে কাজ প্রতিষ্ঠান গড়ার নয়, মানুষ গড়ার। জগতে কত প্রতিষ্ঠান জন্মাবে আর উঠে যাবে, তাতে জগৎসভ্যতার কিছু যাবে আস্‌বে না কিন্তু একটাও যদি মানুষের মত মানুষ কোথাও

আবির্ভূত হ'তে পারেন, তবে তাঁর আগমন ও তিরোধান চিরকালের জন্য মানবসভ্যতাকে উন্নততর স্তরে আরোহণের সুযোগ ক'রে দেবে। মানুষ যে কত বড় জিনিষ, একথা আমার অন্তর জানে, তাই, আমি কপর্দ্দকহীন ও নিঃসম্বল হ'য়েও দেশের পর দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি শুধু তোমাদের শোনাবার জন্য যে, মানুষ চাই, মানুষ চাই। প্রতিষ্ঠান বড় নয়, মানুষই বড়।

মানুষ বনাম প্রতিষ্ঠান

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—এবারও আপনি সিরাজগঞ্জে একটী দুটী ভাষণ দেবেন কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না, এবার আর ভাষণ-মঞ্চে দাঁড়াব না। তোমরা আমার ভাষণ শুনে ব্যগ্র হ'য়ে ছুটে আস আমার কাছে, আমার মুখের আরও কিছু কথা শুনবার জন্যে। তোমরা যে এসেছ, তাতে আমি কত খুশী কিন্তু শুধু কতকগুলি মুখের কথা শুনিয়েই কি আমি তোমাদের বিদায় দিয়ে দেব? তোমাদের প্রতিজনের ভিতরে পূর্ণব্রহ্ম সুপ্ত হ'য়ে পড়ে আছেন। তপস্যা দ্বারা তোমরা তাঁকে জাগাও। তাঁর জাগরণের পূর্ণআস্বাদনটীকে স্থায়ী ভাবে লাভ কর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত কর স্বার্থপরতাবর্জ্জিত ত্যাগবিমণ্ডিত সুন্দর জীবনাদর্শের প্রতি অনুরাগরঞ্জিত দৃষ্টির

দ্বারা। ত্যাগী হও পরমেশ্বরে একান্ত নির্ভর ও ভালবাসার দ্বারা। জগতে যদি একটা লোকও মানুষের মত মানুষ হয়, তা' হ'লে তার দ্বারা শত সহস্র প্রতিষ্ঠানের অভাব পূর্ণ হ'তে পারে।

শৈলবালা সেনগুপ্ত

ছেলেরা চলিয়া গেলে শ্রীযুক্তা শৈলবালা সেনগুপ্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবামণি, আপনাকে কি পুপুন্‌কী আশ্রমটী গড়্‌তে খুব কষ্ট কত্তে হচ্ছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কষ্ট? কষ্টের কি মা শেষ আছে? দিনের পর দিন অনাহার, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অর্দ্ধাহার, নিদারুণ জল-কষ্ট, ভদ্রবেশী দুষ্টলোকের সুকৌশল অত্যাচার, অশিক্ষিত অশিষ্টের অস্ত্রাঘাত, লোষ্ট্রাঘাত, বছরের পর বছর ব্যেপে গুপ্তঘাতকের ছুরিকার আতঙ্ক, বিষাক্ত সর্পকুলের উদ্যত ফণা,—সবকিছুর মাঝখান দিয়ে আমি আমার পুপুন্‌কী আশ্রমটী গ'ড়ে তুলে চলেছি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কর্ম্মীরূপে, শিষ্য-রূপে, সহকারী-রূপে যারা সঙ্গে বাস কচ্ছে, তাদেরও কতজনের অবিশ্বস্ততা, বিরুদ্ধতা, গোপন শত্রুতা যেন জোঁকের মত সর্ব্বাঙ্গে লেগে রয়েছে। জানি, এসব সাময়িক কিন্তু এতে কার্য্যবিঘ্ন ঘটে। তবু নীরবে এবং দৃঢ়তা সহকারে সহ্য ক'রে যাচ্ছি। কারণ, একটা সৎপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা সহজ কথা নয়।

শ্রীযুক্তা শৈলবালা সেনগুপ্তা শ্রীশ্রীবাবামণির চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন,—বাবামণি, আমার গায়ের সব অলঙ্কার আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। এগুলি নিয়ে আপনি আশ্রম গড়ুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না মা, মায়ের গায়ের স্বর্ণাভরণ আমি কিছুতেই নিতে পার্ব্ব না।

ঈশ্বরনিষ্ঠাই আমার অবলম্বন

আলাপ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আশ্রম গড়া অতি তুচ্ছ কাজ। মানুষের মনে উন্নতিমুখিনী প্রেরণা সৃষ্টি ক'রে যাওয়া তার চেয়ে লক্ষ গুণ বড় কাজ। সেই বড় কাজটী করার জন্যই নির্লোভ নিষ্কাম অন্তর নিয়ে দিকে দিকে ছুটে যাই, ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে, অন্ধের চ'খ খুলে দেবার জন্যে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান যখন একটা ধরেছি, তখন এটাকে এই জীবনে একটা রূপ নিশ্চয়ই দিয়ে যেতে চেষ্টা কত্তে হবে। সময় এল ব'লে, যখন শত সহস্র নরনারী এগিয়ে এসে বল্‌বে,—বাবামণি, তোমার পতাকা আমাদের হাতে দাও, আমরা একে ধ'রে রাখ্‌বো। কিন্তু তখন মায়াবী মারীচ এসে সীতাকে প্রলুব্ধ ক'রে তাঁর রক্ষাকবচ লক্ষ্মণকে দূরে সরিয়ে দিতে বাধ্য কর্ব্বে, আর রাবণ এই সুযোগে সীতাকে হরণ কর্ব্বে। আজ আমি নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায়ও এক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলবার জন্য হৃৎপিণ্ডের

রক্ত লোকচক্ষুর অগোচরে উৎসর্গ কচ্ছি, কাল দলে দলে লোক এসে বল্‌বে, আমরা দেব আমাদের দেহের ঘর্ম্ম, বুকের রক্ত, পেশীর বল, ভাণ্ডারের সামগ্রী, আমি অপ্রত্যাশিত আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে যখন এদের সকলের পানে প্রসন্ন নয়নে তাকাব, তখন হঠাৎ মারীচ এসে বল্‌বে, আমার নাম স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, আমাকে ধরার চেষ্টা কর, দেখো আমি কেমন উত্তম ভাবে তোমাদের আদর্শদাতা গুরুর নামটীকে এস্থানে উজ্জ্বল ক'রে তুলি। অনুরাগী হ'লেই কি কেউ বিজ্ঞ হয়? মূর্খ কি সে হ'তে পারে না? মূর্খেরা মারীচের স্বর্ণমৃগরূপী সুন্দর বয়ানে মুগ্ধ হ'য়ে বল্‌বে, এসো ভাই, মিল সবাই, হাত লাগাও, পকেটের মুখ খোল, আমরা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়্‌ব, আমরা আমাদের ত্যাগ, পৌরুষ এবং শ্রমক্ষমতার স্থায়ী কীর্ত্তি জগতে রেখে যাব। বাস্, হয়ে গেল। যাকে মনে মনে আমার আরব্ধ কর্ম্মের সহযোগী ব'লে ভাবা যেত, সে এখন তার নিজের কল্পিত প্রতিষ্ঠানে দিবে অর্থ, দিবে বল, ঢালবে বুদ্ধি, কর্ব্বে কৌশল। তারপর? তারপরে সে দিগ্দেশব্যাপী বিরাট্ সংহতি-সৃষ্টির চেষ্টার মাঝখানে হয়ে দাঁড়াবে এক রুক্ষ, গোঁয়ার ও অবুঝ দেওয়াল, কথা যে শুনতে পায় কিন্তু বুঝতে পারে না, দৃশ্য যে দেখ্‌তে পায় কিন্তু দেখেও যে কিছুই দেখে না।—এই ভবিষ্যৎটা আমি মা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। এজন্যই কাজ তাড়াতাড়ি সারবার জন্য আমার কোনও কৃত্রিম কৌশল নেই। আদিম ঈশ্বরনির্ভর আর

পরিবর্ত্তনশীলতাহীন একাগ্র নিষ্ঠাই আমার অবলম্বন। সাহায্য, সহায়তা বা পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বাইরের দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছাও করে না।

মানুষে মানুষে পার্থক্য স্বাভাবিক

একজন প্রশ্ন করিলেন,—মানুষে মানুষে জাতি নিয়ে, ধর্ম্ম নিয়ে, ভাষা নিয়ে কত বিভেদ, কত দ্বন্দ্ব। এর প্রতীকার কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সব জাতই যে এক মানুষজাতির অন্তর্ভুক্ত এই কথাটী আমাদের মনে রাখতে হবে চির দেদীপ্যমান ক'রে। মানুষে মানুষে জাতিতে, জন্মে, উৎকর্ষে, শিক্ষায়, পটুত্বে ও সুযোগে পার্থক্য থাকতে পারে এবং এই বৈচিত্র্য বিধাতারই বিধান। মানুষে মানুষে এই বৈচিত্র্যের পার্থক্য থাকবেই থাক্‌বে, এটা সৃষ্টিরই এক দারুণ প্রকরণ। মেশিনের সাহায্যে পুতুল তৈরী হয়, সবগুলি পুতুল একই রকম হ'য়ে থাকে। লক্ষ্য কর্‌লে দেখা যাবে, তাতেও হঠাৎ উনিশ-বিশ ঘ'টে যায়। বিধাতার সৃষ্ট মানব-জাতি বিধাতৃ-বিহিত একটী অত্যদ্ভুত বিবর্ত্তনের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে এসেছে। প্রজন্মে প্রজন্মে আংশিক রূপান্তর তার প্রধান সর্ত্ত বা প্রামাণিক বিশেষত্ব। এই পার্থক্য সম্ভাবনাটুকু যদি না

থাকৃত, তা' হ'লে এক কণা জেলির মত ক্ষুদ্র এক প্রটোপ্লাজম্ লক্ষ-কোটি-অর্ব্বুদ যুগের পরে মনুষ্যদেহে এসে উত্তরণ লাভ কর্ত্তে পার্ত্ত না। আজকের মানুষও ভাবী উত্তরণ-পথেরই এক সুনির্ব্বাচিত পথিক। কারণ, অন্যেরা নিজের ভাবী প্রজন্মগুলিকে প্রভাবিত কর্ত্তে পারে নি, মানুষের হাতে সেই শক্তি আছে। মানুষ যখন সঙ্কল্পবদ্ধ হ'য়ে ভাবী প্রজন্মগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত কর্ব্বার জন্য ধারাবাহিক প্রযত্নে পুরুষানুক্রমে লেগে যাবে, তখন নব মানব-জাতির ভূতলে আবির্ভাব এক সুসম্ভব ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে। এই কারণেই সব মানুষ সমান বা একরকম হ'তে পারে না, হবে না। কিন্তু জন্ম নিয়ে, জাতি নিয়ে, সমাজ নিয়ে, ধর্ম্ম নিয়ে, সম্প্রদায় নিয়ে, দেশ নিয়ে আর ভাষা নিয়ে মানুষের মধ্যে হাজার পার্থক্য থাকলেও তাকে বিভেদের কারণ বা দ্বন্দ্বের হেতু রূপে ব্যবহারের মতন মূর্খতা আর কিছুই নেই। মানুষে মানুষে পার্থক্য সত্যই স্বাভাবিক। যা' স্বাভাবিক, তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। যা' স্বাভাবিক, তাকে কলহের প্রশ্নে পরিণত করা মানসিক অসম্পূর্ণ গঠনের পরিচায়ক মাত্র।

সকল দেশ একই দেশ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পার্থক্য জগতে স্বাভাবিক কিন্তু শত পার্থক্যের মধ্যেও আমাদের খুঁজে নিতে হবে মিলটুকুকে। মানুষের জীবনের মহত্ত্ব, মানুষের চিন্তনের মাধুর্য্য, মানুষের

আচরণের সৌন্দর্য্য, মানুষের ত্যাগের সৌষ্ঠব, মানুষের দানের মহিমা, মানুষের সেবার মাধুরী, আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট কর্ম্মে জাতির, জন্মের, ধর্ম্মের, সম্প্রদায়ের, শিক্ষার, আর্থিক অবস্থার বা সুযোগের পার্থক্যের দরুণ কেউ আর কারো পর থাকতে পারে না। জানতে হবে, সব জাতি আমারই জাতিভুক্ত, সব ধর্ম্ম আমারই ধর্ম্মের অঙ্গ, সব সম্প্রদায় আমারই নিজের সম্প্রদায়, সব সমাজ আমারই নিজের সমাজ, সব দেশ আমারই নিজের দেশ। দেশ ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হ'য়ে তারপরে একদিন দেখা যাবে, সমস্ত পৃথিবী মিলে একটাই দেশ, সব দেশের মানুষ একটাই জাত, সব রকমের ধর্ম্ম একই ধর্ম্ম, সব রকমের ভাষা একই মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন, যার এক নাম ভাব, অপর নাম প্রণবধ্বনি। খুঁজে নাও, এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও সব-কিছুর মিলন-সূত্রটী কোথায়। বিভেদ খুঁজো না, বিভেদকে উস্কিয়েও দিও না। খোঁজ শুধু মিল।

বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই একত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই একত্ব-বোধ প্রতিষ্ঠিত হবে। বৈচিত্র্যকে গলা টিপে মারার চেষ্টা কর্ম্মে বরং নূতন নূতন অবাঞ্ছনীয় বৈচিত্র্যের উদ্ভব হবে। বৈচিত্র্যকে নিজের মনে থাকতে দাও, তুমি শুধু মিলটুকুর দিকেই লক্ষ্য রাখ। লক্ষ্য রাখ মহনীয় মিলের দিকে। দুনিয়ার

লোক দুরাচার হ'য়ে এক হ'ল, এই ঐক্যের কোনো সার্থকতা নেই। ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মানুষ শূদ্র হ'য়ে এক হ'ল, এর কোনও মাহাত্ম্য নেই। উন্নত আদর্শের সঙ্গে তাল রেখে যে মিল, সেই মিল প্রকৃত মিল। কারণ, উন্নতির একটা স্থিতিশীলতা আছে, গুরুতর অপরাধ ছাড়া যা' থেকে পতন ঘটে না। অবনতির কোনো স্থিতিশীলতা নেই,—সে পিচ্ছিল ঢালু পথে ধাবমান বন্দুকের ন্যায় নিয়ত অধোগতিপরায়ণ। সকলের সকল ছোটপনা, হেয়ত্ব ও নিকৃষ্টতার মিলকে মিল ব'লে ভ্রম ক'রো না। সকলের সকল বড়ত্ব, শ্রদ্ধেয়তা ও উৎকৃষ্টত্বের মিলকে লক্ষ্য ক'রে পথ চল। সমগ্র জগতের প্রতি প্রাণী নিজের অজ্ঞাতসারে এক অভ্যুদয়মুখী বিবর্ত্তনের ধারায় ছুটে চলেছে। এজন্যই তোমার লক্ষ্য থাক্‌বে ভালটুকুর দিকে, মন্দটুকুর দিকে নয়। হিন্দুর দানও দান, খ্রীষ্টানের দানও দান। মুসলমানের ত্যাগও ত্যাগ, ইহুদীর ত্যাগও ত্যাগ। অনীশ্বরবাদী বৌদ্ধের সংযমও সংযম, অগ্নিপূজক পার্শীর সংযমও সংযম। কার কোথায় কি ভাল, কতটুকু ভাল, তার কত্তে থাক খোঁজ। সকলের ভাল খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পাবে, সকলের সব সদ্‌গুণ, সকলের সকল সংকৃতি নির্ব্বিচারে নিখিল মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি।

ভিড় কমিয়া গেলে শ্রীশ্রীবাবামণি স্তূপীকৃত পত্রের উত্তর লিখিতে বসিলেন।

বিপন্ন-সহায়তায় শ্রেয়ঃ পন্থা

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত শেরপুর টাউন-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিপন্নকে সর্ব্বাবস্থায় সহায়তা করিবে,—অবশ্য সঙ্গতির গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া। এখানে সঙ্গতি শব্দের দুইটী অর্থ। একটী অর্থ তোমার আর্থিক সামর্থ্য বা নৈতিক বল। অপর অর্থ সমীচীনতা। সাধ্যের বাহিরে চলিয়া গেলে বা কাহাকেও সহায়তা করা অসমীচীন ব্যাপার হইয়া পড়িলে, তেমন স্থলে আমি তোমাকে কোনও ঝুঁকি নিতে বলিতে পারি না। কোনও বিধবা তরুণী কুলবধূ তাহার শাশুড়ীর নির্য্যাতনে নিজ শিশুপুত্র সহ প্রায় দিনই থাকে অভুক্ত। তোমার সহিত তাহার নাই কোনো সামাজিক আত্মীয়তার সম্পর্ক। এই কুলবধূটীকে তুমি আর্থিক সহায়তা দিতে গেলে এই সহায়তার কদর্য্য অর্থ করিয়া বধূটীকে আরও অধিক নির্য্যাতন করা হইতে পারে। সুতরাং ইহা অসমীচীন। একটী অল্পবয়স্কা যুবতী গণিকা তাহার গণ-সেবিকার কুপথ পরিহার করিয়া পবিত্র সামাজিক জীবন যাপন করিতে চাহে, তোমার বা আমার সাহায্য তাহার প্রয়োজন। নারী কখনো আশ্রয়হীনা অবস্থায় থাকিতে পারে না। তাহাকে কোনও পরিবারে আশ্রয় দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এমন পরিবার যদি না পাওয়া যায়, যেখানে তাহার সসম্মান আশ্রয় মিলিতে পারে বা তাহার

আগমনের দ্বারা কোনও পরিবারে শান্তি, শুচিতা, সৌষ্ঠব বা সম্ভ্রমের যদি গুরুতর হানি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে অশেষ সদিচ্ছা থাকিলেও এক্ষেত্রে তুমি আপাততঃ নিরুপায়। সুতরাং কোনও ভদ্র পরিবারের মধ্যে তাহাকে আশ্রয়ান্বিত করিবার চেষ্টা না করিয়া অন্যভাবে, সৎপথে, সদুপায়ে অন্নার্জ্জন করিয়া কি ভাবে সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা-চরিত্র করাই তোমার পক্ষে সমীচীন হইবে। সমাজ-সংস্কার-পন্থী ব্রাহ্ম-সমাজ দুঃসাহস করিয়া গণিকা-পল্লীর অধিবাসিনীদের মধ্য হইতে আপাত-প্রতীয়মান সৎপাত্রী খুঁজিয়া বাহির করিয়া এক সময়ে বিবাহ দ্বারা তাহাদিগকে ভদ্র পরিবারের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত সেই চেষ্টা সাফল্যের স্বর্ণকিরীটে অভিনন্দিত হইয়াছিল কিনা, কেহ জানি না। মোটকথা, বিপন্নকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাক কিন্তু নিজ নিরাপত্তাকে বিপন্ন করিবার ঝুঁকি মাত্র সেইখানে নিবে, যেখানে উক্ত কার্য্যে সহায়তা করিয়া জীবন তোমার ধন্য হইবে। ছোটখাট সৎকার্য্য করিয়া ছোটখাট সহায়তা বিপন্নকে সর্ব্বদাই করিবে কিন্তু অস্তিত্বের কোনও গুরুতর প্রশ্ন বা নৈতিকতার কোনও মৌলিক জটিলতা হইতে দূরে থাকিয়া কাজ করাই শ্রেয়ঃ হইবে। বস্তুতঃ জগতের সকল দুঃখ কদাপি একজনের আত্মাহুতির দ্বারা দূর হইতে পারে না,

এজন্য জগদ্বাসী অনেক লোকের শুভসঙ্কল্প এবং ত্যাগস্বীকার প্রয়োজন। সুতরাং নিজের অসাধ্য কর্ম্ম বলিয়া কোনও কর্ত্তব্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিও না। বরং লোকমত জাগ্রত করিয়া সকলের দৃষ্টি একদিকে আকর্ষণ করিয়া সকলের সহযোগিতায় সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিও। যাহা তোমার একার পক্ষে হয়ত বা সাধ্য নহে অথবা যাহা তোমার একার পক্ষে হয়ত সমীচীনও নহে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্ণয়-ব্যাপারে যেখানে সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ আছে, সেখানে ইহাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ পন্থা। মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা-দুর্গতিতে প্রাণ কাঁদিবে, ইহা আনন্দের কথা, সৌভাগ্যের কথা কিন্তু প্রাণের সেই কান্নাকে সমস্ত মানুষের কাণে পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হইবে। তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে যে, তুমি যেখানে একক অবস্থায় একেবারেই অশক্ত, অপর বহুজনের সাহায্য, সহায়তা ও সমর্থনের মহিমায় সেখানে তোমার অভীপ্সিত জন-কল্যাণের ফোয়ারা কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়াও তরতর বেগে সুশীতল বারি-ধারা নিঃসারিত করিয়া দিতেছে। তোমার কর্ত্তব্যবুদ্ধির সহিত আরও শত সহস্র মানুষের বুদ্ধিকে সম্মিলিত করিয়া নিবার প্রয়াসকে দেও প্রাধান্য এবং নিজের বুদ্ধিকে শুদ্ধ, সুন্দর, ত্রুটিহীন ও প্রখর করিবার জন্য নিরন্তর নিয়ত থাক একাগ্র, উদগ্র, নিষ্ঠাময় সাধনে।"

প্রস্তুত হও

ফরিদপুর জেলান্তর্গত ভাঙ্গা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সর্ব্ব সময়ে ওৎ পাতিয়া থাক যে, সুযোগ কখন আসে। আর, সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হইতে থাক যেন সুযোগ আসিলে হঠাৎ চলিয়া না যাইতে পারে। সুযোগের চুলের মুঠি তোমাকে শক্ত করিয়া ধরিতে হইবে। অসীম অধ্যবসায় সহকারে এবং অশেষ ধৈর্য্য নিয়া নিজেকে মহৎ কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত করিতে থাক। কি ভাবে চলিলে, কি ভাবে ভাবিলে তোমার গমনপথ সরল হইবে, তোমার চিন্তাধারা স্বচ্ছ ও অনাবিল হইবে, তাহার দিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখ। সুপ্রস্তুত মানুষ কখনো কখনো মাত্র মুখের কথায় এমন অসাধারণ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া দেন, যাহা অপ্রস্তুত মানুষেরা গায়ে পায়ে খাটিয়াও করিয়া দিতে পারে না। পূর্ব্ব-পরিকল্পনা, গভীর চিন্তা, ভবিষ্যৎকে সুস্পষ্ট দেখিবার চেষ্টা এবং দোষত্রুটিবর্জ্জিত ছিদ্রহীন অকপট প্রয়াস তোমাকে মহাবলীয়ান্ করিয়া তুলিবে। সাময়িক অসাফল্যে দমিয়া না গিয়া দৃঢ়চেতা হইয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও। তোমার এই আত্মপ্রস্তুতি একা তোমার কুশলের জন্য নহে, বিশ্বের সকলের জন্য।"

অখণ্ডমণ্ডলীর প্রাণ

কুমিল্লা জেলান্তর্গত নবীনগর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অখণ্ডমণ্ডলী গঠন করিবার পরে কিছুদিন কতক লোকের সাময়িক উৎসাহ দেখা যায়। কাল-সহকারে লক্ষ্য করা যায় যে, উৎসাহে ভাটা পড়িতেছে। ইহার কারণ সকল সময়েই আর্থিক বা সাংসারিক নহে। ইহার নৈতিক কারণও আছে। সুতরাং সুপ্রতিষ্ঠ আদর্শবাদেরও প্রয়োজন। হুজুগে পড়িয়া যাহারা শিষ্য হয়, তাহাদের আচরণে আদর্শবাদের বালাই থাকে না। দুই চারি দিন যাহা ভাল লাগিল, করিল, তারপরে ভাল না লাগা মাত্র তাহারা পথ ছাড়িয়া দূরে সরিয়া পড়িল। ইহা নৈতিক জীবনের দৃঢ়তার অভাব হেতু ঘটিয়া থাকে। নৈতিক জীবনের মূল কথা সত্য। সত্যের প্রাণ-বিন্দু নিষ্ঠায়। নিষ্ঠা আসে বিশ্বাস হইতে, নির্ভর হইতে, সুগভীর অনুরাগ হইতে। বিশ্বাস আসে বিশ্বাসীর দুশ্চিন্তামুক্ত মধুর ও লাবণ্যযুক্ত সুন্দর মুখমণ্ডলটী দেখিয়া। নির্ভর আসে প্রকৃত নির্ভরশীলের পদসঞ্চালনের দৃঢ়তা দেখিয়া, বাহু-প্রসারণের অবাধ উন্মুক্ত স্বাধীনতা দেখিয়া। অনুরাগ আসে প্রকৃত অনুরাগীর নিয়ত-ধ্যান-পরায়ণ স্নেহার্দ্র অক্ষিযুগল দেখিয়া। তোমরা এই সকলের দৃষ্টান্ত-স্থানীয় হও। দৃষ্টান্ত নাই বলিয়াই কেহ তাহার অনুসরণও করে না। একটী প্রাণবান্ শিষ্য দশটী

অখণ্ডমণ্ডলী গড়িতে পারে। হাজার বুদ্ধিমান্ শিষ্য হয়ত একটী অখণ্ডমণ্ডলীকেও রক্ষা করিতে পারে না। কারণ, অখণ্ডমণ্ডলীর প্রাণ হইতেছে আদর্শ ও অনুরাগ। আদর্শ মণ্ডলীর নিঃশ্বাস-বায়ু, অনুরাগ মণ্ডলীর প্রশ্বাস-বায়ু। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া কেহ কি বাঁচে? আদর্শের প্রাণ আছে। তার নাম কর্ত্তৃত্বলিপ্সাহীনতা বা নিরভিমান সেবা।"

সাহিত্যের সদ্ব্যবহার

ঢাকা জেলান্তর্গত দীঘিরপার-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কেবল সাহিত্য-কর্ম্ম দ্বারা কোনও জাতি বড় হয় না। সাহিত্যানুরাগ, সাহিত্য সৃষ্টির দক্ষতা এবং সাহিত্যের সুপ্রসার-সাধন কোনও জাতির চিন্তাশক্তির দ্রুত-ধাবনক্ষমতার প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু সৎসাহিত্য যে-সকল কল্যাণময় নির্দ্দেশ ও ইঙ্গিত প্রদান করিয়া থাকে, তদনুযায়ী জনে জনে নিজেদের আভ্যন্তরীণ যোগ্যতা ও বাহ্য কর্ম্মচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় লাগিয়া যাইতে পারিলে জাতি বড় হয়। ভাল ভাল পুস্তক লিখিয়াছি বা নামী নামী গ্রন্থ পড়িয়াছি, এইটুকুই একটা জাতির জীবনশক্তি বর্দ্ধিত করে না। যাহা সদ্‌বিষয়ে লিখিয়াছি বা যাহা সদন্তঃকরণে পড়িয়াছি, তাহাকে কেবল ভাব আর ভাষার জগতে বিচরণশীল থাকিতে না দিয়া জীবনের প্রতি কর্ম্মে

রূপায়িত করিবার চেষ্টায় নামিলে জীবন-ধর্ম্ম এক সার্থক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিবে, যাহার সংস্পর্শে আসিয়া শত ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গিবে, সহস্র অলসের মধ্যে নিরলস উদ্যম জাগিবে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উদাসীন মানব-মানবীর কর্ম্মহীন বাহুতে কর্ম্মশীলতার বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রধাবিত হইবে। সাহিত্যের এই ব্যবহারই সাহিত্যের সদ্ব্যবহার।"

আত্ম-প্রসাদের খনি

ঢাকা-জেলান্তর্গত পলাশ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবৎকালে যাহাদের নির্দ্দেশ পালিত হয় না, মরিয়া গেলে তাহারা বড় দামী লোক আর আদরের পাত্র হইয়া পড়ে। তখন স্মৃতিসভা হয়, ভাল ভাল বক্তৃতা হয়, পত্রিকায় পত্রিকায় কত প্রবন্ধের অবতারণা হয়। সারা পৃথিবী জুড়িয়াই এই কাণ্ড চলিতেছে। বড় বড় লোকদের নিয়াই যখন ইহা চলিয়াছে, তখন তোমার বা আমার মত সাধারণ লোক জীবৎ-কালে কোনও স্বীকৃতি পাইল না বলিয়া আফশোষ কেন? জীবৎকালে কে কতটুকু সমাদৃত হইল, তাহা দিয়া মানুষের মহিমার মূল্য নির্ণীত হয় না। সেই মানুষটী নিজের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন জীবনের নানা চেষ্টা, চিন্তা ও উৎকর্ষ দ্বারা মানব-সমাজকে সকলের অজ্ঞাতসারে কি পরিমাণ উন্নতিমুখিনী প্রেরণা দিয়া গেল, মহত্ত্বের বিচার তাহা দ্বারা হয়। অনেক

বড় বড় কাজ করিতে পার নাই বলিয়া অন্তরে দুঃখরাশি সঞ্চয় করিতে যাইও না। অনেক ছোট ছোট ভাল কাজ আজও তুমি করিতে পার, অতীব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পার। ছোট ছোট ভাল কাজ নিরন্তর করিবার রুচি অন্তরের মধ্যে জাগ্রত কর। তাহা দ্বারা তোমার যশোবৃদ্ধির সম্ভাবনা না উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে কিন্তু সুপ্রচুর ও সুবিমল আত্মপ্রসাদের হইবে তাহা খনি-স্বরূপ।"

সকলের বিবেককে মুখর কর

বরিশাল জেলান্তর্গত গুলিশাখালী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দেশের অবনতির কথা ভাবিয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেই চলিবে না, কিছু কাজও করিতে হইবে। সব চেয়ে বড় কাজ হইবে অবনতিকে প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য লোকমত তৈরী করা। একা একা সৎচিন্তা করিলে কখনো কখনো সেই চিন্তা স্বার্থপর এক গোপন চিত্ত-বিলাসে পরিণত হইতে পারে। অপর দশজনকে সেই চিন্তার সহিত অংশভাক্ করিতে পারিলে বহুজনের চিন্তার তরঙ্গগুলি মিলিত হইয়া নিত্য নূতনতর হিতচিন্তার উদ্বোধক হইয়া উঠিতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই বিচার খুবই কার্য্যকর হইয়া থাকে। সচ্চিন্তার এমন একটী স্তর আছে, যেখানে অন্যকে আনিয়া ভাগীদার করা যায় না। তাহা হইতেছে মানুষের অন্তরতম

অনুভবের ব্যাপার। কিন্তু যেখানে দেশ, সমাজ, জাতি ও জগতের সামূহিক কুশল বা উন্নতি-অবনতির প্রশ্ন, সেখানে যত অধিক লোককে তোমার সচ্চিন্তাগুলির সহিত পরিচিত করিয়া লইতে পারিবে, ততই তোমার অভিলষিত সৎকর্ম্মের বাস্তবায়ন সুসম্ভবতর হইবে। দেশ ও সমাজের মঙ্গল-সাধন সম্পর্কে সকলের মনকে জাগ্রত কর, সকলের বিবেককে মুখর কর, সকলের বাক্‌কে উদ্যত কর।"

পাবনা

২০শে ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৪১

(৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৩৫)

স্বপ্ন-দর্শন

প্রাতে ৫-৩৫এ সিরাজগঞ্জ ত্যাগ করিয়া বেলা ১১টা ৫ মিনিটে শ্রীশ্রীবাবামণি পাবনা আসিয়াছেন। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় ও মহা-বিদ্যালয়ের জনা দশেক ছাত্রী ফুলমাল্যাদি নিয়া ষ্টেশানে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি পাবনা আসিবেন, একথার কোনও প্রচার ছিল না। এমনকি, যাঁহার গৃহে তিনি উঠিবেন, তাঁহাকে নিষেধ করা ছিল যেন আগমন-বার্ত্তা না জানানো হয় এবং কোনও সভা-সমিতির আয়োজন করা না হয়। আতিথ্যদাতা স্থানীয় কৃষি-বিভাগের জেলা-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত অবনী মোহন মজুমদার মহাশয় কথা রাখিয়াছেন। তথাপি একদল কুমারী-মায়েদের ষ্টেশানে আবির্ভাব দেখিয়া

শ্রীশ্রীবাবামণি ভাবিলেন যে, হয়ত কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ট্রেণে আসিয়া পাবনা সহরে নামিয়াছেন এবং তাঁহাকেই অভ্যর্থনা করিতে কুমারী মায়েরা আসিয়া থাকিবেন।

একটী কুমারী হঠাৎ শ্রীশ্রীবাবামণিকে দেখিতে পাইয়া "এই ত" "এই ত" বলিতে বলিতে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ব্যাপার কি জানিবার জন্য শ্রীশ্রীবাবামণি একটু থামিলেন। মাল্যার্পণ ও প্রণামের একটা যেন হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল।

জিজ্ঞাসায় জানা গেল, ইঁহারা প্রতি জনে গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে আজ বেলা এগারটার ট্রেণে একজন মহাপুরুষ পাবনাতে পদধূলি দিবেন। তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন না, পরেন শুভ্র বেশ, তিনি ভিক্ষা করেন না, চাঁদা তোলেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অবনী বাবু শ্রীশ্রীবাবামণিকে ষ্টেশানে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তিনিও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন,—এমন ঘটনা কি ক'রে হতে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শরীরের নিদ্রিত অবস্থায় মন যা' জানে, তাকে বলা হয় স্বপ্ন। মন যখন শুদ্ধ থাকে, তখন দেহের নিদ্রিতাবস্থায়ও সে অতীত-ভবিষ্যৎ সঠিক ভাবে জান্‌তে পারে। সংযমী ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ পুরুষ বা নারীর মন স্বপ্নেও সত্যকে দেখ্‌তে পায়। পাবনা আমি আস্‌ব ব'লে এক

আপনি ছাড়া আর কেউ জান্‌ত না কিন্তু এরা সময়-মত জেনেছে। স্বপ্ন-সর্ব্বসময়েই মিথ্যা নয়। মিথ্যা হ'লে এরা ষ্টেশানে এসে আমাকে দেখ্‌তে পেত না।

মেয়েদের দীক্ষা

একটা মেয়ে বলিল, শুধু খবরটুকুই স্বপ্নে জানি নি বাবামণি, আপনাকে আমি স্বপ্নে সুস্পষ্ট দেখতেও পেয়েছি। নতুবা আপনাকে চিনতে পারতাম না। আচ্ছা বাবামণি, আমাদিগকে আপনি দীক্ষা দেবেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না মা, গুরুজনের অনুমতি ছাড়া আমি কদাচ কোনো মেয়েকে দীক্ষা দেই না।

—আচ্ছা বাবামণি, আপনি যেখানে যাচ্ছেন, আমরা সেখানে গিয়ে আপনার চরণ-দর্শন কর্ব্ব, একান্তে কিছু কথা বল্‌ব, তার কি অনুমতি দেবেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুজনদের অনুমতি ছাড়া বা তাঁদের সঙ্গে ছাড়া আমি কোনো মেয়েকে দর্শনও দেই না, উপদেশও দেই না। তোমরা তোমাদের গুরুজনদের নিয়ে আস্‌বে, তা' হ'লেই আর কোনো ঝামেলা নেই।

একটী মেয়ে বলিল,—গুরুজনেরা আপনাকে চেনেন না, আপনার বিষয়ে কখনো কিছু শোনেনও নি। এমতাবস্থায় আপনার কাছে দীক্ষা নিতে তাঁরা অনুমতি দেবেন ব'লে আমাদের বিশ্বাস হয় না বাবামণি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হবার দরকার নেই। কাল-প্রতীক্ষা কর। সময় মত যা' যখন দরকার, হবেই হবে। বিনা চেষ্টায় যখন আমার খবর পেয়েছ, তখন বিনা চেষ্টায় দীক্ষাও হ'য়ে যাবে। এখন মায়েরা সব বাড়ী যাও।

মায়েরা বলিল,—বাড়ী যাব না, স্কুলে বা কলেজে যাব। ছুটি নিয়ে ষ্টেশানে এসেছি। কারণ-স্বরূপ বলেছি জরুরী কাজ। আপনি আমাদের স্বপ্নেই ব'লে দিয়েছিলেন, সাবধান, কাউকে জানাবে না।

পাবনা

২১শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার,১৩৪১

(৫ই মার্চ্চ, ১৯৩৫)

ভারতীয় শিক্ষার বনিয়াদ

শ্রীশ্রীবাবামণির পাবনা আগমনের সংবাদ ইহার পরে আর গোপন রহিল না।

কলেজের প্রিন্সিপাল রায় বাহাদুর বসু এবং স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রমদা বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন। বসু মহাশয় অনুরোধ করিলেন যে, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মঙ্গলার্থে একটী ভাষণ দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্রীহট্ট ও শিলচরের শ্রমে শরীর ক্লান্ত, কণ্ঠ কর্কশ এবং হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল। এখন আর ভাষণ দিতে চাই না।

শ্রীযুক্ত বসু বলিলেন,—সামান্য কিছু উপদেশ হ'লেও কাজ হবে। এত দুর্নীতি চলছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে, পরীক্ষার হলে গেলে চ'খ বন্ধ ক'রে ব'সে থাক্‌তে হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ছাত্রছাত্রীদের আর কি বলব, বলুন। বলার প্রয়োজন তাদের পিতামাতাদিগকে। মা-বাপ্ যদি নিজ নিজ জীবনে সত্য, সংযম, সদাচার, সন্নীতি ও সদনুশীলনকে স্থান না দেন, ছেলেমেয়েরা স্কুলে আর কলেজে যায় ব'লেই কি এক একজন মহাপুরুষে পরিণত হ'য়ে যাবে? ছাত্র-শিক্ষার মূল কথা পিতৃমাতৃ-শিক্ষা। শিক্ষক আর অধ্যাপকেরা সৎ জীবন যাপন কচ্ছেন কিনা, তারও প্রভাব তথা প্রতিক্রিয়া বারংবার ছাত্রদের উপরে এসে প্রতিফলিত হবে। তাই, সংশোধন শুধু ছাত্রেরই নয়, শিক্ষাদাতা ও জন্মদাতা উভয়েরই প্রয়োজন। সার্ব্বজনিক সংশোধন-ক্রিয়া যদি যুগপৎ ছাত্র-সমাজে, শিক্ষক-সমাজে, পিতৃমাতৃ-সমাজে চল্‌তে থাকে, তবেই জাতি এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহত্ত্ব নিয়ে আবির্ভূত হবে। আমাদের দেশের শিক্ষাবিষয়ক প্রাচীন চিন্তা এই তিনটীর দিকে সমান দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বিজ্ঞান যত দ্রুত এগিয়ে এসে মানুষকে লক্ষ-লক্ষ নূতনতর ভোগ্যপণ্য সরবরাহ ক'রে চমৎকৃত করেছে, শিক্ষাদানের এই সর্ব্বতোভদ্র পরিকল্পনা তার সঙ্গে সঙ্গে তত দ্রুত চল্‌তে পারে নি। ঠিক এই কারণেই ভারতীয় শিক্ষামূলক কর্ম্মধারা হঠাৎ যেন মরুভূমির মধ্যে এসে পথ হারিয়ে গেল এবং লুপ্ত

হ'ল। যে ছাত্র, সে-ই গুরুকুলের অন্নার্জ্জনকারী, গুরুগৃহে অন্নার্জ্জনের জন্য ভৃত্য-নিয়োগ নেই, যে উচ্চমানের ছাত্র, সে-ই নিম্নমানের ছাত্রদের সহকারী অধ্যাপক, গুরুগৃহে দলে দলে শিক্ষকের নিদারুণ ভিড় নেই; যে শিখ্‌ছে, সে অন্নার্জ্জনও কচ্ছে, যে অন্নার্জ্জন কচ্ছে, সে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্জ্জনও কচ্ছে, যে নিজে শিখ্‌ছে, সে আবার অনুজনকে শিখাচ্ছে, নিম্নমানের ছাত্রকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে গিয়ে সে নিজের অসম্পূর্ণ শিক্ষাকে পদে পদে পাকা ক'রে নিচ্ছে,—এইটীই হ'ল ভারতীয় প্রাচীন জীবনের শিক্ষা-সম্পর্কিত কর্ম্মনীতি, এইটীই হ'ল গুরুকুলের শিক্ষা-ভাবনার মূলকথা। এতে ব্রহ্মচর্য্য একেবারে গোড়ার জিনিষ, জীবন-বৃক্ষের মূল, জীবন-সৌধের ভিত্তি, জীবনচর্য্যার পাদপীঠ। ছাত্রের পিতামাতা এ আদর্শকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা কর্ব্বেন, শিক্ষাদাতা এ আদর্শকে বাস্তবায়িত কর্ব্বার জন্য আপ্রাণ শ্রম স্বীকার কত্তে কুণ্ঠিত থাক্‌বেন না, তবে ত' শিক্ষা থেকে যাবতীয় গলদের হবে নির্ব্বাসন। বর্ত্তমান শিক্ষার আপাদমস্তক দূষিত ক্ষতের মতন অনভিপ্রেয় বস্তু। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সহজ কিন্তু প্রতীকার সহজ নয়।

প্রকৃত শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের বাধা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভেবে দেখুন, বর্ত্তমানে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য প্রতিজনের কাছে প্রকৃত প্রস্তাবে কি। একটা চাকুরী পাওয়া। এর বেশী বা এর চেয়ে বড় কিছু

কেউ কি চায়? কি আমরা চাইব বা কি চাওয়া উচিত নয়, তার জন্যও ত' একটা শিক্ষার প্রয়োজন। যাঁদের কেরাণীর দরকার ছিল, তাঁরা কেরাণীখানার জরুরী প্রয়োজনে কেরাণীত্বকে জীবনের চরম আদর্শরূপে প্রতিভাত করিয়ে এক প্রকারের শিক্ষা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাজশক্তি আপনাদের হাতে না এলে আপনারা কি ক'রে এই পদ্ধতির পরিবর্ত্তন-সাধন কর্ব্বেন? আবার রাজশক্তি কালের মহিমায় কখনো আপনাদের করায়ত্ত হ'য়ে গেলে তখনো হয়ত পরানুকরণপ্রবৃত্তির দাসত্বহেতু আপনারা নূতন কোনও শিক্ষা-প্রথার প্রবর্ত্তন কত্তে পার্ব্বেন না। অথবা সৎসাহসের অভাব হেতু হয়ত শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সত্যিকারের লাভজনক কোনো পরিবর্ত্তন ঘটাতে পার্ব্বেন না। অথবা হয়ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিজেদের খোশখেয়ালকে বড় দামী এক প্রতিভার অবদান ব'লে অহঙ্কৃত হ'য়ে প্রকৃত জ্ঞানীর জ্ঞানগর্ভ হিতোপদেশে কর্ণপাত কর্ব্বেন না। এগুলি প্রকৃত শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের দারুণ বাধা হ'য়ে থাক্‌বে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক হতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক ও জৈবিক উদ্দেশ্য অন্নার্জ্জন করার যোগ্যতা লাভ করা, জীবন-সংগ্রামে পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনা

হ্রাস করা, সসম্মানে বেঁচে থাকবার অধিকার অর্জ্জন করা। তারপরের উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে জ্ঞান লাভ করা, সদসৎ বিচার ক'রে অসৎকে বর্জ্জন ও সৎকে চেনার ক্ষমতা লাভ করা, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে চিনে নেওয়া, মনুষ্যজন্ম লাভের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা। কিন্তু তার চেয়েও বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন চরিত্রবল লাভ করা, যার ফলে সৎকে চেনার পরে হাজার প্রলোভনেও মন টলে গিয়ে অসৎ পথে চলবে না, যার ফলে প্রাণনাশের আশঙ্কাকে তুচ্ছ ক'রে হ'লেও প্রকৃত কল্যাণের পথ ছেড়ে দেহ অমঙ্গলের পথে পাদচারণা কর্ব্বে না। চরিত্রের সাধনায় সিদ্ধি লাভে যে শিক্ষা সহায়তা করবে না, তাকে কুশিক্ষা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কিন্তু এর চেয়েও বড় একটী উদ্দেশ্য রয়েছে শিক্ষার, যে উদ্দেশ্য পূরণ হ'লে আমার দেহ, আমার মন, আমার চেষ্টা, আমার সাধনা একমাত্র আমার ব্যক্তিগত শুদ্ধি বা সিদ্ধিকেই জীবনের চরম লাভ ব'লে গণনা কর্ব্বে না, চাইবে জগতের প্রতিটি মানবের, প্রতিটি মানবীর—এমনকি, জগতের প্রতিটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণীর,—পরমসুখ-সংসিদ্ধির জন্য নিজেকে নিঃশেষে বলি দিয়ে দিতে। সর্ব্বজীবহিতার্থে, সর্ব্বজাতির কল্যাণকল্পে, সর্ব্বকালের সর্ব্বজনের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল-সাধনে নিজেকে নিঃশেষে এবং অবহেলে বলি দিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য লাভই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের ভিত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিক্ষার এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ কত্তে হ'লে প্রথমেই চাই এই বিশ্বাস যে, আত্মা অমর, তার মৃত্যু নেই, দেহ বারংবার জন্মাতে বা ম'রে যেতে পারে, আত্মার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। শিক্ষার এই উদ্দেশ্যটীর পরিপূর্ণতা সাধন কত্তে হ'লে এই বিশ্বাসটীকে প্রাণ ভ'রে ধরে নেওয়া চাই যে, আমার জীবন কেবল আমারই জন্য নয়, নিখিল বিশ্বের সকলের কুশলের জন্য। জান্‌তে হয়, আমার একার মুক্তি মুক্তিই নয়, আমাকে মুক্তি অর্জ্জন কত্তে হবে সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর জন্য।

সিরাজগঞ্জ
২৩শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১
(৭ই মার্চ্চ, ১৯৩৫)

আমি তোমার নিত্যসাথী

কাল রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবামণি পাবনা হইতে সিরাজগঞ্জ ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা শৈলবালা সেনগুপ্তা বলিলেন,—বাবামণি, আমি আর কোনও ঈশ্বর জানি না বা বুঝি না। আমি আপনাকেই আমার ঈশ্বর বা ভগবান্ ব'লে জ্ঞান করি। আপনার পূজা কল্লেই বিশ্বের সর্ব্ব-দেবতার পূজা হয়। আপনাকে ধ্যান

কল্লেই জগতের আদি-অনাদি সর্ব্বযুগের পরিপূজিত প্রতিটি দেবতা, প্রতিটি অবতার, প্রতিটি মহাপুরুষের পূজা করা হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বড় হাসির কথা হ'ল মা। আমি তোমাদের গুরু, তোমরা আমাকে ভগবান্ ব'লে, পরমেশ্বর ব'লে জ্ঞান কর্ব্বে, ধ্যান কর্ব্বে, আরাধনা কর্ব্বে,—একথা শুন্‌লে হাসি পায় মা, হাসি পায়। ভগবান্ হ'তে গেলেই আমাকে তোমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর হ'তে হবে, তোমাদের চোখ আমাকে দেখবে না, তোমাদের কাণ আমার কথা শুন্‌বে না, তোমাদের হাত আমার চরণ-স্পর্শ পাবে না, তোমাদের মন আমাকে ভাবতে ভাবতে আকুল হবে কিন্তু থেই হারিয়ে ফেলবে, থৈ পাবে না, তোমাদের বুদ্ধি আমাকে নিয়ে অগাধ জলে হাবুডুবু খাবে কিন্তু দেখবে আমি যেমন মনের অগোচর, তেমন বুদ্ধিরও অগোচর। সুতরাং ভগবান্ হ'য়ে লাভ নেই। তবে আমি কি? আমি তোমাদের নিত্যসঙ্গী, নিত্যসাথী। আমি সর্ব্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকি, কাছে কাছে থাকি, পাছে পাছে থাকি। তোমাদের ধ্যানকালে আমি সাক্ষিস্বরূপ, তোমাদের উপাসনাকালে আমি তোমাদের সমসাধক, তোমাদের অগ্রগমনের পথে আমি নিয়ত তোমাদের হাত ধ'রে নিয়ে যাই। অধঃপতনের পিচ্ছিল পথে আমি জোর ক'রে তোমাদের টেনে ধ'রে রাখি। আমাকে এভাবে ভেবো। আমাকে পরমেশ্বর বানিয়ে নিজে ঠ'কে যেও না।

গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজ নিজ গুরুদেবকে স্বয়ং পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরের অবতার ব'লে পূজা করার একটা রীতি এই দেশে বহুল-প্রচলিত। এর ভালো বা মন্দ নিয়ে বিচার কত্তে বসার আমার প্রয়োজন নেই। যে যেখানে নিজের মনকে নিঃশেষে বসিয়ে দিয়ে ডুবে যেতে পারে, সেইখানটীতেই সে তার ঈশ্বরকে পেতে পারে। একথা মিথ্যা নয়, পূর্ণ সত্য। কিন্তু "নিঃশেষে" কথাটুকুর দিকে একটু খেয়াল রাখো। যেখানে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার পর আর কোথাও ডুবে মরার ভয় থাকে না, সেখানেই নিঃশেষে ডোবা হ'ল ব'লে জানবে। সমুদ্রে কেউ ডুবে মরলে আর তার ডোবায় বা তুচ্ছ গর্ত্তে ডুবে মরার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং কে কাকে কখন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ব'লে মনে কর্ব্বে, এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা' নিয়ে বাইরের লোকের অনধিকার-প্রবেশের সার্থকতা কোথায়? কিন্তু তুমি যদি একজনকে তোমার ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার ব'লে প্রচার কত্তে সুরু ক'রে দাও, তাহ'লে আর একজনও তাঁর ভালবাসার কেন্দ্রস্থল দ্বিতীয় এক মহাপুরুষকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার ব'লে প্রচার সুরু ক'রে দেবে। দলে দলে ঈশ্বরেরা আর ঈশ্বরাবতারেরা চারিদিকে কেবল আবিষ্কৃতই হতে থাকবেন

এবং অনেক ঈশ্বরের আর অনেক অবতারের ভিড়ের মধ্যে আমার বা তোমার মত সাধারণ বুদ্ধির লোকদের দিগ্‌-বিভ্রান্ত হ'য়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি কত্তে কত্তে হয়রাণির একেবারে একশেষ হবে। সুতরাং কেউ যদি হঠাৎ খুব আশ্চর্য্য রকমের বুঝ কিছু পেয়ে থাক, তবে তা নিজ অন্তরেই গোপন ক'রে রাখ, প্রচার কত্তে যেও না।

সর্ব্বত্র পরমেশ্বর দর্শন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরমেশ্বর কি আমাতে নেই? নিশ্চয়ই আছেন। আমি কি এক হিসাবে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন নই? নিশ্চয়ই অভিন্ন। তবে আমাকে আমি পরমেশ্বর বলে প্রচার কর্ব্বি না কেন? এই জন্য কর্ব্বি না যে, তোমাতেও ত' তিনি আছেন, তুমিও তাঁর সঙ্গে অভিন্ন। প্রচারই যদি কত্তে হয়, তবে একা আমার কথাই প্রচার কর্ব্ব কেন, আর তোমার কথাই বা প্রচার কর্ব্ব না কেন? আমি যেমন পরমেশ্বর, তুমিও তেমন পরমেশ্বর। আমি হয়ত জেনেছি, তুমি হয়ত জানো নাই,—তফাৎ ত' মাত্র এইটুকু। পরমেশ্বর সর্ব্ববস্তুতে বিরাজমান। তিনি ছাড়া কিছু নেই, কখনো ছিল না, কখনো থাকবে না। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় পরমেশ্বরকে দেখতে পাওয়া, জানতে পারা এবং উপলব্ধি করাই হচ্ছে ভারতীয় চিন্তাধারার পরম বিশেষত্ব।

উদারতা ভারতীয় চিন্তাধারার বিশেষত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার দেখায় আর তোমার দেখায় পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু তুমি এক রকম আর আমি আরেক রকম দেখেছি ব'লেই যে, তোমার উপলব্ধি মিথ্যা হবে, একথা ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে নেই। আমি আমার মতন ক'রে দেখেছি, তুমি তোমার মতন ক'রে দেখেছ, এজন্য তোমার সঙ্গে আমার কলহেরও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এই সহনশীলতার মনোভঙ্গীই হচ্ছে ভারতীয় চিন্তাধারার বিশেষত্ব। এই সহনশীলতা আছে ব'লেই বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, মৃৎপিণ্ড, শুষ্ক দারুখণ্ড, মূর্ত্তি, প্রতীক বা কোনো জীবজন্তু পর্য্যন্ত নানা স্থানে নানা জনে ঈশ্বরের স্মারক-রূপে গ্রহণ ক'রে পূজা করেছে কিন্তু অনুভবী সাধকেরা একজনেও এদের কাউকে গর্হণ করেন নি। সুতরাং হাজার হাজার মানুষ প্রিয় ভক্তদের দ্বারা ঈশ্বর-রূপে বা ঈশ্বরাবতার-রূপে পূজা পাবেন, এটা কোনো আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়।

গুরুদেবকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু নিজ নিজ গুরুদেবকে ঈশ্বর ব'লে প্রচার কত্তে যাওয়া আর তাঁদের পূজা ভূমণ্ডলে প্রবর্ত্তিত করার জন্য চেষ্টায় নামা একটা হাস্যকর ব্যাপার।

কারণ, অনেক কল্পিত কাহিনীর অবতারণা ক'রে সহস্র সহস্র লৌকিক সদ্গুণে বিমণ্ডিত একজন মহাপুরুষকে তখন অলৌকিকের জগতে টেনে নিতে হয়। এই সব অলৌকিকের কিছু কিছু হয়ত বাস্তব সত্য, কিছু কিছু হয়ত বা প্রচারকদের অজ্ঞাতসারে সৃষ্ট কল্পিত কাহিনী। এই অধ্যবসায়ে নেমে যাওয়ার পরে অন্য নূতন অবতারের আবির্ভাবকে আর ঠেকিয়েও রাখা যায় না, আবার সহ্য করাও যায় না। এর ফলে অন্তরে আসে অসহিষ্ণুতা ও অসন্তোষ। এর ফলে সঙ্ঘে সঙ্ঘে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সৃষ্ট হয় মৃদু বা তীব্র কলহ। শান্তির জগতে নূতন অশান্তির সৃষ্টি শুরু হ'য়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবার এরূপ ঘটনা ঘটেছে। অস্ত্রবলে বলীয়ান্ সম্প্রদায়ের লোকেরা নূতন ঈশ্বরাবতার বা ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষকে হত্যা করার চেষ্টায়ও কসুর করেন নি। কত অবতার পৃথিবীতে এসেছেন আর কত জন যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছেন, কে তার হিসাব রাখে? সুতরাং নিজেদের গুরুদেবকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার ব'লে প্রচারের চেষ্টায় না নেমে তাঁর স্বাভাবিক মানবিক সদ্গুণাবলিকে চোখের সম্মুখে রেখে প্রত্যেকেরই এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে দর্শনের যাত্রাপথে নেমে পড়া উচিত। তোমার গুরুদেবকে দিয়ে তোমার ঈশ্বরদর্শন-চেষ্টার শুভসূচনা হ'লে হ'তে পারে কিন্তু পরমেশ্বরকে দেখতে হবে সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, সর্ব্বাবস্থায়। এটাই হ'ল সব সাধনার চরম লক্ষ্য।

তিনি সর্ব্বভূতে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা বিরাজিত। এইটী জানাই হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। এই জ্ঞানটুকু লাভ করার জন্যই যত যোগ, ধ্যান, দান ও তপস্যা লোকে ক'রে থাকে।

২৪শে ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৪১
(৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৫)

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি সিরাজগঞ্জ হইতে রংপুর রওনা হইবেন।

সংগঠন, পরিকল্পনা ও গণসংযোগ

ফরিদপুর জেলান্তর্গত ঘড়িসার-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংগঠন মানেই গণ-সংযোগ। সংগঠনের আরম্ভ থাকিতে পারে কিন্তু শেষ নাই। একবার আরম্ভ হইলে ইহা অবিরাম অবিশ্রাম অনন্তকাল পর্য্যন্ত চালু থাকিবে বা চালু রাখিতে হইবে। সংগঠন-কর্ম্মে ক্ষণিকের জন্যও থামিয়া যাওয়ার অবসর নাই,—অবিরাম অবিশ্রাম কেবল চলিতেই থাকিবে। সময়ে সময়ে কাজ করিবার কায়দায় পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর ঘটিতে পারে। তার জন্য যে বিশ্রাম, তাহা নাট্যমঞ্চের পটপরিবর্ত্তনের মত জানিও। মহদ্‌ব্রত লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলে কাজটী করা উচিত পরিকল্পনাধীন করিয়া। সেই পরিকল্পনা যত বাস্তবানুযায়ী হইবে, সাফল্যের মৌলিক সম্ভাবনা তত

স্বাভাবিক হইবে। বাস্তবের সহিত সম্পর্ক-বিরহিত পরিকল্পনা বারংবার পরিবর্ত্তনের দাবী রাখে এবং বারংবার পরিবর্ত্তনের মুখে পড়িয়া ভাঙ্গন-নদীর কূলের মত পরিকল্পনা শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অগাধ জলে ডুবিয়া মরে। রাজনৈতিক, সামাজিক বা আধ্যাত্মিক যে-কোনও কাজ ব্যাপক ভাবে করিতে হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিকল্পনা এবং নিখুঁত গণ-সংযোগ প্রয়োজন। পরিকল্পনা-কারীর বাস্তব-বুদ্ধি এবং কল্পনাকুশলতা উভয়ই সম-পরিমাণ থাকা আবশ্যক। কিন্তু গণ-সংযোগকারীর প্রয়োজন চরিত্রবল আর ঐকান্তিক একনিষ্ঠার। সে যদি চরিত্রবান্ হয়, দুর্নীতিপরায়ণ না হয়, মিথ্যার ক্রীতদাস না হয়, তাহার ভিতরে যদি সততা ও সাম্যবোধ থাকে, সে যদি সর্ব্বজনে প্রেমশীল এবং বিতণ্ডায় অরুচিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে গণসংযোগের সফল কর্ম্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে।"

ইতিহাসের ধিক্কার

দিনাজপুর জেলান্তর্গত ঠাকুরগাঁও-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আতঙ্ক, ত্রাস, উদ্বেগ, উৎপীড়ন, নির্য্যাতন, অবিচার, পক্ষপাতিত্ব, মাৎস্যন্যায় প্রভৃতির মধ্য দিয়া কোনও সুষমামণ্ডিত স্নিগ্ধ সভ্যতার বিকাশ ঘটিতে পারে না। এইজন্য সভ্যতার উৎকর্ষকামী মানব-মাত্রেই দেশে সুরাজ বা সংশাসন

কামনা করিয়াছেন। উদ্বেগ অস্থির-চিত্ততার সৃষ্টি করে, অবিচার, উৎপীড়ন, নির্য্যাতন প্রতিহিংসার সৃষ্টি করে, পক্ষপাতিত্ব, যোগ্যের প্রতি অবহেলা, দুর্ব্বল-দলন, পাপ-পথে পাদচারণা করিয়া জীবনযুদ্ধে বাঁচিবার জন্য প্রলোভন সৃষ্টি করে। সুতরাং যাহারা ঐ সকল অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহারা রাজাই হউক আর প্রজাই হউক, চিরকাল ইতিহাসের ধিক্কার সংগ্রহ করিয়াছে। আতঙ্ক-সৃষ্টির পথ নহে, প্রেম-সঞ্জননের পথই প্রকৃত পথ।"

অভ্যাসের দাসত্ব দূর কর

খুলনা জেলান্তর্গত চাঁপাফুল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অতীতের দুশ্চিন্তা ছাড়িয়া দাও। অতীতের পাপ তাহার প্রতিশোধ তোমার শরীরের প্রতি তন্তুর উপর দিয়া লইতেছে, তাহার উপর সে যদি আবার তোমার মনকেও পীড়িত করিতে থাকে, তবে ত' বড় সাংঘাতিক কথা হইল। পাপ বাপকেও ছাড়ে না,—ইহা জনপ্রবাদ। এই প্রবাদ সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। পাপ করিলে তাহার প্রতিফল পাইতেই হইবে। সুতরাং সাহস সহকারে তোমার প্রাপ্য শাস্তি তুমি গ্রহণ করিয়া যাও। অবশ্য, পাপের প্রায়শ্চিত্তও আছে। শারীরিক ক্লেশ, আর্থিক দণ্ড, সামাজিক প্রতিপত্তিহ্রাস এবং পরমায়ুর হ্রস্বতা, এই সকল প্রায়শ্চিত্ত। সবই সানন্দে স্বীকার

করিয়া নিয়া কেবল সঙ্কল্প করিতে থাক যে, এ পাপ জীবনে আর দ্বিতীয় বার করিবে না, তৃতীয়বারের কথা ত' দূরেই রহিল। অভ্যাসের দাস হইয়া মানুষ অনেক সময়ে এমন অমানুষ হয় যে, যে পাপ দ্বিতীয় বার করিবে না বলিয়া বারংবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সেই পাপ তৃতীয়বার, চতুর্থবার, পঞ্চমবারও করিয়া বসে। অভ্যাসের দাসত্বের ইহা বিষময় ফল। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তা পরিহার করিয়া জিদ করিয়া সর্ব্বাগ্রে লাগো সেই সকল অনুশীলনে, যাহা তোমাকে অভ্যাসের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিবে। জগতে অধিকাংশ মানুষই অতি সহজে আত্মসংশোধন করিতে পারিত, যদি তাহারা অভ্যাসের দাসত্ব স্বীকার না করিত, যদি তাহারা একই কুকাজ বারংবার করা হইতে বিরত থাকিতে পারিত। চেষ্টা করিলে যে তাহারা বিরত থাকিতে পারে না, তাহা নহে। চেষ্টার মত চেষ্টা করা চাই। চেষ্টা করিলে মানুষ সব কাজ করিতে পারে, মানুষের মত মানুষের কাছে অসাধ্য বলিয়া কোনও কাজ নাই। অভ্যাসের দাসত্ব পরিহার করিতে হইলে দুশ্চিন্তা তোমাকে কোনও সাহায্যই করিতে পারিবে না। সাহায্য করিবে সুদৃঢ় সঙ্কল্প, আত্মবিশ্বাস এবং নিজের আত্মসংশোধনের সাফল্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস। আশা ও বিশ্বাস তোমার দুই অবলম্বন হউক। অভ্যাসের দাসত্ব ছাড়িতেই হইবে এবং ছাড়িতে তুমি পারিবেও।"

রাত্রি ৯টা ২০মিনিটে শ্রীশ্রীবাবামণি রংপুর পৌঁছিলেন। ষ্টেশানে একদল সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জগৎকণ্ঠ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ডি, এন, মল্লিক, রায় বাহাদুর রাধারমণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি আছেন। কিন্তু সকলের চাইতে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর, যিনি ইহার পূর্ব্বের এক ট্রেণে দিনাজপুর হইতে আসিয়াছেন এবং ষ্টেশানেই শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সরোজিনী দেবী

অন্যান্যেরা শ্রীশ্রীবাবামণির সমীপস্থ হইবার আগেই সরোজিনী দেবী আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির পদপ্রান্তে পড়িলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—প্রভু, আমি স্বপ্নে দেখিয়া আসিয়াছি, আমাকে দীক্ষাদান করুন প্রভু।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উত্তরবঙ্গটা তা' হ'লে দেখতে পাচ্ছি স্বপ্নেরই দেশ। একদল লোক পাবনাতে দেখ্‌বে স্বপ্ন, আর একজন আবার দিনাজপুরে দেখ্‌বে স্বপ্ন।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী বলিলেন,—আমি দিনাজপুর শহরে যোগীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সেখানে শুনলাম আপনার বক্তৃতার প্রশংসা।

—আমার বক্তৃতার প্রশংসা? আমি ত' দিনাজপুরে কখনো বক্তৃতা দেই নাই?

—খবরের কাগজে আপনার উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতার রিপোর্ট তিনি দেখেছেন। কতকদিন ত' অমৃতবাজার পত্রিকায় আপনার নাকি প্রত্যেকটী বক্তৃতার রিপোর্ট উঠ্‌ত।

—তাই নাকি? আর তাই শুনে তুমি এসেছ?

—না বাবামণি, স্বপ্নে দেখেছি, আপনারই আশ্রয় আমাকে নিতে হবে। দীক্ষা দিন বাবামণি।

—শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—এই আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম, চিরদিন তুমি আমার সহায়তা পাবে, কিন্তু নূতন ক'রে দীক্ষার তোমার প্রয়োজন হবে না, যা' এতকাল ক'রে এসেছ, তাই ক'রে যাও।*

রংপুর
২৫শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৪১
(৯ই মার্চ্চ, ১৯৩৫)

রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে শ্রীশ্রীবাবামণি অবস্থান করিতেছেন। সদর রাস্তার উত্তর দিকে

* পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজসাহী, রংপুর, গাইবান্ধা ইত্যাদি স্থান ভ্রমণকালে এতজ্জাতীয় ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। ইহার পটভূমিকায় কোন বিজ্ঞান-সম্মত কারণ আছে কিনা, পরমেশ্বরই জানেন।

শরৎ বাবুর নিজস্ব বাড়ী এবং রাস্তার দক্ষিণ দিকে চমৎকার একটী গোলাপ-ফুলের বাগানের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীবাবামণির স্থিতিস্থান।

দীক্ষার সময় ও অসময়

শরৎ বাবুর কন্যাদ্বয় শ্রীমতী রত্নাবলী ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীমতী হিরন্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় সহ শরৎ বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নির্ম্মলা চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন।

উক্ত তিনজনের মধ্যে একজন বলিলেন,—বাবা, আমরাও দীক্ষা নেব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেন মা, দীক্ষা নিয়ে কি হবে?

রত্নাবলী বলিলেন,—আমরাও কাল স্বপ্ন দেখেছি যে, আপনার কাছে দীক্ষা পাচ্ছি। সবাই স্বপ্ন দেখেছি। এমন কি, বাবা পর্য্যন্ত।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন, —বুঝতে ত' পাচ্ছি না, ব্যাপারটা কি হ'ল। পাবনাতেও স্বপ্ন, দিনাজপুরেও স্বপ্ন, আবার রংপুরেও স্বপ্ন।—না মা, দীক্ষার সময় হয় নি। সময় হ'লেই দীক্ষা পাবে। তখন আর একা একা নয়, সবাই নেবে। আজ আর দীক্ষা হচ্ছে না।

প্রশ্ন হইল,—দীক্ষার কি সময় অসময় আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সব কাজেরই সময় অসময়

আছে। দীক্ষারও আছে। তবে কখনো অসময়েও দীক্ষা দিতে হয়। যেমন আমি অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুপথযাত্রীকে নির্ব্বিচারে দীক্ষা দিয়েছি, সে বেঁচে উঠে আবার দীক্ষার অবমাননাই করবে কিনা, তদ্বিষয়ে চিন্তামাত্রও করি নাই। তোমরা ত' মা এখন ভগবানের কৃপায় সবাই সুস্থ শরীরেই আছ, বাঁচবেও অনেক দিন। দীক্ষা ভেবে চিন্তেই নেবে।

শ্রীমতী হিরন্ময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি ত' শুধু মাথায় একটু হাত দিয়ে দিলেই দীক্ষা হ'য়ে যায়।

—তাই নাকি?

—হাঁ, তাই ত' শুন্‌লাম। কাল রংপুর রেলষ্টেশানে দিনাজপুরের মহিলাটীকে শুধু মস্তকে হস্তার্পণ করতেই তাঁর দীক্ষা হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—ওটা পাত্র-বিশেষে হয়। পাত্র-বিশেষে শুধু একখানা শাদা কাগজে দীক্ষা-মন্ত্রটী লিখে পাঠিয়ে দিলেও দীক্ষা হয়। কিন্তু ওগুলি সাধারণ ব্যাপার নয়। মোট কথা, সময় এলেই সব হয়। তোমরাও প্রতীক্ষা কর মা, আমি ত' জান্‌তেই পাচ্ছি যে, তোমরা শেষ পর্য্যন্ত আমার কাছেই আস্‌বে। তবে আর তাড়াহুড়া কেন?

প্রতীক্ষার গুণ

শ্রীমতী রত্নাবলী বলিলেন,—না বাবামণি, এবারই আমাদের দীক্ষা দিয়ে যান। এমন প্রবল আগ্রহ আমরা অনুভব কচ্ছি যে, বল্‌বার নয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না মা, এবার দীক্ষা হবে না। তোমার ভাইটী রুগ্ন, দেখে যেতে এলাম। আবার যখন আস্‌ব,—শীঘ্রই আস্‌ব—তখন বক্তৃতা দিয়ে সহর মাৎ কর্ব্ব। দীক্ষাদানের জন্য আমি দেশের পর দেশ ঘুরে বেড়াই না মা। আমি ঘুরে বেড়াই বহির্ম্মুখ মনগুলিকে অন্তর্ম্মুখ করার জন্য। সকলে সংকথা শুনুক। সচ্চিন্তা করুক। তবেই সৎকর্ম্মে তাদের মন আস্‌বে। ঘুমন্ত দেশবাসীকে জাগানোই আমার কাজ, গুরু হওয়ার অভিলাষ আমার নেই।

শ্রীমতী হিরন্ময়ী বলিলেন,—আমি আমার স্বামী জীবিত থাক্‌তেই এক জনের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলাম কিন্তু কাল রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে আমি জান্‌তে পেরেছি, সেই দীক্ষাদাতা আমার গুরু নন, উপদেষ্টা মাত্র। আমি জেনেছি, আপনিই আমার গুরু, ইহকালের গুরু, পরকালের গুরু, অনন্ত কালের গুরু।

শ্রীশ্রীবাবামণি প্রসন্ন হাস্যে গৃহ মুখরিত করিয়া বলিলেন,—বেশ ত'! তাতে আপত্তিটা কোথায়? তবে দীক্ষা এখন হবে না, পরে হবে, প্রতীক্ষা কর মা। প্রতীক্ষার অনেক গুণ আছে মা, প্রতীক্ষার অনেক গুণ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে যে দীক্ষা, তাতে অতি সহজে মন ভরে, প্রাণ ভরে, জীবনকুম্ভ যেন অমৃত-রসে কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়।

প্রার্থনা ও নামজপ

সারাদিন জনতার কিছু ভিড় ছিল।

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত ভগবানের কাজে দেবে, এই লক্ষ্যে স্থির থাক। যাতে কদাচ তোমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে না হয়, তার জন্য বারংবার পরমেশ্বরের চরণেই কেবল প্রার্থনা কত্তে থাক। বিশ্বাস কর যে, প্রার্থনার শক্তি অসীম আর প্রার্থনা ক'রে ক'রে প্রার্থনার শক্তিকে প্রত্যক্ষ ক'রে ধন্য হও। যার প্রার্থনায় রুচি নেই, সে কেবল পরমেশ্বরের নাম অবিরাম জপতে থাকুক। নামজপেও প্রার্থনার কাজ হয় কিন্তু প্রার্থনায় নামজপের কাজ পূরাপূরি হয় না। কারণ, প্রার্থনা করি ত' আমার অভাবটুকু জেনে, নাম-জপ জানা-অজানা সব অপূর্ণতা দূর ক'রে দেয়। এই হিসাবে একনিষ্ঠ নামজপ প্রার্থনার চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

প্রবীণদের স্থানে দাঁড়াও

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৃদ্ধেরা খেটে খেটে ম'রে যাবেন আর তোমরা যুবকেরা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে, এটা সঙ্গতও নয়, শোভনও নয়। এমনকি, এটা কল্যাণকরও নয়। প্রবীণেরা একদিন তোমাদের মতন নবীন ছিলেন। তৎকালীন প্রবীণদের কাজ তাঁরা উদাসীন

দৃষ্টিতে দেখেন নি, তাঁরা প্রবীণদের কাজে নানা ভাবে সহায়তা দিয়ে দিয়ে নিজেদের নবীনত্ব ঘুচিয়েছেন এবং কাল-সহকারে প্রবীণ হয়েছেন। প্রবীণদের সঙ্গে তোমাদের খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে অল্প-বিস্তর মতভেদ থাক্‌তে পারে কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক যে সহযোগিতার, একথা ভুলে যেও না। একদিন এই প্রবীণদের নশ্বর দেহ থাক্‌বে না। এখনি যদি তোমরা তাঁদের হাতে হাত না মিলাও, তাহ'লে ঠিক সময় মত তোমাদের কাজে তাল রাখ্‌বে কি ক'রে বা সময় এলে কর্ত্তব্যের টালই বা সামলাবে কি ক'রে?

অপরের ধর্ম্মকার্য্য দর্শন কালে

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— খ্রীষ্টান বা মুসলমানেরা যখন কোনো প্রকার ধর্ম্মকার্য্য করবেন আর সেই দৃশ্য যখন তোমাদের চোখে পড়্‌বে, তখন তোমরা কি কর্‌বে, এই প্রশ্নই ত' অনাবশ্যক। তাঁরা যেমন ঐ সময়ে মনটীকে ঈশ্বরানুগত কচ্ছেন, তুমিও তখন তোমার মনটীকে ঈশ্বরানুগত কর্ব্বার চেষ্টায় লেগে যাবে। তবে, চেষ্টাটি কর্ব্বে তোমার স্বকীয় ধর্ম্মের নিয়মানুসারে। তাঁরা যখন যীশু বা আল্লার ভজনা কর্ব্বেন, তখন তুমি মনে মনে নিজের ইষ্টনাম স্মরণ কত্তে থাক্‌বে।

সহযোগী পাইবার উপায়

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— কাজ কত্তে কত্তেই সহযোগীদের পেয়ে যাবে। কাজ করবে না, কেবল ভাব্‌বে বা বক্‌বে, এতে সহযোগী মিলে না। দৃষ্টান্তের প্রভাবই প্রকৃত প্রভাব। তুমি নিজে কাজে নেমে গেছ দেখ্‌লে তবেই অপরে কাজে নামতে অন্তরে আগ্রহ অনুভব কর্ব্বে। তার আগে নয়। সহকর্ম্মী সংগ্রহের জন্য আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা আমি অস্বীকার কচ্ছি না, এমন কি সময়-বিশেষে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ারও আবশ্যকতা ঘটতে পারে কিন্তু আসল সর্ত্ত হচ্ছে নিজেকে নিঃশেষে কাজে লাগিয়ে দেওয়া, অন্য লোকেরা তোমার সহকর্ম্মী হ'য়ে যাতে অবলীলাক্রমে কঠিন কাজকেও অতি সহজ কাজের মত দ্রুত গতিতে ক'রে যেতে পারে, তার জন্য কর্ম্মপথ সুগম ক'রে রাখার প্রয়োজনও কম নয়। যেখানে পরিস্থিতি প্রতিকূল, সেখানে পরিস্থিতিকে অনুকূল ক'রে রাখার চেষ্টাও দরকার, নইলে সহকর্ম্মীরা আজ একদল আসবে, কালই তারা পালাবে, কাল একদল আসবে, পরশু তারা পালাবে। আমার পুপুন্‌কী আশ্রমের অবস্থাই ভেবে দেখ। পরিস্থিতি এখানে এত প্রতিকূল যে, কর্ম্মীরা এসে চারিদিকের শত অসুবিধা আর আশঙ্কার মধ্যে কাজ কত্তে ত' দূরের কথা, অবস্থান কত্তেই মনে তেমন জোর পায় না। আমি ত' কারুণ্য-বর্জ্জিত কঠিন কঙ্করে

ডালকুত্তার দাঁত বসিয়ে লেগে গেছি, দেখ্ব ব'লে যে, কষ্টের আর ধৈর্য্যের, ক্লেশের আর ক্লান্তির শেষ কোথায়। কিন্তু সবাই কি কখনো সমান দৃঢ় হ'তে পারে? তারই জন্য সহকর্ম্মীদের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রকে অনুকূল করার জন্যও শ্রম কত্তে হয়। তোমরা যেখানে যে-কেউ যে-কোনো কাজে হাত দাও, সব সময়ে খেয়াল রেখো যে, সহকর্ম্মীরা যেন অল্প ক্লেশে অধিক কাজ কত্তে পারেন, তার জন্য আনুকূল্য সৃষ্টি করার চেষ্টাও তোমাদের অন্যতম এক প্রধান কর্ত্তব্য হবে।

রংপুর

২৬শে ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৪১

(১০ই মার্চ্চ, ১৯৩৫)

কিছু দর্শনার্থী শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শনে আসিয়াছেন।

পুপুন্‌কীর কর্ম্মধারা

একজন প্রশ্ন করিলেন,—পুপুন্‌কী আশ্রমে আপনার কর্ম্ম-তালিকাটী কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লোকগুলি খেতেও জানে না, কৃষিও জানে না। তাই, আশ্রমে নিত্য নূতন শাক-শব্জী উৎপাদন করে গ্রামে গ্রামে তা' বিতরণ করি আর ঐ ঐ জিনিষ উৎপাদনে যাতে তাদের রুচি আসে, তার জন্য প্রতি বৎসর কল্‌কাতা থেকে মণে মণে বীজ কিনে এনে পাড়ায়

পাড়ায় সেরে সেরে কেবল বিনামূল্যে বিতরণ করি। এই হ'ল এক রকমের কাজ। অন্য কাজ হ'ল, প্রতি সপ্তাহের ছয়টী প্রাতঃকালে ছয়টী আলাদা আলাদা গ্রামে ছুটে যাই, দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করি, কার কি অসুখ বল, ঔষধ দেব। যেমন যেমন অবস্থা বলে, তেমন তেমন ব্যবস্থাপত্র লিখে দেই এবং কাগজ-খানা হাতে নিয়ে যে-কেউ আশ্রমে গেলে তাকে নিজের হাতে তৈরী করা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ দান করি। বিনিময়? না, বিনিময়ে কিছু পাই না বা চাইও না। সেবার বিনিময় চাইতে যাওয়া সেবকের পক্ষে দোষাবহ। আর, ঐ দেশের লোক এত অশিক্ষিত এবং অজ্ঞান যে, উপকার পেলে তার বিনিময়ে কিছু দিতে হবে, একথা ওরা জানে না। এই বিষয়ে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি উদ্দীপিত করা ত' আমার পক্ষে শোভন নয়, আর আমি তা' কত্তে আগ্রহীও নই। আমি যে অভিক্ষু, আমি যে অযাচক। আমাকে কিছু দেবার জন্য উপদেশ দিতে বা ইঙ্গিত কত্তে আমি কদাচ পারি না। সন্ধ্যার পরে আগে যেতাম এক এক দিন এক এক গ্রামে ধর্ম্মকথা শুনাতে। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ আমার বিশেষ সন্দেহ হয়েছে যে, আমার প্রাণ-নাশের জন্য একটা কি যেন ব্যবস্থা হয়েছে। এজন্য এখন গ্রামবাসীরা সন্ধ্যার পরে আর আমার কণ্ঠে ধর্ম্মকথা শুন্‌তে পায় না, রাত্রে আমি আশ্রমেই থাকি। আগে ত' গ্রামে গ্রামে গিয়ে রাত-দুপুর পর্য্যন্ত রাস্তার পাথর

ভেঙ্গে সমতল কর্ব্বার সাধনাও ক'রে এসেছি এবং কমপক্ষে তিন চারটা গ্রামের রাস্তা গ্রামবাসীদের শারীরিক শ্রমের সহায়তাতেই সুসংস্কৃত হয়েছে। পাথরের দেশ, কাঁকুরে মাটি, দারুণ শক্ত জমি,—অসাধারণ জেদ ছাড়া এসব কাজ করা যায় না। জেদ ক'রেই সব কচ্ছি বা করেছি। এই হচ্ছে আমার পুপুন্‌কীর কর্ম্মধারা।

পুপুন্‌কীর বাহিরে কর্ম্মধারা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আর, বাইরের কর্ম্মধারা? এই যে আজ সিলেট, কাল শিলচর, পরশু যশোর, তরশু রংপুর ছুটে বেড়াচ্ছি সেও ত' রুগ্নকে নিরাময় দেবার জন্য। কার কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছি? কাকে চাঁদা দেবার জন্য ধরাধরি কচ্ছি? আমার আসল কাজ সৎকথা শুনানো। সেই সুযোগটী যেখানে পাচ্ছি, পথক্লেশকে গ্রাহ্যমাত্রও না ক'রে সেখানে ছুটে যাচ্ছি। আর বল্‌ছি কোন্ কথা? জাগো, হে নিদ্রিত, জাগো, সুপ্তি পরিহার কর, উদ্যত হস্তে বজ্রধারণ কর, বৃত্রাসুর নিধন কর, মানবজাতির অগণিত দুঃখপুঞ্জ দূর কর। কত যে মানুষ দীক্ষা নিবার জন্য ছুটে আসে, কিন্তু দীক্ষাদানে আমার আগ্রহ নেই। জগৎকল্যাণ-কর্ম্মে মানুষের সঙ্কল্প দৃঢ় হোক্, এর চেয়ে বড় কামনা আমার কিছুই নেই। পুপুন্‌কীর কর্ম্মধারাও আমার যা, বাইরের কর্ম্মধারাও আমার তাই। পুপুন্‌কীতেও নিজের অভাবের কথা কাউকে বলি না, বাইরে

এসেও আশ্রমের অভাবের কথা কাউকে জানাতে চেষ্টা করি না। আমি এসেছি দিতে, নিতে নয়। পেতে আমি চাই না, দিতেই আমার আনন্দ, দিতেই আমার তৃপ্তি। এইটাই আমার কর্ম্মধারা।

রাজশাহী

২৮শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৪১

(১২ই মার্চ্চ, ১৯৩৫ইং)

সহরের এক উপকণ্ঠে একজন যুবক-সাধু একটী আশ্রম খুলিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি রাজশাহী আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি চরণদর্শনে আসিলেন এবং প্রণামান্তে নিজের মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বনাম স্বাবলম্বন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আশ্রমাদি স্থাপনের দ্বারা জনহিত সাধনের চেষ্টা এবং আত্মশুদ্ধির অনুশীলন খুবই আনন্দজনক, লাভজনক ও সমর্থনযোগ্য। কিন্তু আশ্রম স্থাপনের মানে যদি হয়ে দাঁড়ায় গৃহস্থের গলগ্রহ হওয়া, তবে বড় বিপদ। প্রথম বিপদ নৈতিক। যার গলগ্রহ হয়েছ, প্রতি পদে তার আদেশ, নির্দ্দেশ, ইঙ্গিত পালন না ক'রে পার্ব্বে না। তার বা তাদের কথা তুমি না শুন্‌লে সে বা তারা হবে

মনঃক্ষুণ্ণ এবং সহানুভূতিহীন। এতে মনের সাহস, উৎসাহ, আনন্দ ও একতানতা নষ্ট হবে। দ্বিতীয় বিপদ আর্থিক। গৃহস্থেরা যে তোমাকে তোমার আশ্রম-পরিচালনার জন্য অর্থ বা বস্তু উপহার দেবে, তা' তাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ থেকে কষ্ট ক'রে বাঁচিয়ে তবে দিতে হবে। এখন দেশের অবস্থা যেমন স্বচ্ছল আছে ব'লে মনে হচ্ছে, দশ বিশ, পঁচিশ বা পঞ্চাশ বৎসর পরে নিশ্চয়ই সে অবস্থা থাক্‌বে না। আজকে যারা বিশেষ ক্লেশ বিবেচনা না ক'রে তোমাকে আশ্রম চালাবার জন্য যথেষ্ট অর্থ বা বস্তু সরবরাহ ক'রে যাবে, কাল তারা এমন এক আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন নিশ্চয়ই হবে, যাতে এর দশ ভাগের এক ভাগ ত্যাগ স্বীকার কত্তে হ'লেও এক প্রাণান্তকর ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে। তার প্রধান কারণ শাসক-জাতির শতবর্ষব্যাপী শোষণ। অপর কারণ দেশবাসীর শ্রমে কুণ্ঠা, আলস্যে আদর, শিল্পকর্ম্মে মনোযোগের অভাব এবং ভবিষ্যদ্-দৃষ্টির অস্পষ্টতা। আর একটী কারণ হচ্ছে সততার ও সচ্চরিত্রতার অভাব। অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে দেশের মানুষের উপরে কি কি দুর্ভোগ ও দুর্দ্দৈব আসতে পারে, এখনি অনুমান ক'রে তা' বলা কঠিন। কিন্তু ছোট হউক, বড় হউক, যে-কোনো সৎপ্রতিষ্ঠানই দেশে গ'ড়ে উঠুক না কেন, তাকে অদূর এবং সুদূর উভয়বিধ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কাজ ক'রে যেতে হবে। তারই জন্য প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই স্বাবলম্বন-ভিত্তিক হবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

কর্ত্তব্যের পথে

যুবক-সাধুটী কথাবার্ত্তায় খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং আরও কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে-কোনো প্রতিষ্ঠানই গড়্‌তে যাও না কেন, ভাবের দিক্ দিয়ে তোমাকে হতে হবে খাঁটি এবং সমভাবের ভাবুকদের একত্র জড় করা হবে প্রয়োজন। আশ্রমটীর চারপাশে কর্ম্মিনামধারী বা পৃষ্ঠপোষকরূপী অনেক অনেক লোকই এসে জড় হ'লেন কিন্তু তাঁদের কারো কারো ভাবের ঘরে হয়ত দস্তুরমত ফাঁকি থেকে গেল। জান্‌বে, এটি একটী বিপজ্জনক অবস্থা। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে কর্ত্তৃত্ব নিয়ে, নেতৃত্ব নিয়ে, টাকা কড়ি আদান-প্রদান নিয়ে, উৎসবের বা সভা-সমিতির কর্ম্মতালিকা নিয়ে, পরিশেষে ব্রহ্মচারীদের কাপড়-জামা-কৌপীন নিয়ে পর্য্যন্ত রাম-রাবণের যুদ্ধ বেঁধে যাবে। অনেক সহায়কের তোমার প্রয়োজন নেই, এমন দুই চার জন সহায়ক থাক্‌লেই যথেষ্ট জান্‌বে। খুব বেশী বুদ্ধি-পরামর্শের যখন দরকার হবে, তুমুল তর্ক আর বাক্যের ঝড় ছাড়া যখন সব কাজ প্রায় অচল, জান্‌বে, প্রতিষ্ঠানের নাভিশ্বাস সুরু হয়েছে। যার যেটুকু প্রাপ্য সম্মান, সেটুকু তাকে দিও কিন্তু নিজে সম্মানের জন্য লোলুপ হ'য়ে নিজের মূল্য কমিয়ে দিও না। কর্ত্তব্যের প্রয়োজনে কারো সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসৌহৃদ্য বা অসৌজন্য ঘটে গেলে, দমেও

যেও না, অসৌহৃদ্যের জেরও টেনো না। যত দ্রুত সম্ভব এবং প্রথম সুযোগেই তাদের সঙ্গে প্রীতিবদ্ধ ও অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা কর্ব্বে। কোনো সত্যিকারের আদর্শকে বিসর্জ্জন দিয়ে এই প্রীতির চর্চ্চা ক'রো না। কারো সঙ্গে শত্রুতা কোনও অবস্থাতেই রাখবে না ব'লেই এই সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা চল্‌বে। যারা জনসেবক, তারা জনশ্রদ্ধা পায় কিন্তু জনশ্রদ্ধা বা জনসম্মান পেতে হ'লে নিজেকে যোগ্যও হতে হয়। অন্তরের বিনয় ও সম্প্রীতি-কোমলতা সেই যোগ্যতার চাবিকাঠি। তুমি সাধু-সন্ন্যাসী লোক ব'লেই যে সদাচারী ও সদবুদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্থ লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, মনে কদাচ এইরূপ অহঙ্কারকে তিল মাত্র স্থানও দেবে না। সহিষ্ণুতা সহকারে লোকের রুষ্ট ব্যবহার সাধ্য মত সহ্য ক'রে নেবে, কিন্তু তুমি যাদিগকে রুষ্ট বচনে ক্লিষ্ট করেছ, তাদিগকে স্নেহভাষণে তুষ্ট কত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে কোনো মনোবিবাদ বা কলহের সূচনা করলে তুমি কদাচ তাতে মাথা গলাবে না বা ইন্ধন যোগাবে না। নিজেকে কদাচ স্থানীয় লোকের কলহ-বিবাদের সঙ্গে জড়িয়ে দেবে না, প্রাণপণ যত্নে এসব থেকে দূরে সরে থাক্‌বে। অন্তরে বিনয় না থাকলে চখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়, দূরদৃষ্টিও কমে, বুদ্ধিশুদ্ধিও ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। নিজেকে জনসমাজের তুচ্ছ ও নগন্য এক সেবক জ্ঞান ক'রে নিরহঙ্কার-

চিত্তে নিজ ব্রত নিজের চরিত্রের বলে উদ্‌যাপন কর। নিরপেক্ষ ও সরল অন্তঃকরণে জীবনের পথ চল। তোমার কর্ত্তব্যের পথ শাদা, সুন্দর ও সরল।

নারীর প্রতি যতির দৃষ্টি

স্ত্রীলোকের সম্পর্কে কি কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে যুবক-সাধুটী কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীরা নরকের দ্বার ব'লে নয়, পরন্তু তোমাকে সর্ব্বপ্রকার লোকাপবাদ-সম্ভাবনার উর্দ্ধে থাক্‌তে হবে ব'লেই তোমাকে কতকগুলি নিয়ম তাদের সম্পর্কে পালন কত্তে হবে। "আমি যদি ভাল থাকি, তবে লোকের অপবাদে কি আসে যায়",—এইরূপ উক্তি ক'রে এসব নিয়মকে তিন তুড়ীতে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা অশুভসূচক। ইন্দ্রিয়-বৃত্তির ব্যাপারে বহ্বাস্ফোটন বা বাহাদুরী কারো পক্ষেই ভাল নয়। এই ব্যাপারে এক এক দেশে এক এক যুগে এক এক প্রকারের সংযম-বিধি প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। তাদের প্রকার ও প্রকরণ যতই পৃথক্ হোক, উদ্দেশ্য ছিল সৎ। এই বিষয়ে সাধনশীল মহাজনেরা যে যে উপদেশ দিয়ে এসেছেন, তার প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব রেখো। কথা-সাহিত্যিকেরা যে সকল ভাব ও ধারণার তরঙ্গাভিঘাতে দেশকে প্লাবিত ক'রে দিতে চাচ্ছেন, তার অনুবর্ত্তনে সুখও নেই, শান্তিও নেই। নারী সম্পর্কে

যতির হৃদয়, মন, দৃষ্টি থাক্‌বে সব সময়ে উদাসীন, নির্লালস, অনাসক্ত, ও নিরপেক্ষ।

পুরুষের প্রতি নারী-যতির দৃষ্টি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীদের মধ্যে যাঁরা যতিধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁদেরও আচরণ এবং মনোভাব এরূপই হওয়া প্রয়োজন।

ইহার পরে একদল যুবকও আসিল। যুবকদের ভিতরে অকারণ চঞ্চলতা লক্ষ্য করা যাইতেছিল।

সাধুসঙ্গ ও সাধুমন

যুবকেরা বলিতেছিল, অমুকের আর তমুকেরও সাধুদর্শনে আসিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু একজন সহকর্মীর বিবাহ বশতঃ তাহারা সাধু-সঙ্গ লাভের জন্য আর আসে নাই। —বলিয়াই যুবকগণ মুচকি হাসিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা ত' আচ্ছা সাধুসঙ্গ কত্তে এসেছ। মনটা তোমাদের পড়ে আছে বিয়ে বাড়ীতে এবং বিবাহ-ব্যাপারটাকে ভাবছ তোমরা এক হাসিঠাট্টার বিষয় ব'লে আর লঘুদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছ। সাধুসঙ্গের সুফল তোমরা পাবে কি ক'রে? সাধুসঙ্গ কত্তে হ'লে সাধুমন নিয়ে সব কিছু দেখ্‌তে হয়। অনেকেই ত' হামেশাই

সাধুসঙ্গ ক'রে যাচ্ছে কিন্তু কি মনের দিক্ দিয়ে, কি ভাবের দিক্ দিয়ে বিন্দুমাত্রও উন্নতি লাভ কচ্ছে না। তার আসল কারণটা হচ্ছে এই। চোখ, নাক, কাণের অনুভূতিগুলি সহ মনটা বাস করবে দূরবর্ত্তী আর এক স্থানে, এমন হ'লে ত' আর সাধুসঙ্গের সুফল লাভ হয় না বাবা।

বিবাহের প্রকৃত তাৎপর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আর একটী কথা। বিবাহ ব্যাপারটাকে লঘু দৃষ্টিতে দেখার মধ্যে কি সার্থকতা আছে? একটা কুকুর একটা কুক্কুরীর সাথে প্রণয়াবদ্ধ হ'ল বা একটা বৃষ একটা গাভীর সঙ্গে মিলিত হ'ল, মানুষের বিবাহ ঠিক ততটুকু তাৎপর্য্যই বহন করে না। এর মানে অনেক ব্যাপক। মানব-মানবীর বিবাহ-মিলনে সাধারণ মানুষের জাতি এক অসাধারণ মানুষ-জাতিতে পরিণত হবার প্রগতি-পথে কেবলি এগিয়ে যাবে, বিবাহের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই।

বিবাহ ও বিবর্ত্তন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের দেশে হর-পার্ব্বতী আদর্শ দম্পতী। তাঁদের জীবনে ভোগের চেয়ে ত্যাগ অনেক বড় এবং তাঁদের আচরণে লালসা অপেক্ষা সংযমের মূল্য অনেক বেশী। তাই, তারা লক্ষ্মী আর সরস্বতীর মত কন্যার

পিতামাতা, তাই তাঁরা কার্ত্তিক-গণেশের ন্যায় পুত্রের জনক-জননী। শিবে বা পার্ব্বতীতে যেই সম্পদ, যেই বিদ্যা, যেই বীর্য্য ও যেই বুদ্ধি অপ্রকট ভাবে প্রচুর বিদ্যমান, তারই এক একটা ঐ এক একটা কন্যা বা পুত্রের মধ্য দিয়ে সুপ্রকট হ'য়ে অভিব্যক্ত হয়ে পড়েছে। এরই নাম বিবর্ত্তন। যা' স্বল্প ছিল, পুরুষানুক্রমে নবপ্রজন্মে তা' প্রচুর হ'ল, যা' অপ্রকট ছিল পুরুষানুক্রমে নবপ্রজন্মে তা' প্রকট হ'ল, যা' প্রচ্ছন্ন ছিল, তা' প্রকাশ পেল, যা' সংক্ষিপ্ত ভাবে লুক্কায়িত ছিল, তা' বিস্তারিত ভাবে প্রসারিত হ'ল। এরই নাম বিবর্ত্তন। ভারতীয় বিবাহে এই বিবর্ত্তনই আসল কথা। ইন্দ্রিয়-সুখের অধিকার এখানে গৌণ, লালসা-পরিতৃপ্তির বন্ধন-রজ্জুখণ্ড এখানে নিতান্তই সীমিত।

নারী ভারতের দৃষ্টিতে মা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই জন্যই এদেশে নারীকে ভোগ্যবস্তু জ্ঞান ক'রে তার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর্ত্তে ভদ্র ব্যক্তি মনে মনে লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়। নারী এদেশে মা,—কার্ত্তিকেয়ের মা, গণনায়কের মা, লক্ষ্মীদেবীর মা, সরস্বতীর মা, রামচন্দ্রের মা, কৃষ্ণচন্দ্রের মা, গৌরাঙ্গের মা, বুদ্ধদেবের মা, রামপ্রসাদের মা, রামকৃষ্ণের মা, আমার মা, তোমার মা, সবার মা। নারীকে মা ব'লে ভাবাই হচ্ছে নারীকে তার প্রকৃত সম্মান দান। নারীকে নিয়ে প্রগল্‌ভ চিন্তা ইতর লোকেই

সাজে,—নিজেকে ভারতীয় ঐতিহ্যের অধিকারী ব'লে যারা জ্ঞান কর্ব্বে, তাঁদের পক্ষে সাজে না।

কলিকাতা
২৯শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৪১
(১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩৫)

শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাতে ৪টা ৫৫মিনিটে কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন।

সংসার ও আশ্রম

একটী যুবক আশ্রমবাসী হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে অনেক বিষয় নিবেদন করিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আশ্রমে ত' যেতে চাও, কিন্তু সেটাও ত' একটা সংসার। সেখানে ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। চাই অন্ন, চাই শয্যা। মশার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য রাত্রে চাই মশারি। শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য চাই কম্বল কিম্বা লেপ। রান্না করার জন্য চাই হাঁড়ি, চাউল, ডাইল, তৈল, মশলা ইত্যাদি। বাটনা বাটবার জন্য চাই শিলনোড়া। ঘর ঝাড় দেবার জন্য চাই ঝাঁটা, নইলে আশ্রম ত' একটা আস্তাকুড়ে পরিণত হবে। বল, এত জিনিষ যেখানে নিত্যই চাই, সেটা কি একটা সংসার নয়? খুব বড় ক'রে "আশ্রম" কথাটী লিখিয়ে বিরাট

সাইন-বোর্ড টানিয়ে দিলেই ত' আর আশ্রম হয় না। মানুষের পেটটা যেখানে গিয়েছে, সেখানেই সংসারও গিয়েছে। সুতরাং আশ্রমে গিয়ে আর লাভ কি? আশ্রমে গিয়ে যা' যা' কত্তে চাও, সংসারে বসে সবাই তা' তা' কত্তে চেষ্টা কর। দেখবে, সংসারটাই একটী আশ্রমের সুষমা নিয়ে ক্রমশঃ যেন ফুটনোন্মুখ ফুলের মত দিনের পর দিন হাস্যমুখরিত আননে কেবল ফুটতেই থাক্‌বে।

নরককে স্বর্গে পরিণত কর

যুবকটী বলিলেন,—এমন সংসার দুর্লভ।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, দুর্লভ ব'লেই ত' এর প্রয়োজন এত বেশী। আর, এরূপ সংসারের সংখ্যা অতি অল্প ব'লেই ত' সংসারটা তোমাদের নিকট এক মারাত্মক আতঙ্কজনক স্থান হয়েছে। যাতে সংসারের এই মারাত্মকতা, এই আতঙ্ককরতা দূর হ'য়ে গিয়ে স্নিগ্ধতা ও মধুময়তা বাড়তে পারে, তার জন্যই ত' শত শত গৃহী যুবকের এই পণ নিয়ে কাজ করা উচিত যে, তারা পঙ্কিল ধরণীর নরক-নিবাসগুলিকে পুতিগন্ধমুক্ত ক'রে স্বর্গধামে পরিণত কর্বে। সংসারাশ্রম ত্যাগ নয়, চাই সংসারাশ্রমকে উন্নয়িত করা, চাই সংসারাশ্রমকে অভ্যুন্নত করা, চাই সংসারকে সং-মুক্ত ক'রে সার-যুক্ত করা। এজন্যই তোমাদের মত যুবকদের আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন, সংসার থেকে পলায়ন তোমাদের সাজে না।

পুপুন্‌কী আশ্রমে কৃচ্ছ্র

আরও কয়েকটী যুবক কথাবার্ত্তায় যোগদান করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার আশ্রমে যাবে ত' দিনের পর দিন উপবাসে আর অর্দ্ধাশনে কাটিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ভগ্নস্বাস্থ্য হ'য়ে ঘরে ফিরবে। তখন তোমাদের পিতামাতারা আমার কৃপণতা আর নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে আমাকে দেবেন গালি আর তোমাদের বুদ্ধির কর্বেন নিন্দা। এই দারিদ্র্যে গিয়ে লাভ কি?

একজন প্রশ্ন করিল,—আপনার আশ্রম কি ক'রে চলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এবার পথে এস। আশ্রম চলে স্বাবলম্বনে, চলে পরিশ্রমের বলে। আমি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াই, বক্তৃতা দেই আর বই বেচি। চালের দামটা এভাবে পাঠাই। আর আশ্রমের ছেলেরা মাটি খুঁড়ে গাছ লাগিয়ে তরি-তরকারী উৎপাদন করে। প্রথম কয়েক বৎসর ত' কোথাও একটা কূয়াও ছিল না। এখন একটা ইন্দারা হয়েছে, তাই থেকে হয় কৃষির জলসিঞ্চন। স্বল্প জল, ক্ষীণ উৎপাদন, তাই সংক্ষিপ্ত আহার। অনেক খেটে ধানের ক্ষেত খান দুই হয়েছে কিন্তু চারিদিকের গ্রামগুলির হাজার হাজার গরুর উৎপাতে একটী গাছেও ফল ধরে না, ধানের শিস আসবার আগেই ধান গাছগুলি শিকড় শুদ্ধ চলে যায় গরুর পেটে। এ এক বিচিত্র পরিস্থিতি। কত যুবক কত ত্যাগের প্রেরণা নিয়ে ছুটে আসে এই আশ্রমে কর্ম্মী হতে, কিন্তু উদরের নির্ম্মম ক্ষুধা

এদের কয়েক মাসের মধ্যেই দূরে সরিয়ে দেয়। এমন আশ্রমে গিয়ে বাবা তোমরা থাক্‌তে পারবে না। শুধু যাওয়া আর আসার শ্রমই সার হবে।

ভিক্ষা ও অভিক্ষা

একজন প্রশ্ন করিল,—চতুর্দ্দিকের গ্রামবাসীদের কাছে আশ্রমের জন্য সাহায্য চাইতে পারেন না?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—ভাল কথাই বলেছ। ওরা যে গরীব। ওরা নিজেরাই ত' খেতে পায় না, বছরে তিন মাস শুধু মহুয়া ফুল খেয়ে দিন কাটায়। আর আমি যে অযাচক। আমি চাইতে যাব কেন? না-চাওয়াই যে আমার নিয়ম, অভিক্ষাই যে আমার ব্রত।

প্রশ্ন হইল,—অন্য দশটা আশ্রম যে জনসাধারণের কাছ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে চলে, এতে কি কোনো দোষ আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয়ই না। কেউ যদি সৎকাজে সাহায্য পাবার জন্য অর্থ বা বস্তু ভিক্ষা করেন, নিশ্চয়ই কত্তে পারেন। কেউ যদি নিজের কর্ম্মতালিকাকে দাতার দানের অধীন ক'রে নিতে চান, নিশ্চয়ই তাঁর সেই অধিকার আছে। তাঁর কাজটী মন্দ, এমন কথা আমি বল্‌ব কেন? আমি ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছি ব'লে অন্যের কাজে দোষানুসন্ধান কর্ব্ব কেন? আমি অভিক্ষাকেই সার-সর্ব্বস্ব

ব'লে গ্রহণ কর্ল্লাম কেন, এই প্রশ্ন তুমি আমাকে অবশ্যই কত্তে পার। একদা ব্রাহ্মণ ভিক্ষা কত্তেন, কারণ তাঁর জীবন তিনি জগতের মঙ্গলে উৎসর্গ ক'রে ভিক্ষা চাইবার অধিকার অর্জ্জন করেছিলেন। নিজের সাধন জীবনের সমগ্র শুভফল বিশ্বজনের কুশলের জন্য সমর্পণ করাই যাঁর জীবনের ব্রত, তুচ্ছ তনু-ধারণের জন্য তিনি ভিক্ষান্ন গ্রহণ কর্ল্লে তাতে দোষ ধরার যুক্তি নেই। জনকল্যাণমূলক বৃহৎ কর্ম্মে দশ জনের কাছ থেকে হবিঃ সংগ্রহ না কর্ল্লে যজ্ঞ সম্পাদন সুদুর্ল্লভ ব'লে এক্ষেত্রেও ভিক্ষাকে গ্রহণীয়ই বল্‌তে হবে। কিন্তু আজ তোমার দেশটার সব চেয়ে বড় শত্রু কে, একবার ভেবে দেখ দেখি? তোমার আলস্য তোমাকে ভিক্ষুক করেছে কিন্তু তোমার স্বাবলম্বন তোমার আলস্য ঘুচাবে। আলস্য যদি ঘুচে যায়, তাহ'লে বজ্রমুষ্টিতে অস্ত্র ধারণ ক'রে তুমি দেশের, দশের, সমাজের ও জগতের অগণিত শত্রু নিমেষে নিমেষে নিঃশেষ ক'রে দিতে পার্ব্বে। আমার অভিক্ষা এই জন্য।

প্রথমোক্ত যুবকটী বলিলেন,—আমি যদি পুপুন্‌কী আশ্রমে না যাই, যদি নূতন জায়গায় গিয়ে আশ্রম করি, আপনার একখানা প্রতিচিত্র নিয়ে তাকে বসিয়ে যদি আপনার প্রবর্ত্তিত অভিক্ষা-ব্রত নিয়ে কাজ করি, তাতেও কি আপনার আপত্তি আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নূতন ক'রে আশ্রম গড়্‌বে? বাপরে বাপ্, মারা পড়্‌বে। ছলনা আর কৌশল ছাড়া কারো

ট্যাক থেকে একটী পয়সাও বের কত্তে পার্ব্বে না। তোমাকে নিরীহ দেখে তোমার নাম ক'রে দশ জনে দশ দিকে লুটে খাবে, নাম হবে যে পয়সাগুলি তুমিই খেয়েছ কিন্তু একটা পয়সারও মুখ ইহজীবনে দেখ্‌তে পাবে না। ধান ফসল ঘরে তোলার সময়ে পাঁচটী গ্রামের লোকেরা কিছু কিছু ক'রে ধান তোমার আশ্রমের জন্য একটী মাতব্বর গৃহস্থের ঘরে জমাবে এবং কিছুদিন পরে হঠাৎ দেখে অবাক্ হবে যে, হয় বড় বড় ইন্দুরে রাত্রি কালে সব ধান খেয়ে ফেল্ল, নয় একটী সন্ধ্যায় রামায়ণ গানের পরেই সবগুলি ধান গোযান-বোঝাই হ'য়ে সত্তর মাইল দূরে ভিন্ন জেলায় এক ভিন্ন সাধুর আখড়ায় গিয়ে উঠ্‌ল। তখন মনে বড়ই দুঃখ পাবে। তার চেয়ে বরং আমার সঙ্গেই পুপুন্‌কী চল, যে কয়দিনের জন্য তোমার অন্ন বিধাতা-পুরুষ সেখানে মেপে রেখেছেন, সে কয়দিন আমাদের সঙ্গে অর্দ্ধাশন ক'রে ক'রে শরীরের মেদ কিছু কমিয়ে রোগা পাত্‌লা দেহে ঘরে ফিরে মা-বাপের নয়নানন্দ বর্দ্ধন কর। অভিক্ষা বড় শক্ত ব্রত, এই ব্রতে হঠাৎ-দীক্ষা কোনো কাজের কথাই নয়।

কে দীক্ষা পাওয়ার অযোগ্য

একটী ভদ্রমহিলা আসিয়াছেন তাঁহার স্বামী সহ শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ দর্শন করিতে। কুশলপ্রশ্নাদি করিবার পরে মহিলাটী এক সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বলিতে সুরু করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বারংবার সংক্ষেপ করিতে বলিলেও মহিলাটী বলিতে লাগিলেন যে, বিশ্বাস করিয়া মনের কথা কোথাও বলিতে না পারার দরুণ তাঁহার মন এত অশান্তিপূর্ণ যে, তাঁহার দিনের আহার এবং রাত্রির নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে।

অগত্যা দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীবাবামণি ধৈর্য্য সহকারে তাঁহার কথা শুনিলেন। তৎপরে বলিলেন,—মাগো, আমার কাছে তোমার গুরুর নিন্দা কত্তে এসে তোমার কোনো লাভ হ'ল না। কারণ, তুমি তোমার গুরুর প্রতি বিরক্ত, অসন্তুষ্ট, বিরূপ বা বিদ্বিষ্ট দেখেও আমি কদাচ তোমাকে বল্‌ব না যে, তুমি ঐ গুরুকে ত্যাগ কর, বল্‌ব না যে, তুমি আমার শিষ্য হও। আমি বরং বল্‌ব, তোমার গুরুর প্রতি বিরক্ত হওয়ার হাজার কারণ থাকলে থাক্‌তে পারে কিন্তু তিনি ভগবানের যে নামটী বা জপের যে প্রণালীটী ব'লে দিয়েছেন, তার সঙ্গে ত' তোমার কোনও কলহ থাক্‌তে পারে না। নানা অবাঞ্ছনীয় ব্যবহার তোমাকে গুরুদেবের কাছ থেকে যত দূরেই নিয়ে যাক্, তুমি ভগবানের কাছ থেকে দূরে স'রে যাবে কেন? বলতে পার, ঐ গুরুর দেওয়া সাধন কত্তে বসলে ঐ গুরুর কথা বারংবার স্মৃতিপথে জাগবেই জাগ্‌বে এবং সেটা তুমি চাও না। এমন দুরবস্থা এসে থাক্‌লে তুমি তোমার পছন্দমত ভিন্ন গুরুর আশ্রয় নিতে পার কিন্তু তোমার সেই নূতন গুরুটী আমি নই। অনেক কারণেই তোমার নূতন গুরু আমি হ'তে পারি না। প্রথমতঃ তুমি

ঘরপোড়া গরু, তুমি সিন্দূরে মেঘ দেখলেই অকারণে ভয় পাবে, ভয় পাওয়া গরু আমার গোয়ালে আমি রাখি না। দ্বিতীয়তঃ গুরুনিন্দায় তুমি অভ্যস্ত হয়েছ। হয়ত এতদিন গুরুনিন্দা করেছ কারণ বশতঃ কিন্তু অভ্যাসের দোষে এর পরে গুরুনিন্দা সুরু কর্‌বে বিনা কারণে। তৃতীয়তঃ, তোমার গুরুর প্রদত্ত সাধন ক'রে তার ফলাফল প্রত্যক্ষ না ক'রেই তুমি সাধন-মার্গ পরিত্যাগ করেছ, কারণ তুমি নিষ্ঠাহীন। নিষ্ঠাশীলের জন্যই গুরু, নিষ্ঠাহীনের জন্য নয়। চতুর্থতঃ, যে সব অশ্লীল কথা সমূহ তোমার মুখ দিয়ে যে রূপ অনর্গল ভাবে নিঃসঙ্কোচে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাতে আমার কোনও রুচিমান্ শিষ্য তোমার সংস্পর্শে আসুক, এটা আমি কামনা কর্ত্তে পারি না। পঞ্চমতঃ, এতক্ষণ ধ'রে এত রকমের কথা যে তুমি বল্‌লে, তাতে কেবল তোমার নিজের স্বার্থের চিন্তাটাই লক্ষ্য করা গেল, দেশবাসী, সমাজস্থ, বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি জনসাধারণের দুঃখকষ্টে যে তোমার প্রাণে তাদের জন্য কখনো কোনো করুণা বা সমবেদনা জাগ্‌তে পারে, তার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। আমি চাই তেমন শিষ্য, যে সাধন কর্ব্বে, নিজের মঙ্গলের সাথে জগতের মঙ্গলকে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে নেবে, জগৎ-কল্যাণকারী হবে। তুমি তোমার গুরুকে আমার চক্ষে হেয় করার জন্য বাক্যবিন্যাসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ, এই বাগ্‌-বিভূতি তোমার অন্যান্য গুরুভাই-গুরুবোনদের মধ্যে প্রয়োগ ক'রে তুমি তাদের

মধ্যে কত কত জনের সহজ, সরল, স্বাভাবিক ও গভীর ভক্তিকে নষ্ট করেছ। তোমার এই অপরাধটাকে আমি ক্ষমার চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তোমার আদেশ বা উপদেশ নিয়ে কেউ তোমার গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিলে তুমি খুসী হও, কারণ গুরুভাইবোনদের মধ্যে এর দ্বারা তোমার প্রতিপত্তি বাড়ে কিন্তু কেউ যদি নিজের গরজে এসে ঐ গুরুদেবের শিষ্য হয় এবং নিজের নিষ্ঠার গুণে গুরুভাইবোনদের মধ্যে একটু প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে তার পিছনে লেগে পড় এবং বুঝাতে থাক যে, এই গুরু গুরুই নয়, তোমাকে দীক্ষার প্রয়োজনের কথা আগে জানালে তুমি আরও একজন গুরু দেখিয়ে দিয়ে তাকে সেখানে দীক্ষিত করিয়ে নিয়ে একেবারে উদ্ধার ক'রে দিতে। তোমার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুন্‌তে শুন্‌তে এই তথ্যগুলি আমি তোমার কথার ভিতর থেকে পেয়েছি। তাই থেকে বুঝেছি যে, তুমি অন্য কোনও মহৎ লোকের পুনরাশ্রয় পাওয়ার অযোগ্য। সুতরাং এখানে তোমার কিছুই পাওয়ার নেই, তুমি তোমার গৃহে ফিরে যাও।

ঈর্ষ্যার দোষ

মহিলাটীর স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার স্ত্রীর কর্ত্তৃত্বলিপ্সা তাকে বিভ্রান্ত করেছে।

নিজেকে মহৎ, নিজেকে শ্রেষ্ঠ, নিজেকে অসাধারণ ব'লে পরিগৃহীত করাবার জন্য গুরুদেবের নাম ক'রে প্রচার করেছে, "আহা গুরুদেব আমাকে কত ভালবাসেন, দিনরাত কেবল আমার কথাই তাঁর মুখে, দু-হপ্তা দেরী ক'রে দেখা কত্তে গেলে বলেন, আহা এতকাল যেন জলহীন মীনের মত কাতরা ছিলাম,—কাছে গেলে আমার এই ভরা যৌবনেও আমাকে ছোট্ট শিশুটীর মত আদর ক'রে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলেন, আহা রে, এতক্ষণে প্রাণটা জুড়াল,—কি যে আমাকে নিয়ে করেন আর না-করেন, তার কোনো ঠিকানাই নেই,— ইত্যাদি।" এই সব ক'রে ক'রে নিজেকে এমন একজন বড় পাণ্ডা ব'লে ইনি মনে কচ্ছেন যে, ঐ গুরুদেবের কাছে আর কেউ এসে একটু খাতির পেলে ঈর্ষ্যায় এঁর প্রাণ জ্বলতে থাকে। এসব পাণ্ডারা যখন দেখ্‌তে পায় যে ধর্ম্মসঙ্ঘে আরও শত শত যোগ্য লোক এসে ঢুকছে, তখন ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ ক'রে অনেক সময়ে মিথ্যা কথাও সবিস্তারে প্রচার করে থাকে। এমন স্ত্রীকে শাসনে রাখার চেষ্টা করা প্রত্যেক স্বামীরই উচিত। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম একটা পাগল রোগীকে দেখাতে এনেছ। এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি, মাথায় এঁর কোনো অসুখ নেই। অসুখ মনে। সেই অসুখের নাম ঈর্ষ্যা। ঈর্ষ্যার অনেক দোষ, ঈর্ষ্যার অনেক শাস্তি।

অযোগ্য স্বামী

মহিলাটীর স্বামী জিজ্ঞাসিলেন,—আপনি কি বল্‌তে চান যে, আমার স্ত্রীর সকল অভিযোগই মিথ্যা? আমাদের গুরুদেব কি এমনই নিষ্কলঙ্ক পুরুষ যে, তিনি কোনো অন্যায় কত্তে পারেন না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি তোমাদের গুরুদেবকে জানি না। তাঁর বিষয়ে কোথাও কিছু কখনো শুনি নাই। তিনি কি কাজ কত্তে পারেন আর কি কাজ কত্তে পারেন না, তার বিচার আমি কি ক'রে কর্‌ব? কিন্তু তোমার গুরুদেব নিজ কন্যার সঙ্গে যে ব্যবহার কত্তে পারেন না, তেমন ব্যবহার যদি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে করেন, তবে তুমি চুপ ক'রে ছিলে কেন? তিনি তাঁর যুবতী কন্যাকে কি চুমু খান? নিশ্চয়ই না। তবে তিনি তোমার স্ত্রীকে চুম্বন কর্ব্বেন কেন? তিনি তাঁর নিজ যুবতী কন্যাকে নিয়ে কি এক শয্যায় শয়ন করেন? নিশ্চয়ই না। তবে তিনি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে তা' কর্ব্বেন কেন? আর তা' তুমি কত্তে দেবেই বা কেন? একটা ষাঁড় যে ভাবে ইচ্ছা চ'রে বেড়াবে আর তোমরা স্বামীর দল নির্ব্বাক্ দর্শক হ'য়ে দেখ্‌বে, এটা তোমাদের কোন্ দেশী স্বামিগিরি? অযোগ্য স্বামীর কপালে অনেক দুঃখ, অনেক দুর্ভোগ, একথা ভুলো না।

বিশ্বাসঘাতক ও কালসর্প

শ্রীশ্রীবাবামণি স্বামীটীকে উদ্দেশ্য করিয়া আরও বলিলেন,—বিক্ষুব্ধ হবার অনেক কারণ তোমার স্ত্রীর পক্ষে থাকতে পারে কিন্তু সে যে একটী নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-সঙ্ঘের ভিতরে থেকে নিজেকে সেই সঙ্ঘের শিষ্য ব'লে পরিচিত ক'রে ঐ ধর্ম্মসঙ্ঘে সমাগত নূতনদের কাছে ব'লে বেড়াচ্ছে,—"আমাকে আগে বলনি কেন, আগে জান্‌লে এমন গুরুর শিষ্য আমি তোমাকে হ'তেই দিতাম না, আমি অন্য গুরু জুটিয়ে দিতাম, তোমাকে অধঃপতন থেকে রক্ষা কত্তাম",—এটা বিশ্বাসঘাতকতার একটী চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। অতীব গুরুতর এবং সঙ্গত কারণ থাক্‌লে শিষ্য নিশ্চয়ই গুরুত্যাগ কত্তে অধিকারী কিন্তু গুরুর সঙ্ঘে নিজেকে মাতব্বর ব'লে পরিচিতও কর্ব্বে আবার নবাগতদের মনে বিদ্বেষের বিষ, ঘৃণার কালকূট, সন্দেহের হলাহল ঢুকিয়ে দিতেও চেষ্টার ত্রুটি কর্‌বে না, এমন দুমুখো নীতির আদর সম্ভবতঃ পূতিগন্ধময় নরকেও নাই। সরল বিশ্বাসে বিরোধ ক'রে কেউ স'রে পড়লে তাকে কেউ বিশ্বাসঘাতক বলবে না। কিন্তু সরেও পড়বে না আবার সঙ্ঘের প্রাণ-পুরুষের সঙ্গে শত্রুতাও কর্ব্বে এমন লোক কালসর্পের চেয়েও ভয়ঙ্কর। অবশ্য, আমি জানি না যে, তোমাদের গুরুদেব কে এবং তিনি কেমন কিন্তু অপক্ষপাত বিচারে আমার মনে যা' জাগ্‌ছে তা বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি।

কলিকাতা
৩০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১
(১৪ই মার্চ্চ, ১৯৩৫)

শ্রীশ্রীবাবামণি গ্রে ষ্ট্রীটে এক ভক্তগৃহে আসিয়াছেন।

জাতির নরক

জনৈক যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতক্ষণ মানুষের জীবিকার্জ্জনের সাধারণ উপায়গুলি স্বাভাবিক ভাবে করতলগত না হবে, ততক্ষণ মানুষের মন থেকে অভাব-জনিত অশান্তি এবং সুনিবার্য্য দুঃখের সংঘাত-জনিত অসন্তোষ কখনো দূর হবে না। এই জন্যই চাই এমন উপায়ের অনুসন্ধান, যা' অবলম্বন কর্‌লে মানুষের অকারণ অভাব না থাকে, অহেতুক দুঃখ না আসে। অস্থির চঞ্চল মন অধীরতার আবেগে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে পথ চল্‌তে চেষ্টা করে, ফলে পদে পদে হয় পদস্খলন আর অপঘাত। ভারতের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তাগুলি কোন্ যুগে হয়েছিল স্ফুরিত? যখন অন্নচিন্তা চমৎকারা ছিল না, যখন মাটির উপরে একটী নখের আঁচড় কাট্‌লে ভূমি শস্যসম্ভারে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ত, যখন দেশ ছিল সুভিক্ষ, যখন দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, অনাবৃষ্টিতে, জলপ্লাবনে, মারাত্মক ঝঞ্ঝাবাতে মানুষের কষ্ট হ'লে সকলে সমস্বরে চীৎকার ক'রে বল্‌তে সাহস পেত,—"রাজা

অধার্ম্মিক, একে সিংহাসন থেকে সরাও।" ব্যাপক ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন কেবলই অভাব, অনটন, অশান্তি আর দুঃখের দুশ্চিন্তায় কক্ষভ্রষ্ট, তখন মানুষ উচ্চ ভাবনার অনুশীলনে অরুচিগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে, তখন মানুষের মন সহজ আমোদ-প্রমোদ, তরল আনন্দ আর ক্ষণস্থায়ী সুখের নেশাকে জীবনের সার-সর্ব্বস্ব ব'লে মনে ক'রে থাকে। এই যখন হয় অবস্থা, তখন এ জাতির নরকে ডুবতে বেশী সময় লাগে না।

নরকের সিঁড়ি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নরকের আবার সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে মানুষগুলি কেবলই নীচের দিকে নাম্‌তে থাকে। যত নামে, তত' আরো নামতে ইচ্ছা যায়। ইচ্ছা আর তার হয় না যে, সে ফিরে আসে বা উঠে আসে। দৈবাৎ কারো হঠাৎ তেমন শুভ ইচ্ছা জাগলেও অন্য নরকগামীরা তাকে হাতে, কোমরে, ঘাড়ে, পায়ে ধ'রে ধ'রে টেনে টেনে নামাতে থাকে। কারো ভাগ্যগুণে এমন কুসঙ্গীরা কাছে না থাক্‌লেও নরক-পথের পিচ্ছিলতা তাকে টেনে তড়িতের গতিতে নীচে ঠেল্‌তে থাকে। প্রথম সিঁড়িটীর নাম মদিরা। দ্বিতীয় সিঁড়িটীর নাম জুয়া। তৃতীয় সিঁড়িটীর নাম পরস্ত্রী।

নরক-পথের দার্শনিকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মদ খাবে কিন্তু মনটা খচ্‌খচ্‌ কত্তে পারে ত'। তাই মনটাকে প্রবোধ দিয়ে ভুল বুঝাবার জন্য একটা দর্শন-শাস্ত্র চাই। নানা পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় নামজাদা লোকেরা মদ খেতেন। আমাদের দেশেই বা অমুক কবি অমুক রাজনৈতিক নেতা কবে মদ্য বর্জ্জন ক'রে চলেছিলেন? আরে রাম, স্বয়ং ঋগবেদের ঋষিরা নাকি সোমরস পান কত্তেন। যা' ভাল লোকেরা করেছেন, বড় লোকেরা করেছেন, নামী লোকেরা করেছেন, তা' আমি বা তুমিই বা করব না কেন? হাজার বার করব। মদ খেলে ক্ষিদে বাড়ে, মদ খেলে শরীর ভাল থাকে, মদ খেলে সুনিদ্রা হয়, মদ খেলে খেলো সংসারের এলোমেলো দুঃখগুলি একেবারে তালগোল পাকিয়ে ভুল হ'য়ে যায়। তারপরে ভাই, কি নিশ্চিন্তি। জুয়াখেলাও খুব ভাল খেলা। পাঁচ জনের পকেট থেকে পাঁচ পাঁচ টাকা করে গেল, তাতে কারো সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে না, অথচ একজন এক সঙ্গে পঁচিশ টাকা পেয়ে গেল, তার কত সুবিধা হ'য়ে গেল। সকলের ধন দিয়ে একজনকে ধনী ক'রে দেওয়া একটা মস্ত বড় সৎকাজ। শুধু সৎকাজ? মস্ত বড় একটা বাহাদুরীর কাজ। এতে যারা আপত্তি করে, তারা ত' সংসারটার কিছুই চিন্‌ল না, জান্‌ল না। সেই সব বোকাদের কথা শুনো না।

আর পরস্ত্রী বলছ ত'? পরকীয়া না হ'লে কি প্রেম জমে? পৃথিবীর কত কত বড় মানুষেরা পরকীয়া করেছেন, তার খবর রাখ? অমুক কবি আর অমুক দার্শনিক ত' পরস্ত্রী পেলে লুফে নিতেন। খারাপ কাজ হ'লে কি তারা এমন কত্তেন? বড়রা যা' করে, তা' নিশ্চয়ই ভাল। আরো দেখ, কে কার স্ত্রী, কে কার নয়, এটা কি কারো গায়ে লেখা থাকে? যার সাথে যার ব'নে যায়, সেই তাকে পাবার অধিকারী, সমাজ এবং সামাজিক নিয়ম ত' সৃষ্টি করেছে একদল বুদ্ধিমান্ স্বার্থপর লোক, যাদের উদ্দেশ্যই ছিল পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা, দুর্ব্বলকে শোষণ করা, নির্ব্বোধকে নিজের অঙ্গুলীহেলনে চালিয়ে নিজের স্বার্থ সাধন করা। সুতরাং ওসব বাজে কথায় ভুলো না।

আমরা কি সভ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ভাবে এক নব-প্রকরণের দার্শনিকতা বিস্তার ক'রে এরা নিজেদের মতকে পোষণ করে, নিজেদের আচরণকে সমর্থন করে। কিন্তু একথা সত্য জেনো যে, যে দেশের নেতারা মদ্যপ, মানুষেরা লম্পট, বিনাশ্রমে বিপুল অর্থ অর্জ্জনের মোহে যে দেশের লোক মশগুল, আর যে দেশের নারীরা অসতী, সেই দেশের কখনো কল্যাণ নেই। ন্যায়োপেত অন্ন, শ্রমার্জ্জিত ধন, সুসংযত যৌন জীবন, সর্ব্বপ্রকার মাদক-দ্রব্য থেকে দূরে অবস্থান,—এই হচ্ছে উন্নত

ও সভ্য জাতির প্রকৃত পরিচয়। এই মাপকাঠি দিয়ে বিচার ক'রে দেখ, আমরা সভ্য কিনা। আমরা কি সভ্য,—এই প্রশ্ন কেউ আমাদের করলে আমরা রেগে মেগে অস্থির হই, কিন্তু যদি দেখা যায় যে, প্রতি গ্রামে, প্রতি সহরে সুরার চলেছে মহোৎসব, নামী নামী নেতারা সেই সব মহোৎসবের প্রসাদকামী ভক্ত, গ্রামে তেমন না হ'লেও যদি দেখা যায় যে, শত শত সহরে অসতী মেয়েরা ডঙ্কা বাজিয়ে স্পর্দ্ধিত মস্তকে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিত্য নূতন শিকারের সন্ধানে, যদি দেখা যায় যে, জুয়াখেলাকে লোকপ্রিয় করার জন্য আমরা নানা জনে নানা আয়োজনে ব্যস্ত, যদি দেখা যায় যে, আমরা শ্রম ক'রে অন্ন অর্জ্জন কত্তে চাই না, চাই ভিক্ষা ক'রে নতুবা চুরি ক'রে কিম্বা দস্যুতা ক'রে অন্ন অর্জ্জন কত্তে,—তারপরেও কি বলা চলবে যে, আমরা সভ্য এবং উন্নত?

মদ্যপান-নিবারক আন্দোলন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশহিতৈষীরা দেশের কাজ কর্ব্বার জন্য কত জনকে আকুল কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেন কিন্তু মদ্যপান নিবারণের জন্য যদি তাঁরা ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি কত্তে না পারেন, তাহ'লে দেশের অন্য সহস্র প্রকারের উন্নতি এলেও প্রকৃত উন্নতি কখনো আস্‌বে না। মনে কর, দেশের পরাধীনতা চলে গেল, কিন্তু দেশটা একদল মাতালের

কর্ত্তৃত্বাধীনে যদি এসে যায়, তবে তারা দেশের কি কল্যাণ কর্ব্বে? মনে কর, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হ'ল কিন্তু অর্জ্জনকারী ভদ্রলোক যদি মদ্যপানেই সব টাকা উড়িয়ে দেন, তবে তার স্ত্রীপুত্রকন্যা খাবে কি, তার মেয়ের বিয়ে কেমন ক'রে হবে, তার ছেলের পড়ার খরচ কে চালাবে, তার স্ত্রীর শাড়ীখানা ছিঁড়ে গেলে নূতন একখানা শাড়ী কে কিনে দেবে? শ্রমিকেরা শ্রম ক'রে সপ্তাহান্তে যে পয়সাটা কয়লার খনিতে পায়, আমি ত' নিজ চক্ষে মানভূম জেলাতে দেখেছি, তার প্রায় সবটাই ত' তার বেতন পাওয়ার দিনই সঙ্গে সঙ্গে মদের দোকানে খরচ হ'য়ে যায়। তবে তার মাইনে বাড়লেই তার সংসার স্বচ্ছল হবে কি ক'রে? মদ্যপান নিবারণের জন্য দেশ জুড়ে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন এবং সেই আন্দোলনকে সফল করার জন্য নেতা ও জনসাধারণ, শিক্ষক ও ছাত্র, চাকুরে ও ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও বিদ্যাবুদ্ধিহীন কৃষক-শ্রমিক, লেখক ও সাংবাদিক, পুরুষ ও নারী প্রত্যেকের সহযোগ প্রয়োজন। ঔষধের প্রয়োজন ছাড়া মদ্য-প্রস্তুতের কারখানা কোথাও স্থাপিত হবে না, তাল বা খেজুরের রসকে তাড়িরূপে ব্যবহৃত হ'তে দেওয়া হবে না, ভাতের পচাই তৈরী করা বন্ধ ক'রে দিতে হবে, মদ্যপায়ীদিগকে যোগ্য ঔষধ সেবন করিয়ে মদ্যপানের অভ্যাস থেকে অব্যাহতি দেবার চেষ্টা কর্ত্তে হবে। মানুষেরা দলে

দলে সুরাপান ক'রে উচ্ছন্নে যাবে আর সরকার আবগারী কর আদায়ের আনন্দে বগল বাজাবেন, এই অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। এজন্য যেরূপ শিক্ষা প্রয়োজন, আপামর জনসাধারণের মধ্যে তদ্রূপ শিক্ষার প্রসার সাধন কর্ত্তে হবে। বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর ধ'রে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে পার্লে এ আন্দোলন সফল হবেই হবে। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মেণ বা রুষরা মদ খায় ব'লে আমাদেরও খেতে হবে, তার কোনো মানে নেই।

মদ্যপানকে ঘৃণা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মদ্যপায়ীকে এদেশে প্রত্যেকেই মনে মনে ঘৃণা করে। ধনবান্ মদ্যপায়ী নিজ ধনের মহিমায় বাইরে লোকের খাতির, প্রণাম বা সেলাম পেলেও খাতিরকারী, প্রণামকারী, সেলামদাতা তাকে মনে মনে তুচ্ছই জ্ঞান করে। মদ্যপান রাজসিক চরিত্রের ধনী লোকদের একটা উৎকট ব্যসন আর তামসিক চরিত্রের গরীব লোকদের অস্তিত্ব-বিলোপকারী এক মারাত্মক দুর্ব্বলতা। এদের প্রতিজনকে এই পাপ পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য প্রাণভরা প্রেম নিয়ে আন্দোলনে নামা উচিত। ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধু বুনোদের দলে দলে হরিনাম-কীর্ত্তনে মত্ত ক'রে মদ্যপানের আসক্তি থেকে উদ্ধার করেছিলেন। অধিকাংশ লোকেরই মদ্যপানের

অভ্যাসকে উপযুক্ত প্রয়াস ও পরিবেশের দ্বারা দূর করা যায়। কিন্তু এত লক্ষ লক্ষ লোক মদ্যপানে আসক্ত যে, এই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীর প্রয়োজনও লক্ষ লক্ষ। মদ্যপানকে ঘৃণা ক'রো কিন্তু মাতালকে সংশোধিত করার জন্য যার যতটুকু সাধ্য প্রেম দাও।

মাতালের চরিত্র-পরিবর্ত্তন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মাতাল, জুয়াড়ি, লম্পট—এই তিনজনের ব্যাধিই বড় শক্ত ব্যাধি। কথায় বলে, উদরী, বাদুরী, যক্ষ্মা—তিন রোগে নাই রক্ষা। প্রায় সেই রকম। এজন্য খুব শক্ত বৈদ্য চাই, খুব দারুণ ঔষধ চাই। আমার মতে, সে ঔষধ হ'ল ভগবানের নাম। দীক্ষা না দিয়েও মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখ করা যায়। এসব ক্ষেত্রে সেইটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। তার প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা পোষণ না ক'রে তাকে নিরন্তর ভগবানের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ, দীক্ষাদানই এর একমাত্র চিকিৎসা নয়। অনেক ক্ষেত্রে দীক্ষা না দেওয়াই উচিত। কিন্তু সব চেয়ে উচিত কাজ যেটি, সেটি হচ্ছে এই সব লোকদের আত্মীয়-পরিজনদের দরদী চেষ্টা, যা তারা কর্ব্বে সহানুভূতিশীল মন নিয়ে।

ধর্ম্মের প্রকৃত সার্থকতা

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—ধর্ম্মের নামে মদ্যপান হয়, নারী নিগ্রহ হয়, নরহত্যা হয়, সেই বিষয়ে আপনার মত কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কারো মদ্যপানের রোখ্ চেপেছে, সে ধর্ম্মের নামে মদ খেল, এটা ধর্ম্মের দোষ নয়, মদ্যপানাসক্তিরই দোষ। এই বস্তু থেকে এবং এই আসক্তি থেকে দূরে থাকতে হবে। তারই নাম ধর্ম্ম। কারো নারী-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, সে তার ইষ্ট-দেবের দোহাই দিয়ে এই কুকাজটী কর্ল্ল, এটা ধর্ম্মেরও দোষ নয়, ইষ্টেরও দোষ নয়, দোষ নারীতে আসক্তির। ধর্ম্মের নামে নরবলি হয় বা ধর্ম্ম প্রচারের নামে শত শত মানুষকে নির্ম্মম নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়, এটা ধর্ম্মের দোষ নয়, দোষ মানুষের হত্যা-লিপ্সার। এই আসক্তি আর এই লিপ্সা থেকে দূরে থাকাই বরং প্রকৃত ধর্ম্ম। ধর্ম্ম যখন একটা ব্যবসায়ে বা জীবিকার্জ্জনের উপায়-রূপে পরিণত হয়, তখন ধর্ম্মের নামে অনেক অধর্ম্মই হ'তে পারে। রাবণের মত সন্ন্যাসীর গেরুয়া পরিধান ক'রে কত জনে যে সীতাহরণ কর্ছে, শুধু এইখানেই ধর্ম্মের অপব্যবহার নয়, ধর্ম্মের নাম ক'রে ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণও ধর্ম্মের অপব্যবহার। ধর্ম্ম মানুষকে পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত

কর্ম্মে, আর প্রত্যেক মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে বেঁধে ফেল্‌বে, ধর্ম্মের প্রকৃত সার্থকতা এইখানে।

ধর্ম্মের নামে আত্মপ্রতারণা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে এই সম্ভাবনাটীকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না যে, মানুষ যে একদা অন্য মানুষকে বাগে পেলেই কেটে কুটে আগুনে সেঁকে নিয়ে মাংস খেত, সেই গুরুতর বিপদের ব্যাপকতাটা কমিয়ে নেবার জন্যই এক সময়ে ধর্ম্মপ্রাণ কেউ কেউ একমাত্র যজ্ঞকার্য্যে নরমেধের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। মানুষের সব চেয়ে বেশী উপকারী প্রাণী গোজাতিকে লুব্ধ মানুষের দুর্নিবার লোভ থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টাও একদল ধার্ম্মিক লোকেই করেছিলেন। নির্ব্বিচারে নারীমাত্রকেই সম্ভোগ করার দুরতিক্রম্য লালসাকে স্তব্ধ করার জন্যই এক সময়ে সম্ভবতঃ তন্ত্র-পূর্ব্ব যুগের মানুষেরা স্ত্রীপুরুষের দৈহিক সংস্পর্শকে ধর্ম্মীয় একটা আবরণ দেবার চেষ্টা ক'রে থাক্‌বেন এবং সেই চেষ্টাই তান্ত্রিক যুগে পশ্বাচার বা দিব্যাচার আদি নামে পরিচিত হয়েছে। আসব-পানের মত্ততাকে একটা নির্দ্দিষ্ট পথে ধাবিত করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ এক সময়ে একদল বুদ্ধিমান্ পরিচালক মানুষকে ধর্ম্মীয় প্রয়োজনে সুরাপানের সীমার মধ্যে আবদ্ধ কত্তে চেয়ে থাক্‌বেন। এই রকমের নানা অনুমান করা সত্যই চলে। মানুষ চিরকাল অন্ধ তমসা থেকে

আলোকের দিকে আসতে চেষ্টা করেছে। যেখানে পূর্ণ আলো দেখতে পায় নি, সেখানে প্রায়ান্ধকারে থেমে থেমে বিচরণ করেছে, কুৎসিত কাজ, নিষ্ঠুর আচরণ, জঘন্য ব্যবহারের সঙ্গে ধর্ম্মকে যুক্ত করার চেষ্টাটা এই যুগেই প্রথম হয়েছে। পরে জ্ঞানপাপীদের হাতে প'ড়ে মনুষ্য-সমাজ জেনে শুনে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রেও নিজেকে নিজে কলা দেখিয়ে কেবল অহঙ্কার ক'রে বেড়াচ্ছে যে, সে দিব্য-জ্ঞানের পথে তার অরুণ-সারথির সূর্য্য-রথ চালিয়ে নিচ্ছে। এটা আত্মপ্রতারণা।

কলিকাতা
১লা চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৪১
(১৫ই মার্চ্চ, ১৯৩৫)

চরিত্রবলের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীশ্রীবাবামণি কালীঘাট পরাশর রোডে এক গৃহে আসিয়াছেন। অনেক যুবকের সমাগম হইয়াছে। একজন প্রশ্ন করিলেন,—বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন কি জিনিষের?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কিসের প্রয়োজন আমাদের সব চেয়ে বেশী, সেই কথাটা তোমরা কেউ বোঝ না? চারিদিকে তাকিয়ে দেখ ত', বুঝতে পার কিনা যে,

কোন জিনিসটীর আমাদের সব চেয়ে বড় অভাব? খবরের কাগজে পরিবেশিত সংবাদগুলি পাঠ ক'রে কি বুঝতে পার না যে, কোন্ মহাবস্তুর অভাবে আমরা একপা এগুলে সঙ্গে সঙ্গে তিনপা পিছিয়ে যাই? সে জিনিষটী আমাদের চরিত্রবল। অনন্ত অতীত ধ'রে চরিত্রবলেরই আমাদের প্রয়োজন বেশী ছিল, অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল ধ'রে চরিত্রবলেরই আমাদের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী থাক্‌বে। চরিত্রবলহীন জাতি কুজাতি, চরিত্রবলহীনদের দেশ কুদেশ, চরিত্রবলহীনদের যুগ অপযুগ। যে যেই ভাবে পার, চরিত্রবান্ হও। যে যতটুকু পার, চরিত্রবল সংগ্রহ কর।

চরিত্রবত্তার লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্রের মেরুদণ্ড সরলতা, সৎসাহস আর সততা। যার ভিতরে এই তিনটী জিনিষ দেখ্‌বে, জানবে, সে চরিত্রবান্ এবং নমস্য। চরিত্রবান্ ব্যক্তি নির্ভীক কিন্তু বিনয়ী। তার সাহস থাকে কিন্তু দম্ভ নাই। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু অন্যায় উপায়ে প্রতিষ্ঠা লাভে সে অনাগ্রহী। তার ভালবাসা আছে কিন্তু তাতে পঙ্কিলতা নাই। তার স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা সব-কিছু সুপ্রচুর পরিমাণে আছে কিন্তু আসক্তি নাই, মাদকতা নাই, লিপ্ততা নাই। এমন স্বভাবের মানুষগুলিরই আজ প্রয়োজন। শুধু আজ কেন চির কালেরই প্রয়োজন।

জীবন ও মরণ ভুবন-মঙ্গলের জন্য

একটী যুবক বিশেষভাবে ধর্ম্মোপদেশের জন্য আসিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মোপদেশ নয়, কর্ম্মোপদেশ নাও। মনে রাখো যে, আমাদের প্রতিজনের জীবন জগতের মঙ্গলের জন্য, কেবল নিজের কুশলের জন্য নয়। আমাদের বাঁচা, মরা, উন্নত হওয়া, পশ্চাদ্‌গামী হওয়া, কৃতকার্য্য হওয়া, বিফল হওয়া, দ্রুত-ধাবন, মন্থর গতি, সব-কিছু নিখিল ভুবনের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে। আমরা কেবল আমাদের নিজেদের জন্যই বাঁচব না, কেবল নিজেদের জন্যই মরব না, আমাদের জীবন-মৃত্যু নিখিল ভুবনের পরম কুশলের দিকে তাকিয়ে হবে। প্রচণ্ড বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়েও বেঁচে থাকবার প্রয়োজনটী হচ্ছে আমাদের উপরে প্রকৃতি-মায়ের জৈবিক দাবী। এই দাবী আমরা যে-ভাবে সঙ্গত মনে করি, অবশ্যই পালন কর্ব্ব কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনটীও কেবল আমাদের বাঁচার জন্যই নয়, নিখিল ভুবনের মঙ্গলের জন্য, এই প্রত্যয়ে আমাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

বারহারওয়া

৪ঠা চৈত্র, সোমবার, ১৩৪১

(১৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৫)

বেলা ৯টা ৩১এ ৪৩নং আপ ট্রেণে হাওড়া ছাড়িয়া

শ্রীশ্রীবাবামণি বিকাল ১৭টা ৩৬-এ বারহারওয়া পৌঁছিয়াছেন। এখানে একটী খ্রীষ্টিয়ান ভদ্রলোকের বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণি উঠিয়াছেন। ভদ্রলোক ও তাঁহার পত্নীর মাতৃভাষা ইংরাজি। তাঁহারা নিজেদের বিশেষ আগ্রহ হেতু শ্রীশ্রীবাবামণিকে এখানে আনিয়াছেন। কথোপকথন ইংরাজিতেই হইতেছে।

স্বামী ও স্ত্রীতে প্রাণখোলা আলাপে বসিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা একখানা ইংরাজি কাগজে "প্রেম" সম্পর্কে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পড়িতে পড়িতেই কথাগুলি উঠিল।

প্রেমের স্বচ্ছ রূপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রেমকে সাধারণ লোকে ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক জনিত আবেগ বা তৃপ্তি ব'লে মনে ক'রে থাকে। প্রেম সম্পর্কে এই ধারণাটা একান্তই স্থূল। চোখে দেখ্‌লাম, ভাল লাগ্‌ল। এটা প্রেম নয়, তা নয়। কাণে শুনলাম, ভাল লাগল। এটা প্রেম নয়, তাও নয়। কাছে বস্‌লাম, ভাল লাগল। এটা প্রেম নয়, তাও নয়, এটাও প্রেম। তবে বড় স্থূল ধরণের প্রেম। চোখে দেখবার দরকার হ'ল না, তবু ভালবাসি, কাণে শোনার দরকার হ'ল না, তবু ভালবাসি, কাছে বসবার দরকার হ'ল না, তবু ভালবাসি। পঞ্চেন্দ্রিয়ের একটী ইন্দ্রিয়কেও ব্যবহার করার প্রয়োজন-বোধ জাগ্‌ল না, তবু ভালবাসি। এটাই প্রেমের স্বচ্ছ রূপ।

উদার প্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একজনকেই ভালবাসি, জগন্ময় এ ভালবাসা ছড়িয়ে পড়ে না। এ ভালবাসা বড়ই সঙ্কীর্ণ। একজনকে ভালবাসতে গিয়ে তার ভিতরে জগতের সকলকে দেখ্‌তে পাই, জান্‌তে পাই, এ ভালবাসা ব্যাপক এবং উদার।

শুদ্ধ প্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেহ দিয়ে দেহকে ভালবাসি না। মনটা দিয়ে প্রাণটা দিয়ে দেহাতিরিক্ত এক উচ্চতর সত্তায় স্থির হ'য়ে প্রাণের ভালবাসাকে জগন্ময় ছড়িয়ে দেই, আর জগদ্বাসী সকলকে একটী ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পেয়ে ধন্য হই,—এ ভালবাসা বড় শুদ্ধ, বড় সুন্দর।

দাম্পত্য সংযমে আত্মশক্তি

মিঃ হেনরি জোন্‌স ও মিসেস্ এমিলিয়া জোন্‌স প্রশ্ন করিলেন,—আমরা শুনেছি আপনি কি এক অসাধারণ শক্তির প্রভাবে ভোগলোলুপ দম্পতীকে সংযমের পথে পরিচালিত করেন। সে সম্পর্কে আমরা কিছু শুনতে চাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার কোনো যোগৈশ্বর্য্য নেই যার প্রভাবে আমি নিজের ইচ্ছার বলে অন্যকে চালিত কত্তে পারি। আমার অন্তর-ভরা সদিচ্ছাটুকু নিয়ে আমি বিবাহিত

দম্পতীদিগকে উপদেশ দেই যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত দৈহিক সংশ্রব তোমরা বর্জ্জন ক'রে চল্‌তে চেষ্টা কর। আমি দুটী একটী উপদেশ মাত্র দেই, আর কিছুই করি না। যারা ব্যাকুল মনে উপদেশ চায়, আর একাগ্র মনে উপদেশ শ্রবণ করে, তারা নিজেদের আত্মশক্তিবলেই নিজেদিগকে পূর্ণতঃ প্রেম-পরায়ণ রেখেও সংযত হ'য়ে চল্‌তে পারে। তারা যে সফল হয়, এটা তাদের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল, ব্যক্তিগত উদ্যমের পরিণাম, আমার কোনো মহিমা নয়। মানুষের নিজস্ব সুপ্ত সামর্থ্যকে জাগিয়ে তোলাই আমার কাজ, আমার কোনও যোগৈশ্বর্য্যের বলে আমি কিছু করি না। আমি সাধারণ মানুষ।

দাম্পত্য সংযম প্রতিষ্ঠার প্রথম উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দাম্পত্য জীবনে সংযমকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরস্পরের মধ্যে চাই শ্রদ্ধা আর একে অন্যকে সহায়তা করার জন্য অকপট আবেগ। এক পায়ে মানুষ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে? দীর্ঘকাল স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য চাই দুটী পায়ের উপরেই সমান নির্ভর। জান্তব সুখকে চরম জ্ঞান না ক'রে যদি কেউ নিজেদের দাম্পত্য জীবনে সুস্থিরতা আনতে চায়, তবে তাকে ভগবানে নির্ভর কর্ত্তেই হবে। শুধু ঔচিত্য আর অনৌচিত্যের জ্ঞান

মানুষকে সুতীব্র রিপুর তাড়না থেকে রক্ষা কর্ত্তে পারে না। জীবনকে কর্ত্তে হবে শ্রীভগবানে একান্ত ভাবে নিবেদিত এবং তাঁকে তুষ্ট করার প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে ব্যবহার কর্ত্তে হবে প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে। দাম্পত্য জীবনে সংযমকে সহজে সুসিদ্ধ করার এইটী হচ্ছে প্রথম এবং প্রধান উপায়।

জগৎ-কল্যাণ-চিন্তা ও দাম্পত্য সংযম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দ্বিতীয় উপায় জগন্মঙ্গল-চিন্তা এবং নিজের দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুকে জগতের হিতকল্পে তৈরী করার জন্য নিরন্তর অনুধ্যান। যাদের দেহ জগতের কল্যাণের জন্য, তাদের ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারও জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য লক্ষ্যে ধাবিত হ'তে পারে না। এই দুইটীই হচ্ছে দাম্পত্য সংযম সাধনের অতি সহজ এবং অত্যাবশ্যকীয় উপায়।

বারহারওয়া

৫ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৪১

(১৯শে মার্চ্চ, ১৯৩৫)

প্রত্যেক দেশ একটী মিলন-তীর্থ

একটী শিক্ষিত সাঁওতাল যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ইনি সম্প্রতি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ

করিয়াছেন। ইনি আসিয়াই প্রসঙ্গ তুলিলেন,—এটা গবর্ণমেন্টের অত্যন্ত অন্যায় যে, সাঁওতাল পরগণাতে সাঁওতাল ছাড়া অন্য সমস্ত অধিবাসীদিগকে সাঁওতাল ভাষা শিখিতে বাধ্য করা হইতেছে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি এই দাবীর যুক্তি জানিতে চাহিলে যুবকটী বলিলেন,—সাঁওতালরাই সাঁওতাল পরগণার আদিম অধিবাসী। এখানে সাঁওতাল ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বলার কারো অধিকার নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইংরেজ এসে দেখেছে যে, এখানটায় অনেক সাঁওতাল বাস করে। কিন্তু তারা সবাই এই মাটীরই আদিম অধিবাসী, না অন্য স্থান থেকে যাযাবর অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে এবং তাদের সংখ্যাধিক্যের আপাত-প্রতীয়মান হিসাব থেকে জায়গাটার নাম সাঁওতাল পরগণা রাখা হয়েছে, এ বিষয়ে কিন্তু চূড়ান্ত গবেষণা এখনো হয় নাই। যদি এমন দেখা যায় যে, সাঁওতালরা এ অঞ্চলে আসবার আগেও অন্য জাতির লোক এখানে ছিল, তখন তারা কিন্তু ঐ একটা দাবীই কর্ব্বে যে, তারাই এখানকার আদিম অধিবাসী, অতএব তাদের ভাষায় এখানকার সকলকে কথা বল্‌তে হবে। কোল, ভিল, ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ, কুর্ম্মী এবং এইরূপ অনেক ধারার লোক এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে খাদ্যের

অন্বেষণে আদি যুগ থেকেই ছুটে ছুটে গেছে এবং দৈবক্রমে বা ভাগ্যক্রমে কোনো কোনো ধারার লোকেরা কিছু কিছু ক'রে কোনো কোনো স্থানে স্থায়ী হ'য়ে বসে ঘরদুয়ারও বেঁধেছে। মানবজাতির নানা ধারার লোকদের নানা দেশে বিস্তার পাওয়ার ইতিহাসটী ঠিক এইরূপ। একদল একখানে এসে কিছুদিন বাস্তব্যের পরে নিজেদের কিছু বংশধরকে ফেলে রেখে আবার হয়ত অন্য দিকে ছুটে চলে গিয়েছে। এই ছুটাছুটির প্রধান তাগিদ উদরের ক্ষুধা থেকে এসেছে। আর পরোক্ষ তাগিদ এসেছে নৈসর্গিক নানা উৎপাত থেকে, বন্যা থেকে, ঝড় থেকে, ভূকম্প থেকে, মহামারী থেকে, দাবানল থেকে এবং কখনো কখনো অন্য ধারার লোকদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ থেকে। এভাবে জাতির পর জাতি আর গোষ্ঠীর পর গোষ্ঠী মানুষেরা ব্রহ্মাণ্ডময় হেঁটে বেড়িয়েছে শুধু এই জন্য যে, একদিন নানা বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে, সম্মেলনে, সহাবস্থানে, সহযোগিতায় ও ভালবাসার মাধ্যমে এক শান্তিপূর্ণ স্নেহময় জগতের আবির্ভাব ঘট্‌বে। কোন্ জাতি কোথায় আগে এসেছিল, কোন্ জাতি কোথায় পরে এসেছে, এটা প্রকৃত জিজ্ঞাসুর কাছে খুব বড় প্রশ্ন নয়। কোন্ জাতি কোন্ জাতিকে ভালবাসতে পেরেছে, বিদ্বেষবর্জ্জিত সহযোগের দ্বারা কোন্ জাতির মনুষ্যত্বকে উদ্দীপ্ত কর্ত্তে পেরেছে, প্রকৃত জিজ্ঞাসুর কাছে এইটী হ'ল বড় প্রশ্ন।

পৃথিবীর নানা দেশগুলিকে বহুবিধ বিভিন্নতায় বিচিত্র মানব-গোষ্ঠীগুলির এক একটা মিলন-তীর্থ ব'লে জ্ঞান করা উচিত। সেখানে বহুজাতির মানুষ থাক্‌বেই, বহুভাষার কলধ্বনি উঠ্‌বেই, বহুমত প্রতিধ্বনিত হবেই,—এই বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা ভুল। জোর ক'রে যেমন কোনো ভাষাকে লুপ্ত ক'রে দেওয়া যায় না, জোর ক'রে তেমন কোনও ভাষাকে প্রচলনও করা যায় না।

সাঁওতাল ভাষার অক্ষর

তৎপরে সাঁওতাল ভাষার অক্ষরের কথা উঠিল। যুবকটী বলিলেন,—আমাদের ভাষাকে সর্ব্বত্র প্রচলনের জন্য আমরা নূতন বর্ণমালা সৃষ্টির বিষয় ভাবছি। কোথাও কোথাও বাংলা বর্ণমালা ব্যবহৃত হচ্ছে, মিশনারি সাহেবেরা রোমাণ হরফ আশ্রয় করেছেন। বাঙ্গালীরা আমাদের দৃষ্টিতে বিদেশী সুতরাং বাংলা বর্ণমালা আমরা নিব না। আমরা নূতন বর্ণমালা সৃষ্টি ক'রে নিব। অসমিয়ারা বাংলা বর্ণমালা নিয়েছে। নিয়ে কি হ'য়েছে? হাজার চেষ্টা ক'রেও তারা অসমিয়া ভাষাকে বাংলা ভাষা থেকে একটা পৃথক্ রূপ দিতে পাচ্ছে না। যার নিজস্ব হরফ নাই, তার ভাষা দীর্ঘকাল নিজস্বতা রাখ্‌তে পারে না। হিন্দী হরফে বাংলা লিখতে গেলে যেমন বাংলার উচ্চারণ আর থাকে না, বাংলা হরফে হিন্দী লিখতে গেলে তেমনি হিন্দীর উচ্চারণটি ঠিক হয় না। ইংরাজিতে ত নাই,

দ নাই, থ নাই, ধ নাই, সুতরাং ইংরেজি হরফও আমরা নিব না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বেশ ত' তোমার নিজের মাতৃভাষা লেখনীর মুখে কি ভাবের রূপ নেবেন, তার নির্ব্বাচনের অধিকার তোমারই সব চেয়ে বেশী। কিন্তু শিশুরাই ত' সর্ব্বপ্রথমে অক্ষরগুলি শিখ্‌বে! তাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতার দিকে তাকিয়ে কাজ করো।

ভারতবর্ষের মহিমোজ্জ্বলা ঐশী মূর্ত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু একটী কথা নিমেষের জন্যও ভুলে যেও না যে, ভারতবর্ষের বিগত চার, পাঁচ, ছয় হাজার বছর ধ'রে যত ঘটনা ঘটে গেছে, তার স্বাভাবিক ফল হচ্ছে জাতিতে জাতিতে সংমিশ্রণ, ভাষায় ভাষায় আলিঙ্গন, দেশে দেশে নৈকট্য-স্থাপন, আদর্শে আদর্শে আদান, প্রদান ও বিনিময়, যার চরম লক্ষ্য হচ্ছে এক অভাবনীয় ঐক্য। এই ঐক্য এলে সহস্র বিভেদের মধ্য দিয়েও এমন এক মহাশক্তির বিকাশ এই দেশের মাটিতে ঘটবে, যা কেবল জগদ্বাসী অন্য জাতিগুলি থেকে আমাদিগকে বিবাদ-বিরতই রাখ্‌বে না, যার ফলে আমরা জগদ্বাসী অন্য সকল জাতির যাবতীয় বিবাদ মিটিয়ে দিতে সমর্থ হব। ভারতবর্ষের সেই মহিমোজ্জ্বলা ঐশী মূর্ত্তিটির কথা কখনো ভুলো না।

ঈর্ষ্যা কেন

খ্রীষ্টান যুবকটী বলিলেন,—ভারতবর্ষের এমন এক অসাধারণ সৌভাগ্যের দিন যদি কখনো হয়, তবে তা' খ্রীষ্টধর্ম্মের সম্প্রসারণের দ্বারাই হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু নিজেকে যে ভারতবাসী ব'লে গণনা করে, ভারতের ঐতিহ্যই এমন অদ্ভুত যে, সে কখনো বল্‌বে না যে, এদেশে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মকে প্রচারিত হ'তে দেব না, এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুদ্ধারে ব্রতী কর্ম্মীদিগকে বাধা দিব। ভারত মহামিলনের তীর্থ। এই সত্য প্রকৃত ভারত-সন্তান মনে প্রাণে অনুভব করে। এখানে যার যা' ধর্ম্ম, সে তা' নির্ভয়ে পালন কর্ব্বে। এখানে যার যা' ভাষা, তা' সে নির্ভয়ে উচ্চারণ কর্ব্বে। যেদিন ভারতবর্ষে কোনও মানুষ তার ন্যায়-সঙ্গত ধর্ম্মকে পালন কত্তে বাধা পাবে, যে দিন ভারতবর্ষে মানুষ তার মাতৃভাষা উচ্চারণ কল্লে তার কণ্ঠরোধ করা হবে, বুঝতে হবে, সেদিন ভারতবর্ষ নিজের শ্মশানকৃত্য নিজে কত্তে সুরু করেছে। এক ধর্ম্মাবলম্বী ত্যাগী কর্ম্মীরা অনলস প্রযত্নে নিজেদের ধর্ম্ম প্রচার কচ্ছে, তাতে আমাদের ঈর্ষ্যা কেন হবে? বরং আমরা চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি যে, ত্যাগে, সেবায়, নিষ্ঠায়, নিষ্কামতায় এবং অনালস্যে আমরা তাদের

চেয়ে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে নিজেদের ধর্ম্ম প্রচারে আপ্রাণ শ্রমে লেগে যেতে পারি কি না। অন্যেরা নিজের ভাষাকে সৌন্দর্য্য-সুষমায় বিমণ্ডিত ক'রে ভিন্ন-ভাষা-ভাষীদের শ্রদ্ধা, বিস্ময়, পুলক ও আনুগত্য আদায় কত্তে পেরেছে ব'লে আমরা ঈর্ষ্যান্বিত হব কেন? বরং আমাদের উচিত, নিজ নিজ মাতৃভাষাকে বহুদীপদীপ্ত ক'রে তোলার জন্য একাগ্র, উদগ্র, একনিষ্ঠ ও কুণ্ঠাহীন সেবাদানের চেষ্টা করা। ভারতের অধিকাংশ ভাষার মধ্যে পারস্পরিক মিলের পরিমাণ এত বেশী যে, গরমিলটুকুকে হজম করা সহজ কাজ। ভারতের বহু ধর্ম্মমতের মধ্যেও কোথায় কোথায় আছে মিল, তার দিকে লক্ষ্য দিলে চিত্তও শুদ্ধ হবে, ঈর্ষ্যাও কমে যাবে।

৬ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৪১

(২০শে মার্চ্চ, ১৯৩৫)

অদ্য বারহারওয়া হইতে শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুনকী রওনা হইলেন। আজ পূর্ণিমা, বিশেষ কিছু কীর্ত্তনাদি পুপুন্‌কীতে আজ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কেননা, পূর্ব্বাহ্নে তদ্রূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সেবার ব্রত গ্রহণ কর

বারহারওয়া ষ্টেশানের দিকে রওনা হইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে একটী পূর্ব্ববঙ্গীয় যুবক আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-

বন্দনা করিয়া বলিল,—দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, দুটী উদরান্নের সন্ধানে। কোথাও কাজ না পেয়ে শেষটায় সাঁওতাল পরগণাতে ঢুকেছি। দেখি, ভাগ্যে কি আছে। গরীব মা-বাপকে খাওয়াতে ত' হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নেই, অবিরাম প্রয়াস এক সময়ে না এক সময়ে সফলতা অর্জ্জন করেই করে। সুতরাং নির্ভয়ে চেষ্টা ক'রে যাও। মনে মনে সঙ্কল্পটী দৃঢ় রেখ যে, কোনও অবস্থাতেই কারো কাছে ভিক্ষার্থী বা দয়ার প্রত্যাশী হবে না, তোমাকে নিজ-ভুজবীর্য্যেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আরও মনে রেখো যে, জীবনে জীবিকার্জ্জনের জন্য যে পথই গ্রহণ কর না কেন, তোমার চরম লক্ষ্য এবং পরম ব্রত হচ্ছে জগদ্বাসীর সেবা। অন্তরে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি না রেখে, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতাবোধ না রেখে, জাতিগত অহং বা বৈরভাব কিছুই না রেখে, মানুষকে দেবতা জ্ঞানে, নারায়ণ জ্ঞানে সর্ব্বাবস্থায় সাহায্য দান, সেবা করা তোমার লক্ষ্য হবে। কেবল "অন্ন দাও, অন্ন দাও" ব'লে ঘুরে বেড়ালে ত' চলবে না, "কে কি নেবে সেবা নাও, সেবা নাও", ব'লেও ডাক ছাড়তে হবে। আমরা দু'মুঠো অন্ন পেয়েই বেঁচে থাকি না, বেঁচে থাকি সকলকে সেবা দিয়ে। সেই সেবায় জাতির বিচার নেই, সম্প্রদায়ের বিচার নেই, প্রদেশগত সঙ্কীর্ণতার স্থান নেই। সেই সেবা প্রেমময়, প্রীতিস্নিগ্ধ, ভালবাসায় ভরা।

বন-পাহাড়ের অধিবাসীদের মধ্যে কাজ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কুমিল্লা আর নোয়াখালীর ছেলে অন্নের তল্লাসে এই সাঁওতাল পরগণায় এসে পড়েছ দেখে অবশ্য আমার একটু তাক্ লেগেছে। তোমাদের ঘরের কোণায় ত্রিপুরা রাজ্য আর কাছাড়ের পাহাড়। কত হাজার হাজার লোক শিক্ষাবঞ্চিত আরণ্য-জীবন সেখানে যাপন কচ্ছে, অবাধে উৎপন্ন অসংখ্য বৃক্ষলতাগুল্মের আড়ালে পড়ে তারা জ্ঞানের আলোক থেকে যেন চিরতরে নির্ব্বাসিত। ছুটে চলে যাও সেখানে জ্ঞানের বর্ত্তিকা হস্তে, তার সঙ্গে নিয়ে যাও সততা ও সৎসাহস। চরিত্রবলে তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর, কিছুটা জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে নিয়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খোল আর নিজের জীবিকার প্রয়োজনে কৃষিকার্য্য সুরু ক'রে দাও। শিক্ষার্জ্জনের ফলে যা-কিছু নূতন জ্ঞান বা শক্তির নূতন উৎসের সন্ধান পেয়েছ, বন-পর্ব্বত-বাসীদিগকে তার অংশীদার কর, সবাই মিলে চারিদিকে অন্নোৎপাদনের মহা-সমারোহ সৃষ্টি কর এবং চির-অবনতকে উন্নত করার প্রয়াসে ব্রতী হও। এখনো এদের মন সরল আছে, সরস আছে, অন্তরের গুণ-গ্রাহিণী শক্তি অটুট আছে। হাজার হাজার সেবাব্রতী কর্ম্মী বন-পাহাড়ের অধিবাসীদের মধ্যে গিয়ে কাজ কত্তে সুরু কর্লে সামগ্রিক ভাবে মানবজাতির বিশেষ কল্যাণ হবে।

নিঃস্বার্থ সেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একথা অবশ্যই স্বীকার করি যে, নিজে খালি পেটে থেকে কেউ অন্যকে পূর্ণাঙ্গ সেবা দিতে পারে না। এজন্য সেবকেরও নিজের উদর-পূরণের একটী ব্যবস্থার প্রয়োজন। যারা সেবা পাবার জন্য ব্যগ্র বা আগ্রহী, তারা যে সেবাদাতার উদরান্নের কথাটা ভাববেনই ভাববেন, এমন প্রত্যাশা করা চলে না এবং প্রত্যাশা করাও বোধ হয় অনুচিত। সুতরাং তোমাকে তোমার দগ্ধোদরের সেবার ব্যবস্থা নিজে ক'রে নিয়েই অন্যকে সেবা দানের জন্য চেষ্টিত হতে হবে। তোমার এই স্বাবলম্বনী বৃত্তির জন্য তোমার পক্ষে অপরকে সেবা দানের সময় ও সুযোগ বেশ-কতকটা সঙ্কুচিত হ'য়ে যাবে সত্য কিন্তু এ বিষয়ে তুমি নিরুপায়। তুমি যাদের সেবা দিচ্ছ, তোমার উদরান্নের জন্য যদি তোমাকে তাদের উপরেই নির্ভরশীল হতে হয়, তবে সেবাটা একটা চাকুরীর সামিল হ'য়ে পড়ে। তাতে সেবার কৌলিন্য কমে, মর্য্যাদা হ্রাস পায়। যেখানে যাকে যতটুকু সেবা দেবে, তাকে নিঃস্বার্থ ও নিঃসর্ত্ত রাখ্‌তে হবে। এদিকে তোমার চেষ্টা যেন অকৃত্রিম হয়।

প্রকৃত সেবকের মন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন ঘটনা একদিন ঘটে যেতে পারে যে, আজীবন যাদের সেবার জন্য শ্রম ক'রে

এসেছ, তারাই হঠাৎ তোমাকে তাদের অনগ্রসরতা ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তিতার জন্য দায়ী ক'রে জনসাধারণের দরবারে অভিযোগ উপস্থিত কর্ব্বে। এমন হতে পারে যে, যাদের সেবা করার জন্য তুমি নিজের শত স্বার্থকে পদদলিত ক'রে চলেছ এবং তারই জন্য বৈষয়িক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পার নাই, তারাই শত শত অভিযোগ ক'রে তোমাকে লোকচক্ষে হেয় কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্বে যে, তুমি কিছুই তাদের জন্য কর নাই, তুমি আরও সেবা তাদের কর্লে না কেন। যে সেবক, তাকে এই রকমের অপ্রত্যাশিত ও নিষ্করুণ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হ'য়ে চল্‌তে হবে। সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থাকে নিজের সেবাদানেরই অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্য ফল ব'লে গ্রহণ করার মতন দরাজ বক্ষ তোমার থাকা চাই। তবে তুমি হ'লে প্রকৃত সেবক। অকৃতজ্ঞতায় প্রকৃত সেবক ক্ষুব্ধ হয় না, কৃতঘ্নতায় প্রকৃত সেবকের মন বিচলিত হয় না। প্রকৃত সেবকের মন যেন একটী গ্রানাইট পাথরের বিরাট পাহাড়।

সমগ্র বিশ্ব এক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে নিজের জন্য বাঁচে, সে আর কতটুকু বাঁচে? যে সকলের শুভসাধনের জন্য বাঁচার চেষ্টা করে, সে স্বল্পকালের পরমায়ুতেও অনন্ত কাল বাঁচে। একমুষ্টি অন্নের সন্ধানে নিজের জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে যদি বাইরে আস্‌তেই পেরেছ, তবে তোমাকে তোমার জীবনটীকে

একটী জনসেবকের জীবনে পরিণত করবার জন্যও ব্রত নিতে হবে এবং তার জন্য কঠোর সাধনাও কত্তে হবে। পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষ যদি নিজ নিজ জেলা ছেড়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় গিয়ে সেবা-ব্রতের সাধনা আরম্ভ করে, তবে তার অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপে এক মহাকল্পপাদপের সৃষ্টি হবে, যার ছায়াতলে বিশ্রাম কত্তে কত্তে প্রত্যেক ভ্রাম্যমাণ পথিক আবেগাপ্লুত' কণ্ঠে বলতে পারবে,—সমগ্র বিশ্ব হচ্ছে একটী মাত্র দেশ এবং সমগ্র বিশ্বের সমস্ত ভাষা আমারই মাতৃভাষা।

ভারতের নিজস্ব প্রতিভা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি যেই জাতিটার মধ্যে জন্মেছ, সেই জাতিটার বহুযুগার্জ্জিত বংশানুক্রমিক সাধনার ঢংটী হচ্ছে এই। তার অনুরাগের পরতে পরতে বিশ্ব-প্রেমের রং-ফলান এক অত্যাশ্চর্য্য আভা। সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানুষ তার সমান আপন, সমান প্রিয়। ভেদাভেদ-বুদ্ধি তার লুপ্ত। সজ্ঞানে অজ্ঞানে সবাইকে আপন ব'লে ভাব্‌তে তার এক অপৌরুষেয় আনন্দ। এই আনন্দই হচ্ছে ভারতের নিজস্ব প্রতিভা। এই প্রতিভার প্রতি সম্মান রেখে আমাদের প্রতিজনকে চল্‌তে হবে, বল্‌তে হবে, ভাবতে হবে, প্রতিটি কাজ কত্তে হবে। ঘরের কোণে আবদ্ধ থেকে যারা বিশ্বকে দেখ্‌তে, বুঝতে, চিনতে চায়, তারা ভ্রান্ত। সবাইকে নিজ নিজ ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটে যেতে হবে, সমগ্র

বসুন্ধরার অপরূপ মূর্ত্তিটী দেখে নেবার জন্য। এইটীতে যারা দুঃসাহসিক হবে, সমগ্র জগৎকে তারা সুনিশ্চিত আপন রূপে পাবে। কারো হৃদয় পেতে হ'লে তাকে নিজের হৃদয় দিতে হয়। শুধু নেওয়া দিয়ে জগৎ চলে না, দেওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া, নেওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ার অবারিত গতির নাম সভ্যতার বিস্তার।

সেবার মহিমা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজকের মানুষের অন্ন-সমস্যা যেই স্তরে এসে নেমেছে, আগামী যুগের অন্ন-সমস্যা তার চেয়ে গভীরতর পঙ্কে নেমে ডুব্‌বে, সেখান থেকে সহজে আর কাউকে টেনে এনে স্বচ্ছলতার তীরে পৌঁছান যাবে না। অনাবাদি জমি সব আস্তে আস্তে আবাদ হয়ে যাচ্ছে, জনহীন বন-প্রান্তর উপত্যকা সব জনাকীর্ণ ও অভাবগ্রস্তদের কাতরোক্তিতে পূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থা মনুষ্য-সমাজে এল বলে, যে যুগে খাদ্য-সংস্থানের জন্য মানুষ হয়ত মানুষের মাংস খাবে। সম্মুখে বিভীষিকাময়ী এক করালিনী মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে ডেকে ডেকে যেন বল্‌ছে, "তোদের সবাইকে আমি খাব, হাড়গোড় শুদ্ধ চিবিয়ে চিবিয়ে খাব, রক্তমাংসমেদমজ্জা কিছু মাত্র বাদ দেব না, তোরা আয়, শুধু আমার কাছে আয়।" দুর্ভিক্ষের করাল মুখব্যাদান দিনের পর দিন বেড়ে যাবে আর দিকে দিকে আতঙ্কের সৃষ্টি কর্ব্বে।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি, মানুষের দুর্নিবার লোভ, পরস্বাপহরণে অত্যধিক আগ্রহ আর মানবজীবনের প্রকৃত মহিমা সম্পর্কে অচেতনতা মিলে এই নারকীয় কাণ্ড এই জগতে ঘটাতে চাইবে। যুদ্ধ আর মহাযুদ্ধের এরা হবে পরম সহচর, যুদ্ধ আর মহাযুদ্ধের এরা হবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ এবং ফল। জগদ্বাসীর জন্য এত যে অকল্পনীয় দুঃখ সঞ্চিত হ'য়ে আছে, তার কথা জেনেও তোমাদের ব্রত হবে সেবার, লক্ষ্য হবে সর্ব্বজনের শুভসম্পাদনের চেষ্টা। কতবার যে মানুষ পশুর চেয়েও হিংস্র হ'য়ে মানুষকেই করেছে হত্যা আর অপমান, ইতিহাস তার কতটুকু খোঁজ রাখে? কিন্তু তখন মানুষ ছিল অসভ্য ও বর্ব্বর। আজ মানুষ নিজেকে সভ্য ব'লে জ্ঞান কত্তে শিখেছে। আজও মানুষ নিজেকে এই বিপত্তি-সম্ভাবনার ঊর্দ্ধে নিতে পারে নাই। এই অনন্ত অশুভের সঙ্গে মহাপ্রাণ তপস্বীরা সেবাব্রত গ্রহণ ক'রেই লড়াই দেবেন, মারমুখী হ'য়ে নয়। আদিম বর্ব্বরতা যতই আস্ফালন ক'রে ক'রে বারংবার ধরাপৃষ্ঠে আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, প্রকৃত মানুষ সেবার মহিমাকে কখনো বিস্মৃত হবে না।

ধর্ম্মের দ্বন্দ্বে যাইও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অতীত কালের মানুষগুলি বর্ব্বর হ'য়ে উঠত মেয়ে-মানুষের উপরে অধিকার নিয়ে

প্রতিযোগিতা ক'রে। তারপরের মানুষ বারংবার বর্ব্বর হ'য়ে উঠেছে পররাষ্ট্র গ্রাস করার সুতীব্র উন্মাদনায়। এখনকার মানুষ বর্ব্বর হ'য়ে ওঠে অতি সহজে এবং অনেক সময়ে অকারণে শুধু ধর্ম্মের নামে। অথচ সমগ্র পৃথিবী কদাচ একটী মাত্র ধর্ম্মকে অনুসরণ কর্ব্বে না। যে যেমন পরিবেশে জন্মেছে, সে তার অনুকূল ভাবে কোনও ধর্ম্মকে আশ্রয় কর্ব্বে। সকলের ধর্ম্মকেও এক করা যাবে না। এজন্য যাবে না যে, এরকম চেষ্টা কখনো সফল হয় না। অনেক ধর্ম্মই প্রচারশীল। প্রচারশীলতার ফলে তাদের ধর্ম্মমতাবলম্বী লোকের সংখ্যা যতই বাড়ুক, পৃথিবীর সব লোক সেই ধর্ম্মই গ্রহণ কর্ব্বে, এমন আশা করা ভুল। পৃথিবীতে নূতন নূতন ধর্ম্মমতের অবির্ভাব ঘটবে না, এমন ধারণা করাও ভুল। সুতরাং কার কি ধর্ম্মমত, এ নিয়ে কলহের সৃষ্টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। যেখানেই যাও, সর্ব্বদা সতর্ক থেকো, এসব কলহের মধ্যে যেন জড়িয়ে পড়ো না।

ছড়াইয়া পড়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের জঠরাগ্নি বড়ই নিষ্করুণ। সুতরাং সদ্‌ভাবে পরিশ্রম ক'রে, লোককে না ঠকিয়ে, কাউকে ধোকা না দিয়ে, নিজের মেহনতের বলে যেখানেই অন্ন-সংস্থান সম্ভব হবে, সেইখানেই নির্ভয়ে যাবে। অন্ন-সংস্থান কত্তে হ'লে যেখানে মিথ্যাশ্রয় কত্তে হবে, প্রবঞ্চনা

কত্তে হবে, সত্যকে অস্বীকার এবং অসত্যকে স্বীকার কত্তে হবে সেখান থেকে সরে পড়বে। প্রত্যেকের জীবনেই কতকগুলি সার সত্য থাকে, যাকে অস্বীকার কর্লে তার জীবনের কোনও মানে থাকে না। এমন সত্যে দৃঢ়সংলগ্ন থেকে চল্‌তে হবে। তোমার ব্যক্তিগত জীবিকার্জ্জনের চেষ্টাকে পরোক্ষ ভাবে কিরূপে বহুজনের সুখার্থে বহুজনের হিতার্থে পরিণমিত করা যায়, তার দিকে লক্ষ্য রাখ্‌বে। এলক্ষ্য মানুষেরই প্রয়োজন, এলক্ষ্য মানুষেই সম্ভব। যেখানেই যাও, যেখানেই থাক, মানুষ-রূপেই বাস্তব্য ক'রো, পশুর মতও নয়, জড়বস্তুর মতও নয়। সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধতায় উন্মত্ত মানবেরা কি করে, না করে, তার অনুকরণ তোমাকে সাজবে না। নিখিল বিশ্বকে আপন করাই তোমার সাধনা, বিশ্বের ক্ষুদ্রতম একটু অংশকে আপন ভেবে কোনো ভুলের অভিনয় যেন তোমাকে না কত্তে হয়। ছড়িয়ে পড় সমস্ত পৃথিবীতে, এক জায়গায় না এক জায়গায় তোমার জন্য সদুপার্জ্জিত দুমুঠো অন্ন নিশ্চয়ই জুটবে।

সকলের ভাষা শিখ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেবাদানের জন্যই যাও আর অন্নার্জ্জনের জন্যই যাও, যে দেশে যাবে, সে দেশের ভাষা তোমাকে শিখ্‌তেই হবে। নতুবা তদ্দেশবাসীকে তোমার মনের কথা বুঝাতে পার্কে না। তারা যদি আগ্রহী হয়, তবে

তাদেরকেও তোমার ভাষা শিখাতে হবে। এভাবে একই ব্যক্তির দ্বারা নানাবিধ ভাষা আয়ত্ত হওয়ার ফলে মনের সঙ্কীর্ণতা কমে, হৃদয়ের উদারতা বাড়ে, জ্ঞানের পরিধি-বিস্তার ঘটে, পারস্পরিক সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা ও সৌহৃদ্যের সঞ্চার হয়। ভাষা যদিও ভাব-প্রকাশের একটী চমৎকার বাহন, ভাবের উচ্চতাই যদ্যপি ভাষার গৌরব, তথাপি যার যার মাতৃভাষা তার তার কাছে পরম রমণীয়। অন্যের ভাষাকে কখনো বিদ্বেষ কর্ব্বে না, উপহাসও কর্ব্বে না। ভারতে ত' ভাষা নিয়ে কোনো সমস্যারই সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। আমরা প্রত্যেকেই যদি সংস্কৃত-ভাষার চর্চ্চায় অবহিত হই, তাহ'লে বিভিন্ন প্রদেশের প্রত্যেকটী ভাষা আস্তে আস্তে সংস্কৃত-মুখিনী হবার ফলে সুদূর ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতে একটা সর্ব্বসামান্য এবং সর্ব্বপ্রামান্য ভাষার আবির্ভাব ঘটা অসম্ভব নয়। ইংরাজির মাধ্যমে সে আশা পূর্ণ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ট্রাঙ্ক, টেবিল, গ্লাস ইত্যাদি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শব্দ ছাড়া ইংরিজি ভাষা থেকে এমন অত্যধিক-সংখ্যক শব্দ আমরা ভারতের কোনো ভাষাতেই গ্রহণ করি নাই, যার ফলে ইংরিজি বিদ্যার এই পরম প্রাচুর্য্যের দিনেও আমাদের প্রায় সবগুলি ভাষাই ইংরিজিকে আত্মস্থ করে নিতে পারে। কিন্তু হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, তেলেগু, মারাঠি, গুজরাতি প্রভৃতি অসংখ্য ভাষাতে শত শত সহস্র সহস্র সংস্কৃত শব্দ আজও সগৌরবে বিরাজ

কচ্ছে। শুধু তাই নয়, নিত্য নূতন সংস্কৃত শব্দ এসব ভাষায় অবিরত প্রবেশ-লাভও কচ্ছে, একাঙ্গীভূতও হচ্ছে। এজন্য আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মাতৃভাষারও অতিরিক্ত সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চায় অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃতের চর্চ্চার ফলে ভারতের নানা অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি ভাষা-সূত্রে আকৃষ্ট হ'য়ে একদা একত্র ও কণ্ঠ-লগ্ন হতে পারে।

সংস্কৃত ভাষার মহিমা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংস্কৃত ভাষার বিরাট ও গৌরবোজ্জ্বল একটা অতীত আছে। সংস্কৃত ভাষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও হতাশ হবার কারণ নেই। আমরা বিলিতি বিদ্যা গলাধঃকরণ করার ফলে যতই চীৎকার ক'রে বলি না কেন যে, সংস্কৃত একটা মৃত ভাষা, কিন্তু প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন ল্যাটিন, প্রাচীন হিব্রু যে ভাবের মৃতভাষা, সংস্কৃত সে ভাবের মৃতভাষা নয়। এখনো ভারতের স্বল্পসংখ্যক লোক মাতৃভাষা-রূপে সংস্কৃতকে ধ'রেই রেখেছে আর ভারতের সর্ব্বপ্রান্তের প্রায় প্রত্যেকটী ভাষার উন্নত স্তরের সাহিত্যগুলি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত উচ্চ চিন্তাগুলিরই ক্ষীণ-প্রতিধ্বনি মাত্র। চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতেরা পেটে না খেতে পেয়ে শীর্ণ হ'য়ে গেছেন ব'লেই সংস্কৃত ভাষা মরে গেছে, এই মিথ্যা কথাটা কারো বিশ্বাস করা উচিত নয়।

ট্রেণের সময় নিকটবর্ত্তী বলিয়া অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া বিছানা-পত্র বাঁধা হইল এবং শ্রীশ্রীবাবামণি যথাকালে ট্রেণে চাপিলেন। যুবকটীকে বলিলেন, এক ফাঁকে পুপুন্‌কী আশ্রমে আসিয়া দেখা করিতে।

পুপুন্‌কী আশ্রম
১২ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৪১
(২৬শে মার্চ্চ, ১৯৩৫)

ভ্রমণ-ক্লান্ত শরীরে শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুন্‌কী ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, বেশ কয়েক দিন শয্যায় লম্বমান হইয়া শুইয়া বিশ্রাম নিবেন। কিন্তু হাজারিবাগ রিফরমেটারি জেল হইতে তত্রত্য হেড়-ক্লার্ক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তীর একখানা টেলিগ্রাম পৌছিল,—"আমি অতীব বিপন্ন, এখনি হাজারিবাগে দর্শন দান করুন।"

নিজের শরীর ক্লান্ত হইলেও শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইবার জন্য তৈরী হইতেছেন, এমন সময়ে সাঁওতাল পরগণার বারহারওয়াতে যে পূর্ব্ববঙ্গীয় যুবকটীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে পুপুন্‌কী আশ্রমে আসিয়া পৌছিল।

দেশের সেবা

যুবকটী বলিল,—আমি দেশের সেবাই কত্তে চাই, চাকুরী কত্তে চাই না। দেশসেবার উপায় কি বলুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশের সেবা কত্তে হ'লে দেশকে আগে চিন্‌তে হবে, জানতে হবে, ভালবাসতে হবে।

একটা দেশের কত দিকে যে সেবার প্রয়োজন, তা' উপলব্ধি কত্তে হবে। তারপরে জানতে হবে নিজেকে, নিজের আত্মোৎকর্ষের সম্ভাবনাকে, আর নিজের ভুলত্রুটির সম্ভাবনাকে। নিজেকে চিনে আর দেশকে চিনে, তারপরে স্থির কর্ব্বে যে, দেশের কোন্ সেবাটী কর্ব্বে। হাজার রকম সেবার মধ্যে দেশবাসীর অজ্ঞানতা দূর করার চেষ্টার মত বড় সেবা আর কিছু নেই। কারণ, মানুষের অধিকাংশ দুঃখের মূল কারণ অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতা দূর হ'লে প্রায় প্রত্যেকটী মানুষ নিজের অশেষ দুঃখের প্রতিকার ও প্রতিষেধ কত্তে পারে। দেশের মানুষকে ভিক্ষোপজীবিকা থেকে রক্ষা করা আর একটী সুমহতী সেবা। ভিক্ষুকের জাতি জগতে চিরনিন্দিত, চিরপদানত। ভিক্ষাবৃত্তির অনাদর ক'রে যখন দেশবাসী আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়, তখন তারা অনায়াসে মহৎ দুঃখকে নিবারণ কত্তে পারে, চরম দুর্ভাগ্যকেও যোগ্য প্রতিরোধ দিতে পারে। ভোগ-বিলাসের আগ্রহ কমিয়ে যদি দেশবাসীর মনে ত্যাগও ও সেবার ভাবকে প্রবুদ্ধ ক'রে দেওয়া যায়, তবে তার দ্বারাও এক মূল্যবান্ দেশসেবা হয়। ভোগের স্রোতে প্রবমান জাতির দুর্গতি অতি অদূরে। ত্যাগ ও সেবা জাতির সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির সহায়তা করে। মানুষের মনে ঈশ্বরবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা সফল হ'লে তার দ্বারা এক মূল্যবান্ দেশসেবা হয়। পরমেশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাসশীল মানুষ অপরের

প্রতি অবিচার কত্তে কুণ্ঠিত হয়, প্রতিটি জীবের প্রতি ভ্রাতৃভাবের আবেশ অনুভব কত্তে সহজে পারে, পাপ এবং পরপীড়ন থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়। কত জনে জগতে যে কত ভাবে দেশের সেবা কত্তে পারে, তার ইয়ত্তা নাই। তবে একথা জেনো যে, তুমি যদি সৎকার্য্য ক'রে ক'রে মানুষকে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কত্তে পার, তবে এর চেয়ে বড় স্বদেশ-সেবা আর কিছুই নেই। আমরা অনেকেই লোককে তারস্বরে চীৎকার ক'রে উপদেশ দেই,—"এই কাজ কর, ঐ কাজ ক'রো না,"—কিন্তু কেউ তাতে কর্ণপাত মাত্রও করে না। কারণ, লোককে যে সৎকার্য্যটী কত্তে বলি, আমাদের অধিকাংশের জীবনে তার দৃষ্টান্তটী রূপবন্ত হ'য়ে ওঠে নি। মানুষের চোখের সামনে জলন্ত জাগ্রত দৃষ্টান্ত-রূপে দাঁড়াতে পারলে যে পরিমাণ দেশসেবা করা যায়, অন্য কোনও উপায়ে তা' কখনো সম্ভব হয় না।

ভবিষ্যদ্দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রতিটি কাজেই ভবিষ্যদ্দৃষ্টির প্রয়োজন। হঠাৎ-বুদ্ধিতে কোনো কাজ ধ'রো না। অবশ্য, আপৎকালের কথা স্বতন্ত্র। গুরুতর বিপদের মুহূর্ত্তে উপস্থিত-বুদ্ধির খুব দাম। যার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যত অধিক, বিপদের দিনে গুরুতর কার্য্যোদ্ধারও তার পক্ষে

তত সহজ। কিন্তু স্বাভাবিক সময়ের কাজের জন্য হঠাৎ-বুদ্ধিকে আদর কত্তে নেই। একটী লঙ্কার চারা রোপন কত্তে হলেও কত আগ থেকে বীজতলা তৈরী কত্তে হয়, কত আগে এনে ভাল জাতের সুস্থ বীজ ঘরে তুলতে হয়, যেখানে লঙ্কার বাগান হবে, সেই স্থানটার জঙ্গল পরিষ্কৃত ক'রে কোদাল-লাঙ্গল চালাতে হয়, সার দিতে হয়, মাটি চূর্ণ কত্তে হয়, যে কূপ থেকে জল দিতে হবে, তার ঝালাইএর কাজ সেরে রাখতে হয়। একটা লঙ্কা গাছের চাষের সম্পর্কে যে কথা সত্য, সে কথা কি তোমার জীবন-কর্ম্মের মহত্তম অংশ সম্পর্কে সত্য নয়? নিরন্তর চিন্তা কর, কি তোমার কর্ত্তব্য, কি তোমার লক্ষ্য, কি তোমার পন্থা, কি ভাবে সেই পথে চলবে, কি কর্ল্লে সেই পথ সহজগম্য হবে, কি কর্ল্লে পথবিঘ্ন কম্‌বে, কি কর্ল্লে প্রলোভন তোমাকে কাবু কত্তে পার্ব্বে না।

প্রত্যাসন্ন কর্ত্তব্য ও দূরের কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এসব কথা যখন ভাব্‌বে, তখন একেবারে ঝিম্ ধ'রে ব'সে প'ড়ো না। চিন্তাও কর্ব্বে, কাজও কর্ব্বে। কাজ বন্ধ ক'রে দিয়ে কেবল চিন্তা করা এক প্রকারের অলস দার্শনিকতা, যার দ্বারা কোনো লাভই আসে না। কোন্‌টী তোমার প্রত্যাসন্ন কর্ত্তব্য আর কোন্‌টী তোমার সুদূর-কালের কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ে একটু স্পষ্ট ধারণা থাক্‌লেই আর তোমাকে বসে থাক্‌তে হয় না। যেটি আসন্ন কর্ত্তব্য, সেইটীতে হাত লাগিয়ে দিয়ে দূরের কর্ত্তব্য সম্পর্কে চিন্তা

করতে যাওয়া নিশ্চয়ই কঠিন কাজ নয়। এখন জমিতে তুমি ধান্য রোপণের কাদা কর্‌ছ ব'লেই ধান-ফসল ঘরে তোলার পরে কি ভাবে কখন তরি-তরকারীর বাগান চলতে পারে, সেই চিন্তা কত্তে তোমার অসুবিধা হবে কেন? দেশ ও জাতির সেবাই যাঁদের জীবনের ধর্ম্ম, তাঁদের অলস থাকাও চলে না, ভাবী কর্ম্মকাণ্ডের জন্য দেহে মনে প্রস্তুতির অভাব থাকলেও চলে না।

পিতৃমাতৃভক্তির প্রয়োজনীয়তা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বাবা, একটী খুব বড় কথা আবার কিন্তু ভুলে যাচ্ছ। তোমার বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা তোমার আসন্ন কর্ত্তব্য, যার হাত থেকে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত কত্তে পাচ্ছ না। পিতৃমাতৃসেবা করা পুত্রের জীবনে মহত্তম ব্রত। কারণ, পিতামাতার ভিতরে পরমেশ্বর-কৃপায় যে যে সদ্‌গুণের স্ফুরণ ঘটেছে, তাঁদের সেবা দ্বারা নিজ জীবনে সেগুলির বিস্তারিত বিকাশের সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হয়। তোমার পিতামাতা তোমার কেবল পিতামাতাই নন, তাঁরা অনন্ত অতীত কাল থেকে প্রবহমান কতকগুলি গুণোৎকর্ষের ধারক এবং মূলধন-দাতা। সেই মূলধনকে জগতের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে একদিকে যেমন বাড়াতে হবে, অন্য দিকে তেমন জগদ্বাসী সকলকে লাভবান্ ক'রে তুলতে হবে। পিতামাতা তোমার বা আমার নিকটে এক

একটা ব্যাঙ্ক-স্বরূপ, যা' থেকে সর্ব্বসৎকার্য্যের জন্য পাচ্ছি বিনিয়োজিতব্য সম্পদ এবং যাকে জগতে ছড়িয়ে দেবার ফলে বিশাল মানবজাতির গৌরবাবহ সম্পদগুলি আরও বাড়্‌বে। একদা যে মানবজাতি ছিল নিতান্ত পশুবৎ, অসভ্য ও বর্ব্বর, সেই মানবজাতি এভাবেই আস্তে আস্তে উঠে এসেছে বর্ত্তমান সভ্যতার চাকচিক্যময় জগতে। কিন্তু এখানেই তাদের উত্তরণ শেষ হ'য়ে যায় নি, তারা আরও সভ্য, আরও উন্নত হবে। সেই সম্ভাবনটুকুই গুণোৎকর্ষের মধ্য দিয়ে তোমার আমার পিতামাতারা তোমাতে আমাতে অর্পণ ক'রে রেখেছেন। এই ঋণ ব্যক্তিগত একটা জান্তব ঋণ মাত্র নয়, এই ঋণ সমগ্র ভাবী মানবজাতির পক্ষ থেকে তোমার আমার পিতামাতার মাধ্যমে সমগ্র অতীত মানবজাতির কাছে। কথাটীকে এই ভাবে বুঝে নিও এবং অন্তরের প্রসারিত আদর্শবাদ দিয়ে মাতৃ-পিতৃ-ভক্তির মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রো। বর্ত্তমানের শিক্ষা, সংস্কার, অভাব, অনটন, ব্যক্তিত্ববুদ্ধি এবং রুচি-প্রকৃতি মানুষকে পিতৃমাতৃভক্তির প্রয়োজনীয়তাকে ভুলিয়ে দিতে পারে কিন্তু আমাদের কারো এই সত্যটী বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

খড়্‌খড়ি ও গোমো
১৩ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৪১
(২৭শে মার্চ্চ, ১৯৩৫ ইং)

আগন্তুক যুবকটী সঙ্গ ছাড়িতেছে না। সেও হাজারিবাগ

যাইবে বলিয়া জিদ্ ধরিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হয়ত চণ্ডীবাবু এমন কোনও বিপদে পড়েছেন, যার বিবরণ তোমার মত একটী অপরিচিত আগন্তুকের কাছে প্রকাশ করা সঙ্গত হবে না। এমন একটা অবস্থায় একজনের বাড়ীতে আমি তোমাকে নিয়ে ভ্রমণ ক'রে যাই কি ক'রে?

যুবকটী বলিল,—না, আমি ত' নিজের পথেই চলে যাব, হাজারিবাগ আমার লক্ষ্যস্থল নয়। তবে, এরই মধ্যে যতটুকু সময় আপনার সঙ্গে থাক্‌তে পারি। গোমো পর্য্যন্ত থাক্‌ব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বেশ ত' চল গোমো জংশন পর্য্যন্তই। সেখানে গিয়ে আমি আমার ট্রেণ ধরব পশ্চিমাভিমুখে, তুমি তোমার ট্রেণ ধরবে পূর্ব্বাভিমুখে।

প্রাতে নয়টায় শ্রীশ্রীবাবামণি খড়্‌খড়ি রওনা হইলেন। এখানে বেলা ১২টা ৩০মিনিটে ট্রেণ ধরিয়া গোমো যাইতে হইবে।

দামোদর লালা

খড়্‌খড়ি ষ্টেশানের অতি সন্নিকটে তেলমোচে-কাতরাস্ রাস্তার উপরে মালপত্র রাখিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি একটু জিরাইলেন। যান-বাহনের অভাবে প্রায় সাত মাইল তাঁহাকে হাটিয়াই আসিতে হইয়াছে। জিরাইতে জিরাইতে রাস্তার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত একটা বাড়ীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—এটা দামোদর লালার বাড়ী। একদিন

আমার ভক্তেরা প্রত্যেকেই এই বাড়ীটার সম্মুখ দিয়ে যাবার সময়ে নিশ্চয়ই এই বাড়ীটাকে একটা প্রণাম জানিয়ে যাবে।

প্রশ্ন হইল,—কারণ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই যুগে যেচে কে কোন্ অপরিচিত লোককে সাহায্য করে বল ত'? দামোদর লালা করেছিলেন। কলকাতা থেকে এসেছি গোমো প্যাসেঞ্জারে। খড়খড়ি এসে পৌছুলাম অন্ধকার রাত্রে। সঙ্গে অনেক মালপত্র। সঙ্গী কেউ নেই। পুপুন্‌কী আশ্রমে পত্র দেওয়া ছিল যেন গ্রাম থেকে একটা গোযান ভাড়া ক'রে এখানে কেউ আসে। পত্র তারা পায় নি। কারণ, চাশ ডাকঘর থেকে পুপুন্‌কীতে সপ্তাহে মাত্র একদিন চিঠি বিলি হয়। খড়খড়ি ষ্টেশানে মালপত্র সহ নাম্‌লুম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও যখন কারো সাক্ষাৎ পেলুম না, তখন স্থির কর্ল্লুম, খড়খড়ি ষ্টেশানেই রাতটা কাটিয়ে দিব। কিন্তু ষ্টেশান-মাষ্টার বললেন, এমন কাজটী কর্ব্বেন না, কারণ কাল হয়ত প্রাতঃকালে আপনার ছিন্নমুণ্ডটী পাশে কোথায় প'ড়ে থাক্‌বে, আর পুলিশ এসে হাঙ্গামা করবে। আপনি ঐ রাস্তার ধারে যান, যদি দৈবাৎ কোনো ট্রাক বা কারো গাড়ী দক্ষিণ দিকে যায়, তবে হয়ত যৎসামান্য দক্ষিণা দিলে আপনাকে অনেকটা এগিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু রাস্তার উপরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এই প্রখর শীতে আর শিশিরের মধ্যে দীর্ঘকাল অনিশ্চিত

প্রত্যাশায় অপেক্ষা করাও ত' এক পরীক্ষা। যাই হোক্ শেষ পর্য্যন্ত তাই কর্ল্লুম। এক ঘণ্টা যায়, দুঘণ্টা যায়, এমন কোনো ট্রাক বা গাড়ী এই রাস্তায় আর আসে না, যা' দক্ষিণ দিকে যাবে। শেষটায় নিজের কম্বলখানি মুড়ী দিয়ে নিজের মালের উপরে প'ড়ে রইলাম। হঠাৎ কণ্ঠস্বর শুন্‌লাম,—"শুনছেন?" ইনি দামোদর লালা। তিনি বল্লেন,—"আমার বাড়ীতে এসে রাতটা কাটান। এস্থান ভাল নয়। বহিরে প'ড়ে থাকা নিরাপদ নয়।" সানন্দে রাজি হলাম। বিছানার আমার প্রয়োজন ছিল না, কারণ কম্বল আছে। আহারের আমার প্রয়োজন ছিল না, কারণ অর্থাভাবে বহু বৎসরই আমি রাত্রে আহার করি না। একটা লোক এসে দামোদর বাবুর একটা বাহিরের ঘরের মেঝেটা ঝাড়ু দিয়ে গেল, একটা খাটিয়াও দিয়ে গেল। খাটিয়াটা আর ব্যবহার কল্লাম না, নিশ্চিন্তে রাত্রিটা কাটিয়ে দিলাম। দামোদর বাবু যেচে আমাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে না এলে সেই রাত্রি রাস্তাতেই আমাকে কাটাতে হতো।

ভিখারী বাড়িলে দেশের সর্ব্বনাশ

বেলা সাড়ে বারোটায় খড়খড়িতে ট্রেণে চাপা হইল। বেলা একটায় ট্রেণ গোমো জংশনে পৌছিল। এখানে একটী

উপসর্গ জুটিল। একটী চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়স্ক উত্তর-পশ্চিম-ভারতীয় কিশোর শ্রীশ্রীবাবামণির পিছনে লাগিল যে, তাহাকে আশ্রয় দিতেই হইবে। তাহার পিতা পরলোকগত হইয়াছে। মা দ্বিতীয়বার একজনকে বিবাহ করিয়া ছেলেকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি একখানা পত্র সহ বালকটীকে কিছু পাথেয় দিয়া পুপুন্কী আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। লিখিলেন,—"এই বালকের উক্তির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্দ্ধারণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে কিন্তু সে যদি সত্যই নিরাশ্রয় ও সহায়সম্বলহীন হইয়া থাকে, তবে আশ্রমের কঠোর শ্রমে কখনো কাতর হইবার কথা নহে এবং নিজের শ্রম দিয়া নিজের অন্ন অর্জ্জনের আগ্রহ ইহার আসিয়াছে দেখিলে আমরা নিশ্চয়ই সানন্দে ইহার ভবিষ্যৎ ভাল করিবার বিষয়ে কি কি সাহায্য করিতে পারি, তাহার চেষ্টা দেখিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যেন আমাদের অদূরদর্শিতার দরুণ একটীও নূতন ভিক্ষুক দেশমধ্যে সৃষ্টি না করিয়া বসি। দেশে ভিখারী বাড়িলে দেশের যে সত্যই সর্ব্বনাশ ঘটে, এই বিষয়ে সচেতন থাকিয়া আমাদিগকে প্রতিটি কার্য্য করিতে হইবে। ভিক্ষা করি না, চাঁদা তুলি না বলিয়া আমাদিগকে যে নিদারুণ আর্থিক কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়া বিগত সাত আটটী বৎসর চলিতে হইয়াছে, একটী নূতন মানুষ আশ্রমভুক্ত হওয়ার ফলে তাহার তীক্ষ্নতা বাড়িবে সত্য, কিন্তু তোমরা ছেলেটিকে শ্রমে উৎসাহী করিতে চেষ্টা

করিও। তাহা হইলে নিজেদের দারিদ্র্য ইহার সহিত সমভাবে ভাগ করিয়া নিতে কোনও অসুবিধা হইবে না। ইহার মাতৃভাষা পৃথক্, ইহার পিতামাতার ধর্ম্মমতও প্রচলিত হিন্দুর ধর্ম্মমত হইতে আলাদা। ইহাকে ইহার ধর্ম্মীয় নিষ্ঠা হইতে বিচলিত করিবার প্রয়োজন আমরা দেখি না। যে যেই ভাষাতেই কথা বলুক, যে যেই ধর্ম্মমতেরই উপাসক হউক, আমাদের দেখিতে হইবে যে, তাহার ধর্ম্মমত বা মাতৃভাষার জন্য যেন সে আমাদের অবহেলার পাত্র না হয়। তাহাকে এই সকল বিষয়ে যতটা সম্ভব স্বাধীনতা দিলেও তাহাকে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবার স্বাধীনতা আমরা কদাপি দিব না। আমাদের এই আশ্রমটার নাম করিয়া চারিদিকে অনেকেই সঙ্গোপনে কিছু কিছু করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছে এবং সেই অন্যায়ার্জ্জিত পয়সাগুলি নিজেদের পকেটেই পুরিতেছে। আমাদের চতুর্দ্দিকে জানাইয়া দেওয়া এখন পুনরায় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে যে, ভিক্ষা আমরা করি না এবং ভিক্ষা আমরা কদাচ করিব না। আশ্রমে যে সকল অস্থায়ী কর্ম্মী মাঝে মাঝে আসিতেছে এবং দুচার মাস পরে চলিয়া যাইতেছে, তাহারা যাহাতে কেহ মানুষের কাছে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া নিজেদের আখের গুছাইতে প্রলুব্ধ না হয়, তদ্রূপ শিক্ষা ও সংস্কার তাহাদিগকে দিয়া দিতে হইবে। ভিক্ষুকের জাতিকে কেহ সম্মান করে না, ভিক্ষুকেরা চিরকাল পরপাদপিষ্ট হইয়াই দুঃসহ দুঃখের দুর্ব্বহ ভার বহন করে। পুপুন্কী আশ্রমের চারিদিকের গ্রামগুলিতে

বিগত সাত আট বৎসর ধরিয়া যে সহস্র সহস্র তোলা শাক-সব্জির বীজ আমরা বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া যাইতেছি, তাহার প্রত্যক্ষ ফল-স্বরূপে চারিদিকে কিছু লোকের গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে যে সকল তরি-তরকারী উৎপন্ন হইতেছে, তাহা যে দেশের পক্ষে একটা শুভ লক্ষণ, তাহা ঐ অঞ্চলের লোকেরা এখনও একটু মাত্রও বুঝিতে পারিতেছে না। বুঝিলে সরকারী সাহায্যে কূপ খননের কল্পনা তাহারা ছাড়িয়া দিত। ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি কাহারও মন হইতে আমরা দূর করিতে নিতে পারিতেছি না বলিয়াই ইহারা বৎসর বৎসর বিনামূল্যেই আমাদের কাছ হইতে বীজ নিতেছে। ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি দূর হইলেই ইহারা নিজেদের কূয়া নিজেরা খুঁড়িবে এবং একে অন্যকে সহায়তা করিয়া পরস্পর পরস্পরের জলাভাব দূর করিয়া দিবে। জলই এ দেশের সমস্যা। কবে যে এই সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা ভাবিতেছি। জল না পাইলে এদেশে কিছুই করা চলিবে না। এত উষ্ণ হাওয়া, এত রুক্ষ কাঁকর, এত বিরুদ্ধ মনোভাব,—তার মধ্যেও তোমাদের হতাশ হইলে চলিবে না। মন্ত্র-জপের মতন করিয়া কেবল জপ করিতে থাক, ভিক্ষা আমরা করিব না, ভিক্ষা আমরা চাহিব না, তথাপি সহস্র সহস্র মানুষকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিব। গোমো ষ্টেশানে বসিয়া আছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমার ট্রেণ আসিতে বহু ঘণ্টা বিলম্ব আছে। তাই, যেমন যাহা মনে

আসিল, তেমন তাহা লিখিয়া দিলাম। আসল কথাটা এই যে, যে বালকটীকে পাঠাইলাম, তাহাকে একটী দিনের জন্যও ভাবিতে দিও না যে, ভাষার জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সমাজের বিভিন্নতার জন্য বা অন্য কোনও কারণে তাহাকে তোমরা হেয় বলিয়া জ্ঞান করিতে অধিকারী এবং এই কথাও মনে রাখিও যে, এইরূপ কত বালক আসিবে এবং যাইবে, আমরা আমাদের দারিদ্র্যটুকু ছাড়া আর কোন্‌ও মূল্যবান্ বস্তুই তাহাদের সহিত ভাগ করিয়া নিতে পারিব না, তথাপি চলিয়া যাইবার দিন যেন সে এমন এক সুদৃঢ় মনোভাব নিয়া যাইতে পারে যে, জীবনে কখনো ভিক্ষা করা হইবে না,—ভিক্ষার দান নিয়া নহে, পৌরুষলব্ধ সম্বল নিয়াই জীবনকে সফল করিতে হইবে।"*

বিধবার হিতসাধন

ছেলেটী পত্রখানা লইয়া পুপুন্‌কী চলিয়া গেলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, বিধবার পুনর্বিবাহ একদিকে

---

* ছেলেটীর জন্মভূমি, সমাজ, ধর্ম্ম, নাম, গোত্র বা পরিচয় প্রকাশ করা হইল না। দুই চারিমাস আশ্রমে থাকার পরেই প্রকাশ পাইল যে, তাহার প্রদত্ত যাবতীয় পরিচয় ও বৃত্তান্ত একেবারেই অলীক। মানুষ ঠকাইয়া বেড়ানোই ইহার সুপরিকল্পিত পন্থা এবং এই পন্থাতে অন্যান্য বহুবালকের ন্যায় এই বালকটীও যোগ্য ওস্তাদদের শাগরেদী করিয়া হাত পাকাইয়া আসিয়াছে।

কত বড় একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার, অন্য দিকে কত সাংঘাতিক একটা বিপজ্জনক বস্তু। পুত্রকন্যা নেই, পিতামাতার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ, নিজেরও উপার্জ্জন ক'রে চলার যোগ্যতা নেই,—এমন অবস্থায় বিধবাকে যদি কোনো উপার্জ্জক ব্যক্তি বিবাহ ক'রে আশ্রয় দেয়, তবে তাকে একটা মস্ত বড় সমাজহিতৈষণা ব'লে গণ্য কত্তে হবে। কিন্তু পুত্র-কন্যাবতী নারীকে বিধবা ব'লেই দয়া ক'রে যদি কেউ বিবাহ করে, তবে তাকে আবার পরের ছেলেমেয়েকে পালতে হয়। এতটা উদার অনেক মানুষই হ'তে চায় না বা হ'তে পেরে ওঠে না। এসব ক্ষেত্রে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হ'লে পূর্ব্ব স্বামীর ঘরের ছেলেমেয়েরা তেমন আদর-ভালবাসা পায় না,—এটা সন্তানদের পক্ষে ক্ষতি। কিন্তু পুত্রকন্যারা যে পুনর্ব্বিবাহিতা মাতাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখ্‌তে চায় না, এটাও তাদের মায়ের পক্ষে এক মস্ত ক্ষতি। কিন্তু অন্য দিকেও দেখ। বিধবারা যদি কেবলি পুনর্ব্বিবাহিতা হ'তে থাকে, তা' হ'লে অবিবাহিতা কুমারী মেয়েদের পতি লাভের সম্ভাবনা কতকটা বিঘ্নিত হবেই হবে। একদল বিধবা নিষ্ঠার সঙ্গে বৈধব্যকে ব্রত-রূপে পালন ক'রে আসছেন ব'লে দেশের ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা ঐ একটা দিক্ দিয়ে প্রদমিত হয়ে আছে। আবার অধিকাংশ একান্নবর্ত্তী পরিবারে দুই এক জন মামী, পিসী, মাসী, খুড়ী, জ্যেঠী, দিদি প্রভৃতি বাল্যকাল থেকে বৈধব্যপালন ক'রে আসছেন ব'লে ঐ ঐ পরিবারে এক একজন সুদক্ষা

শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করার জন্য আজন্ম-সেবা-ব্রতের চর্চ্চা ক'রে যাচ্ছেন, এই দৃশ্যটী স্বর্গীয়। যে কারণেই হোক্, মানুষ সংযমের পথ আশ্রয় করেছে দেখ্‌লেই, এদেশের অন্তরাত্মা আনন্দে নৃত্য ক'রে ওঠে। মৃতভর্ত্তৃকা নারীর উপরে অত্যাচার করার জন্যই এদেশে বৈধব্য ব্রতের উদ্‌ভাবন হ'য়েছিল, এমন অভিযোগ কত্তে যাওয়া পাগলামি মাত্র। কিন্তু বিধবাকে কোনও অবস্থাতেই পুনর্ব্বিবাহ কত্তে দেওয়া হবে না, এই জিদও অনুচিত। মহাপ্রাণ পুরুষেরা নানা ভাবে বিধবা-জীবনের দুঃখ বিদূরণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, বিধবার হাতে অন্নার্জ্জনের ক্ষমতাটি যিনি দিতে পেরেছেন বা পার্ব্বেন, তিনি বিধবা বিবাহের সমর্থকই হোন্ আর বিরুদ্ধবাদীই হোন্, তিনিই বিধবার সব চেয়ে বেশী উপকার কত্তে পেরেছেন বা পার্ব্বেন। যার অন্নার্জ্জন-ক্ষমতা আছে, সে-ই পুনর্ব্বিবাহিতা হবার পরে নূতন সংসারে এসে নিজেকে সম্মানিত স্থানে রেখে প্রতিটি কাজ কত্তে পারে। বেঁচে থাক্‌বার জন্যই অন্নার্জ্জন-ক্ষমতা প্রয়োজন। যার অন্নার্জ্জন-ক্ষমতা নেই, সে পরের গলগ্রহ হ'য়ে মরার মতই বেঁচে থাকে।

রাত্রি একটায় শ্রীশ্রীবাবামণি হাজারিবাগ-রোড ষ্টেশান হইতে হাজারিবাগের বাসে রওনা হইলেন।

হাজারিবাগ

১৪ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

(২৮শে মার্চ্চ, ১৯৩৫)

চণ্ডীবাবু হাজারিবাগ সহরে বাসষ্ট্যাণ্ডে লোক রাখিয়াছিলেন। সুতরাং রিফরমেটরী জেলে চণ্ডীবাবুর বাড়ীতে আসিয়া পৌছিতে কোনও ক্লেশ হইল না। কিন্তু জামা-কাপড় ছাড়িতে গিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি হৃৎপিণ্ডের নিকটে তীব্র বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আসিলেন। পরীক্ষার পরে বলিলেন,—রৌদ্র বর্জ্জন করিতে হইবে, ইজি-চেয়ারে শুইয়া থাকিতে হইবে, গরম জলে স্নান করিতে হইবে। পুরাতন প্লুরিসিটা এখনো রহিয়া গিয়াছে, রক্তের চাপ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে এবং হৃৎস্পন্দন অস্বাভাবিক ভাবে ধীর হইয়া গিয়াছে।

মানুষ কি ভগবান্

আজ আর কাহাকেও দেখাশুনা করিতে দেওয়া হইবে না। তথাপি দ্বিপ্রহর সময়ে হাজারিবাগ সহরের এক ভদ্রলোক আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহার কিছু কথা আছে। কথাটা আজই বলা চাই। কারণ, তিনি আজই সন্ধ্যায় কর্ম্মস্থল পুনাতে রওনা হইবেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বলুন!

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমি একটা আশ্রমের শিষ্য হয়েছি। আমাদের মঠের প্রতিষ্ঠাতার নাম অপ্রকাশ বাবা। * আমাকে মন্ত্র দেওয়া হয়েছে ওঁ অপ্রকাশায় নমঃ। তিনি একজন মানুষ। আমাদেরই মতন রক্ত-মাংসের মানুষ। মন্ত্রজপ করার সময়ে তাঁরই মূর্ত্তিধ্যান কত্তে হয়। কিন্তু তখনি আমার মনে পড়ে যে, সূর্য্যবাবা এঁর চেয়ে অনেক বড় মহাপুরুষ। আমার ইচ্ছা করে সূর্য্যবাবার রূপটী ধ্যান কত্তে। বলুন, আমি কি কর্ব্ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপনি আপনার গুরুদেবকে এই প্রশ্নটী কর্লে ঠিক ঠিক উত্তর পাবেন। অন্যত্র উত্তর খুঁজে হয়ত সময় নষ্ট কচ্ছেন।

ভদ্রলোক বলিলেন,—গুরুদেব নরদেহে নেই। গিয়েছিলাম আশ্রমের সবচেয়ে বড় সাধুর কাছে। তিনি বল্লেন, বেশ ত'। আমি আপনাকে আর একটী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে দিচ্ছি। তা' হ'লেই আর অপ্রকাশ বাবার রূপ আপনাকে ধ্যান কত্তে হবে না।

—তারপর?

—না, আমি আর তাঁর কাছে নূতন ক'রে দীক্ষা নেই নাই। আমার আশঙ্কা হ'ল যে, তিনি আবার মন্ত্র দেবেন ওঁ অনিরুদ্ধ বাবায়ৈ নমঃ। তাঁর নিজের নাম অনিরুদ্ধ বাবা কিনা। আমি কতক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কৌশল ক'রে পালিয়ে বাঁচলাম।

* ইহা প্রকৃত নাম নহে। নামগুলি সঙ্গত কারণেই পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' হ'লে আপনার এখন সূর্য্য বাবার কাছে যাওয়াই হয়ত সঙ্গত হবে। তিনি হয়ত আপনার সকল সমস্যার সমাধান ক'রে দিতে পার্ব্বেন।

ভদ্রলোক বলিলেন,—সেই সাহসও হচ্ছে না। দূর থেকে সূর্য্য-বাবাকে দেখে যতটা ভক্তি হয়েছে, কাছে যাবার পরে যদি তা' না থাকে? আবার, তিনি যদি মন্ত্র দেন ওঁ শ্রীসূর্য্যবাবায়ৈ নমঃ, তারপরে যদি মন্ত্রজপ কত্তে ব'সে মনে পড়ে যে, সূর্য্যবাবার চেয়ে বড় মহাপুরুষ অমুক সিদ্ধ পুরুষটীর জপ ধ্যান কল্লে ভাল হয় না? তখন কি কর্ব্ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি ইজিচেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন, সমগ্র ঘরখানা প্রকম্পিত করিয়া দিয়া অট্টহাসি হাসিলেন, তারপরে বলিলেন,—তবে ত' বড় বিষম গোলক-ধাঁধায় পড়ে গেছেন। যাঁর কাছে যাবেন, তিনিই মন্ত্র দেবেন একটী মানুষের নামযুক্ত ক'রে, তিনিই ব'লে দেবেন ঐ মানুষটীকে ঈশ্বর ব'লে ভাবনা কর, তাঁর চেয়ে বড় মানুষ কাউকে পেলে ক'দিন পরে আবার সেই নূতন মানুষটীর কাছে মন্ত্র নেবেন,—এটা সত্যিই এক হাস্যকর অবস্থা এবং দারুণ সমস্যা। তার চেয়ে এক কাজ কর্ল্লে হয় না? মানুষকে ভগবান্ ব'লে ভাববার চেষ্টা না ক'রে, না-জানা না-চেনা না-দেখা ভগবানকেই একমাত্র ভগবান্ ব'লে ভেবে নিয়ে ভগবানের নাম জপ কর্ল্লে হয় না?

ভদ্রলোক।—মানুষ কি ভগবান্ নয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মানুষ ভগবান্ একথাও সত্য, মানুষ ভগবান্ নয়, একথাও সত্য। স্থলবিশেষে এটী সত্য, স্থলবিশেষে এটী অসত্য। মানুষকে ভগবান্ ব'লে প্রতিষ্ঠিত, প্রচারিত, পরিগৃহীত করাবার উদ্দেশ্যে যখন ভগবান্ বলা হবে, তখন একথা মিথ্যা। ভগবানকে পাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে সাধন কত্তে কত্তে যখন উপলব্ধি আসবে যে, মানুষই ভগবান্, তখন একথা সত্য। কার পক্ষে কখন কোন্ কথাটী সত্য, তা' কারো গায়ের জোরে নির্ণীত হবে না, নির্ণীত হবে অকপট, নির্ভুল ও নির্ভেজাল উপলব্ধি দ্বারা। অনুমান বা আগ্রহকে যদি উপলব্ধি ব'লে চালাবার চেষ্টা হয়, তাহ'লে লাভ না হ'য়ে ক্ষতিই হবে।

ইতিমধ্যে চণ্ডীবাবু আসিয়া আলোচনায় যোগ দিলেন। তিনি বলিলেন,—এ' ত' বড় তাজ্জব ব্যাপার যে, কদিন পরে পরেই নিত্য নূতন ভগবানেরা দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে আবির্ভূত হবেন আর আমরা ভগবানের ভক্তের দল কার ভগবান্ কত বড় আর কার ভগবান্ কত ছোট, সেই তর্ক তুলে পরস্পর মাথা-ফাটাফাটি কর্ব্ব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি যদি আমার পরিদৃষ্ট বা আবিষ্কৃত একটী মানুষকে ভগবান্ ব'লে প্রচার কত্তে অধিকারী হই, তুমি বা কেন তোমার পরিদৃষ্ট বা আবিষ্কৃত একটী মানুষকে ভগবান্ ব'লে প্রচার কত্তে অধিকারী হবে না? একজনের ঈশ্বরত্বের কথা কোনো এক সংস্কৃত বা প্রাচীন

পুস্তকে লেখা আছে ব'লেই, যাঁদের নিয়ে প্রাচীন কালে কোনো পুথি বা পুস্তক লেখা হয় নি, বা যাঁরা একান্তই আধুনিক মানুষ, তাঁরাই বা কেন ভগবান্ হতে পার্ব্বেন না,—এই তর্ক উঠ্‌বে। তুমি যদি তোমার অন্ধবিশ্বাসের দাপটে বা যুক্তিতর্কের ঝড়-ঝঞ্ঝায় একটী মানুষকে ভগবান্ ব'লে দাঁড় করাতে পার, তবে আমিই বা উগ্র জিদাজিদির দাপটে আর কুতর্কের তলোয়ার চালিয়ে আর একটী মানুষকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার ব'লে প্রতিষ্ঠা কত্তে পার্ব্ব না কেন? খ্রীষ্টান মিশনরীরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে একেবারে ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন, তখন কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন,—

"মেরীর তনয় যদি ঈশের তনয়,
ঘোষের তনয় তবে দোষের ত' নয়।"

—একটী জনকেও যদি ঈশ্বরের স্থানে ব'সে যাবার অধিকার দেওয়া হয়, তবে আরও দুই, দশ, বিশ জনকে কেন সেই অধিকার দেওয়া হবে না,—এই দাবী তারা প্রত্যেকেই করবে, যারা নিজেদের পছন্দমত একজনকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার ব'লে প্রচার কত্তে চায়। একদল লোক সর্ব্বদাই এইরূপ প্রচারে খুবই উৎসাহশীল ও উন্মুখ থাকে ব'লেই ত' মানুষেরা কেউ কেউ ঈশ্বর ব'লে পূজিত, প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হ'তে আগ্রহ বোধ করেন। আবার, এঁরা এই বিষয়ে আগ্রহ বোধ করেন ব'লেই এঁদের গুণদর্শী ভালবাসার জনেরা যুক্তি ও সঙ্গতির বিচার একেবারে ভুলে গিয়ে পরমোৎসাহে

নিজেদিগকে এই সকল প্রচারান্দোলনে জড়িয়ে ফেলেন। বহুলোকের সমবায়ে ও সমর্থনে প্রচারের একটা বিরাট মেশিনারী যখন রাজপথ বেয়ে ঘট্‌ঘট্ আওয়াজ কত্তে কত্তে চলতে থাকে, তখন অনেক লোক আবার "দূরে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে লোকে কি বল্‌বে" ভেবে নিজ নিজ ইজ্জত বাঁচাবার জন্য ঐ জনতার ভিড়ে ঢুকে যান। কেউ বা সেক্রেটারী হবার লোভে, প্রেসিডেন্ট হবার লোভে, প্রধান অতিথি হবার লোভে ঐ সব আন্দোলনের প্রবক্তা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কেউ কেউ আবার আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ দে'খে চোখের লজ্জা গঙ্গাজলে ধু'য়ে ফেলে দুর্ব্বার উৎসাহে স্লোগান দিতে লেগে যান, "নব-বৃন্দাবনে বাবু সম্পদভূষণ বৃন্দাবন-বিহারী হয়েছেন, জয় দাও সবে, জয় দাও" বা "নব অযোধ্যায় বাবা আপত্তারণ সীতাপতি হয়েছেন, জয় দাও সবে জয় দাও।" এই এক বিচিত্র বিবর্ত্তনের পথে মাসে একজন ক'রে, বছরে দশ বারো জন ক'রে, নব নব অবতার বা ঈশ্বরীয় পুরুষের আবির্ভাব হচ্ছে আর আয়নাতে ফ্রেম বাঁধাবার দোকানগুলি নিত্য নূতন ঈশ্বর-পুরুষের ছবিতে ভরাট হ'য়ে যাচ্ছে। এর ভিতরে মানুষের ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় সুপ্রকট কিন্তু বহু ঈশ্বর-পুরুষ বা বহু-অবতারের চাপে প'ড়ে প্রকৃতই সাধনেচ্ছু অসংখ্য ভক্তের জন্মে যাচ্ছে দিগ্‌ভ্রম, তাঁদের ইষ্টনিষ্ঠায় আসছে এক অপ্রত্যাশিত নাভিশ্বাস, তাঁদের সাধনকর্ম্মে মেজাজ বস্‌ছে না, তাঁরা সাধন করেও সাধনের

সুতার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কেন মানুষ ভগবান্ হবে না? কিন্তু এক সঙ্গে অনেকগুলি ভগবানের খপ্পরে প'ড়ে গিয়ে এই সব সরলপ্রাণ নরনারী সংশয়-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

অমানব নামে নিষ্ঠা

জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক বলিলেন,—সব আলোচনাই ত' শুন্‌লাম। এখন আমার কর্ত্তব্যটা কি, তা' আগে বলুন। শুনেছি আপনি সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ শিক্ষাদাতা। কাউকে নিজের দলে ভিড়াবার আপনার চেষ্টা নেই। তাই, প্রকৃত সৎপরামর্শ পাব ব'লে অনেক কাজ ফেলেই ছুটে এসেছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিলেন। বলিলেন,—বেশ ত'। সৎপরামর্শটা দিচ্ছি। নিজের মনের কাছেই জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে বের ক'রে নিন যে, কি সেই ভগবানের নাম, যার উচ্চারণ মাত্র কেবল ভগবানের কথাই মনে জাগে, কোনো মানুষের কথা নয়। তারপরে সেই নামটী শক্ত ক'রে ধ'রে কষে সেই নাম ক'রে যেতে থাকুন। ভগবান্ যদি সত্য হন, তবে তাঁর নামও সত্য। তাঁর নাম যদি সত্য হয়, তবে সেই নামে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্বিধায় নির্ভর ক'রে লেগে থাকার শুভফলও সত্য। কোনো গুরু আপনাকে নামটী কাণে শুনিয়ে দেন নি ব'লে কুণ্ঠিত হ'য়ে যাবেন না, একটা নামে লেগে থাকাটাই বড় কথা, নামটী খুঁজে পেয়েছেন, না অন্যে আপনাকে দিয়েছেন, সে কথা গৌণ। সকল প্রকারের

পূর্ব্বসংস্কার বিসর্জ্জন দিয়ে এক নামে লেগে থাকাই সংসিদ্ধি অর্জ্জনের একমাত্র উপায়। প্রয়োজন নামে নিষ্ঠা। নাম চিরস্থায়ী নিত্যমঙ্গলময় মহাবস্তু, ইহার সৃষ্টি নাই, বিলয় নাই, পতন নাই, অভ্যুদয় নাই, সর্ব্বসময়ে নাম জীবের সমান আশ্রয়। এই কথা জেনে জিদ ক'রে সেই নামে ডুবে যান, যে নাম কেবলমাত্র পরমেশ্বরেরই স্মারক, কোনও মানব-লীলা-কারী পুরুষ বা নারীর স্মারক নয়। নামের অমানব সত্তায় মন ডুবল ত' জীবন সার্থক হ'ল।

মনে হইল, জিজ্ঞাসু সজ্জন মনে খুব একটা বল পাইয়াছেন। তিনি প্রণাম করিতে করিতে বারংবার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে সময় নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট বিনয় সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানুষ-পূজার প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক দিক্

চণ্ডীবাবু বলিলেন,—দারুণ এক সমস্যার মীমাংসা ক'রে দিলেন বাবামণি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এটা ত' হ'ল ব্যক্তিগত একজনের একটা সমস্যার সমাধান কিন্তু ব্যাপারটা এর চেয়ে অনেক গুরুতর। এক এক মঠে বা আশ্রমে এক এক জন মহাপুরুষের নাম সংযুক্ত ক'রে মন্ত্রদীক্ষার প্রচলন হয়েছে।

যারা ঐ মঠে বা ঐ আশ্রমে দীক্ষা নেবে, তাদের ঐ ঐ মহাপুরুষের নাম-সংযুক্ত মন্ত্র জপ কত্তে হবে। উদ্দেশ্যটী সাধু। অর্থাৎ প্রত্যহ তিন চারবার ক'রে অধ্যাত্মকর্ম্ম কত্তে ব'সে বারংবার বা অসংখ্যবার ঐ মহাপুরুষের নামটী জপ করার ফলে ঐ মহাপুরুষের প্রতি জাপকের অতীব গভীর ভালবাসাময় এক সুদৃঢ় অনুরাগ উপজাত হবে, যার ফলে সমগ্র জীবনে সাধকের একনিষ্ঠা কদাচ টলবে না বা টলবার সম্ভাবনা একান্তই কমে যাবে। কিন্তু এর দোষ হচ্ছে এই যে, অন্য মঠ বা আশ্রমের কোনও সাধক তোমার মঠে বা আশ্রমে কিছুদিন সৎসঙ্গ লাভের উদ্দেশ্যে এসে বাস কত্তে চাইলে, এমনকি সে যদি নিজের ব্যয় ভার নিজে বহন ক'রেও থাকতে চায়, তবু তুমি তাকে তোমার মঠে বা আশ্রমে থাকবার অনুমতি দেবে না। অবশ্য বড় বড় ধনীদের কাছ থেকে বড় বড় দান পাবার সম্ভাবনা থাক্‌লে কথাটা অন্যরূপ দাঁড়াবে। নতুবা মানুষ-পূজাকারী ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি অন্য প্রতিষ্ঠানের সাধকদের সংসর্গ এভাবে এড়িয়েই চল্‌তে চায়। এই ভাবে এড়াবার চেষ্টার অনেক কারণ থাকতে পারে কিন্তু যে কারণটী ওঁরা মুখে বলতে সাহসী হবেন, সেইটী হচ্ছে এই যে, বাহিরের মঠ-আশ্রমের শিষ্যদের ওঁদের সঙ্গে থাক্‌তে দিলে ওঁদের মঠ-আশ্রমের সেবকদের নিষ্ঠাভঙ্গ ঘটে যেতে পারে। সুতরাং ভিন্ন মঠ বা ভিন্ন আশ্রমের শিষ্যদের জন্য অধিকাংশ মঠ বা আশ্রমেরই দ্বার অবারিত নয়। এটা আমাদের দেশের সামাজিক এক মস্ত ক্ষতি। প্রাতঃস্মরণীয়

মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী একবার সব মঠ ও আশ্রমের কর্ত্তাদের কাছে জান্‌তে চেয়েছিলেন যে, যাবতীয় মঠ ও আশ্রমের মধ্যে একটা সমন্বয় বা একাত্মতা-বোধ সৃষ্টি ক'রে জনকল্যাণকর্ম্মী তাপস-জগতে কি ক'রে এক নূতন ঐক্যবদ্ধ শক্তির উন্মেষ-সাধন করা যায়। আমি আমার মতামত এই দিয়েছিলাম যে, ছোট-বড়র পার্থক্য-বিচার না ক'রে সকল প্রতিষ্ঠান সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাঝে মাঝে কর্ম্মিবিনিময় করে বিভিন্ন সঙ্ঘের কর্ম্মীদের মধ্যে একটা একাত্মতা-বোধের সৃষ্টি আগে করা হোক্, তাহ'লে অতি অল্পকালের মধ্যেই আবিষ্কৃত হ'য়ে যাবে যে, কি সেই সদুপায় যা' অবলম্বন কর্ল্লে সব প্রতিষ্ঠান যে-কোনও সৎ ও মহৎ ব্যাপক কর্ম্মে একযোগে বিনা দ্বিধায় শ্রম ক'রে নিজেরা লাভ কত্তে পারেন অতুল আত্মপ্রসাদ আর দেশকে দিতে পারেন অবিস্মরণীয় পর্য্যায়ের স্থায়ী সেবা। মহারাজা নিজে আমার এই প্রস্তাবে মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়েছিলেন এবং নিজের সর্ব্বসম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডে চলে যাওয়া সত্ত্বেও এই কাজের জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা যোগাড়ও ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু প্রভাবশালী ও প্রতিষ্ঠাবান্ মঠ ও আশ্রমগুলি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা কর্ল্লেন। ফলে যা' হয়ত হ'তে পাত্ত, তা আর হ'ল না।

চণ্ডীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রতিষ্ঠাবান্ মঠ বা আশ্রমগুলির এমন সাধু-প্রস্তাবে আপত্তি করার কি কারণ থাক্‌তে পারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কারণটী হচ্ছে মহাপুরুষ-পূজার প্রতি অত্যধিক আসক্তি। মানুষের নাম সংযুক্ত ক'রে দীক্ষার মন্ত্র তৈরী করা হয়েছে, একথাটা বাইরে ছড়িয়ে পড়ুক, এটা তাঁরা সম্ভবত চান না। আমার দরিদ্র আশ্রমে কত স্থান থেকে কত মতে দীক্ষিত তরুণেরা আস্‌ছে, আমি তাদের দুবেলা দুমুঠো ক'রে খেতে দিতে পারব না জেনেও সাদরে বলছি, বেশ ত', ভাল যদি লাগে, তবে থাকো কিছুদিন আমাদের সঙ্গে, আমাদের সুখে-দুঃখে ভাগ লও, আমাদের হর্ষ ও বিষাদের সঙ্গী হও, আমরা নিজেরা যতটুকু কষ্ট পাব, তার চেয়ে বেশী কষ্ট তোমাদের পেতে দিব না, তোমরা অন্যত্র দীক্ষিত, অন্য এক ধর্ম্মাদর্শে লালিত-পালিত ব'লে তোমাদিগকে ঘৃণা বা বিদ্বেষ আমরা করব না। চণ্ডীবাবু, সত্যি আমাদের আশ্রমের মত এত দরিদ্র আশ্রম আর বেশী হয়ত নেই। আমরা ভিক্ষা করি না, চাঁদা তুলি না, মানুষকে নিজেদের অভাবের কথা জানাই না কিন্তু কেউ অন্যত্র দীক্ষিত ব'লে তাকে বর্জ্জনীয় জ্ঞান করি না। কেন করি না জানো? আমরা যে মন্ত্রে দীক্ষা দেই, সেই মন্ত্রের অঙ্গ বা উপাঙ্গ-রূপে কোনো মানুষের নাম নেই। পরমেশ্বরের অমানব নামে আমাদের নিষ্ঠা, এই জন্য যে-কোনো মানবের যে শিষ্য হোক্ না কেন, অন্য কোনো কারণে যদি সে অবাঞ্ছনীয় না হয়, তবে তেমন লোকটী আমাদের কাছেও বরণ-ডালার

প্রত্যাশা কত্তে পারে। ধর্ম্মসাধনার মধ্য থেকে মানুষের পূজাকে বাদ দিলে বিশ্বের সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে সামাজিকতা সম্ভব, এইটী আমরা বিশ্বাস করি। এই জন্যই নির্দ্দেশ দেওয়া রয়েছে যে, আমার প্রতিষ্ঠিত কোনও আশ্রমে কেউ কখনো পূজার মন্দিরে আমার প্রতিচিত্র স্থাপন কত্তে পার্‌বে না, সেখানে একমাত্র ওঙ্কার-বিগ্রহই থাক্‌বেন।

হাজারিবাগ
১৫ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৪১
(২৯শে মার্চ্চ, ১৯৩৫)

জগন্মঙ্গল যৌগিক পরিভ্রমণের মহত্ত্ব

সূর্য্য উঠিতে না উঠিতেই চণ্ডীবাবু আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রণাম করিলেন। বলিলেন,—আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বিশিষ্ট সন্ন্যাসী, বহু বিদেশ পর্য্যটনকারী সুপ্রচারক এবং খ্যাতিমান্ পুরুষ। তিনি অতীব নিভৃতে আপনার সহিত কিছু আলোচনা কত্তে চান। বিষয় তাঁর ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কোথায়?

চণ্ডীবাবু বলিলেন,—তিনি এই সহরেই আছেন। সময় জানিয়ে পত্র দিলে যথাকালে আস্‌বেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বেলা সাড়ে নয়টায় সময় দিলেন।

যথাকালে মহান্ সন্ন্যাসী শুভাগমন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি,—আসুন বসুন—বলিতেই তিনি বলিলেন,—আমি এসেছি প্রার্থী হ'য়ে, উপায়-প্রার্থী, পন্থানির্দ্দেশের প্রার্থী। আমাকে আপনি না ব'লে তুমি বলুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বেশ ত' তুমিই বল্‌ছি, এস, বস। কিন্তু আমার মতন একজন সাধারণ লোকের কাছে, যার গায়ে গেরুয়া নাই, যার কোনো নামযশ নাই, তার কাছে তোমার মতন একজন নামী সন্ন্যাসীর আসার কারণটা কি হ'ল, তা' ত' আমি বুঝতে পাচ্ছি না ভাই।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—ভাই বল্‌বেন না, বাবা-বাছা বলুন। আমি আপনার সন্তান। কাল সন্ধ্যায় এক ভদ্রলোকের পুনা যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কি কারণে তাঁর কাল সন্ধ্যায় হাজারিবাগ ত্যাগ করা হ'য়ে ওঠে নি। আমি হাজারিবাগ বায়ু-পরিবর্ত্তনে এসেছি শুনে তিনি রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা কর্ল্লেন। তিনি তাঁর কতকগুলি সমস্যার কথা আমাকে বল্‌লেন। সে সমস্যা সাধন-বিষয়ে। সব বলার পরে তিনি বল্লেন যে, দৈবক্রমে আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে এবং আপনি তাঁর সমস্যার সমাধান চমৎকার ভাবে ক'রে দিয়েছেন। তাঁহিতে আপনার খবর জানলাম। তিনি আজ সকালে পুনা রওনা হ'য়ে গেলেন। আমি ভাবলুম, আমার সমস্যার সমাধান যদি আপনি ক'রে দিতে পারেন। আমি পাশ্চাত্য দেশে বেশ কয়েক বৎসর ছিলাম। ভারতীয় আদর্শের প্রচার করেছি।

কিন্তু রক্তমাংসের এই শরীর, ঐ সব স্বাধীন দেশে গিয়ে কল্পনাতীত উৎপীড়ন সহ্য করেছে। সীতা-সাবিত্রীর দেশ ওটা নয়, চিন্তা বা বেহুলারও নয়, একটা জড়বাদী ইন্দ্রিয়মুখ সভ্যতার দেশ, যেখানে মদ্যপান ব্যক্তিমাত্রেরই বল্‌তে গেলে স্বভাব ব্যাপার, যেখানে বাহিরের ভাল ভাল কথা দিয়ে অতীব মন্দ ব্যাপারকে ঢেকে রেখে চলতে পারারই নাম সভ্যতা। স্বাভাবিক ভারতীয় সংস্কারবশে ভারতের ছাত্রেরা বিদেশে গিয়ে যেমন ক'রে অতি কষ্টে নিজেদের চরিত্র বাঁচিয়ে চলে, আমরা সন্ন্যাসীরাও অনেকে কেবল বদ্ধমূল ভারতীয় সংস্কারের বলেই নিজেদের শরীরটাকে অশুচিতার স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে চল্‌তে চেষ্টা করেছি। কিন্তু মনকে ত' বাঁধতে পারি নি। সেই দেশ ছেড়ে চ'লে এসেছি, তবু এখনো সে দেশের চিত্রগুলি মনের মধ্যে আকুলি ব্যাকুলি কচ্ছে এবং প্রতিকর্ম্মে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিয়ে ভবিষ্যৎকে তিমিরাবৃত ক'রে দিচ্ছে। এই সঙ্কটে, সংযম-প্রচারক আপনি, আপনার কাছে কি সহায়তা পেতে পারি, সেই আশাতেই বিনীত শিষ্যের মন নিয়ে এসেছি। যদি আপনার সাধ্যের ভিতরে কোনো উপায় থাকে, তবে প্রত্যাখ্যান কর্ব্বেন না, আশ্রয় দিবেন, এইটিই আশা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উত্তম প্রস্তাব। আসন ক'রে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে চখ বুজে ব'স। ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র অথবা নিজ দীক্ষাপ্রাপ্ত ইষ্টনাম কিয়ৎকাল জপ কর। তারপরে এই

সঙ্কল্পমন্ত্র বারংবার মনে মনে উচ্চারণ কত্তে থাক, "ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি, আমি জগতের মঙ্গলকারী হচ্ছি।"

বেশ কিছুকাল একাজ করিয়া যাইবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ করিলেন জগন্মঙ্গল-পরিভ্রমণের, যাহা ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সুপ্ত আবেদনগুলিকে ঊর্দ্ধগামী করিয়া সাধককে এক নব-দিব্যায়ন প্রদান করে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মে আমার কোনো trade নাই, ধর্ম্ম নিয়ে আমি কোনও ব্যবসায় করি না। এই জন্যই আমার কোনও trade secret বা ব্যবসায়িক গুমরও নাই। যা জানি, তোমাকে অকপটে ব'লে দিলুম, এখন নিয়মিত কাজ ক'রে যাওয়ার ভার তোমার নিজের উপর।

অর্দ্ধ ঘণ্টা সময়ের অভ্যাসেই সন্ন্যাসী মহোদয় উপদেশের অব্যর্থফল-দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন। বলিলেন,—আমি যে কত কৃতজ্ঞ হ'লাম, তা আর কি বলব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি যার জন্য যা'-কিছু কচ্ছি, সবই without any obligation, আমার কাছে কেউ কিছু পেলে, তার জন্য তাকে কৃতজ্ঞতাও স্বীকার কত্তে হয় না। *

* এই সন্ন্যাসী-প্রবর পরের দিনও বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিয়া নিবার জন্য আসিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে এই সন্ন্যাসী এক মহান্ সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। যখনি শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত দেখা হইয়াছে, সকৃতজ্ঞ ভাষায় কৃতকৃতার্থভাবে প্রাপ্ত উপদেশের উপকারিতা ঘোষণা করিয়াছেন।

হাজারিবাগ
১৬ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৪১
(৩০শে মার্চ্চ, ১৯৩৫)

শিক্ষা, সংযম, প্রলোভন

একজনের একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিক্ষা, সংযম এবং শিক্ষানীতি নিয়ে যথেষ্ট ভাববার অবকাশ আছে, প্রয়োজনও আছে। পরস্পর-বিপরীত-ধর্ম্মী দুইটী শিক্ষারীতি চালু আছে। একটীতে বলা হচ্ছে, প্রলোভন থেকে দূরে থাকো, বৃথা প্রলোভনের জালে প'ড়ে জীবনের সর্ব্বনাশ ক'রো না। অন্যটী হচ্ছে, হাজার প্রলোভনের মাঝেও নির্লিপ্ত হ'য়ে চলতে চেষ্টা কর, দু-চারবার পদস্খলন হ'য়ে যায় ত' গেল, তার জন্য হাহুতাশ ক'রে সময় নষ্ট করো না, একবার আছাড় খেয়ে পড়েছ ত' দশবার-লাফিয়ে উঠে বিপুল তেজে নিজ পথ-পরিক্রমা সুরু কর। একটীতে বলা হচ্ছে, শুধু প্রলোভন, শুধু মরীচিকা, শুধু পাপের হাতছানি আর মোহের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে যাব কেন, আমি এ সকল থেকে দূরে থেকেই নিজের জীবন গ'ড়ে তুল্‌ব, নিজের লক্ষ্য সাধন কর্ব্ব। অন্যটীতে বলা হচ্ছে, যুদ্ধ মাত্রেই হারজিৎ আছে কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া বাঁচার রাস্তা কোথায়? সুতরাং প্রলোভনের মাঝেই নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব, এবং যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুকূল থাকে তবে হাজার অপকর্ম্মের ফাঁকে

ফাঁকেও নিজেকে পরম লক্ষ্যে ঠেলে নিতে পার্ব্বই পার্ব্ব। শুনতে কিন্তু দুইটী রীতিই চমৎকার মনে হবে। কিন্তু এমন ভাগ্য কার জীবনে আসে যে, পরিপার্শ্ব সব সময় তার ইচ্ছামতই হতে থাকবে? ফলে, একটা মানুষেরই জীবনে এই দুইটী রীতির আগমন আশ্চর্য্য কিছু নয়। সুতরাং প্রত্যেককে যে-কোনও অবস্থার জন্য তৈরী থেকে জীবনের পথ চলতে হবে। প্রলোভনের কাছে যাব না ব'লে যে দিকটা ছেড়ে সরে এলাম, সেদিকটায় হয়ত আমার কোনো বিপদই হত না,—এমনও ত' হ'তে পারে। আবার, নিরাপদ জ্ঞান ক'রে যেই দিকটাতে এসে আশ্রয় নিলাম, সেইখানেই হয়ত ঘাসের নীচে লুক্কায়িত কালসর্প হঠাৎ ফোঁস্ ক'রে উঠ্‌তে পারে, দংশন কত্তে পারে। সুতরাং প্রলোভন থেকে বাঁচার চেষ্টাও ভাল আবার হঠাৎ প্রলোভন এসে পড়লে নির্ম্মম ও নির্ভীক ভাবে তাকে পায়ে মাড়িয়ে নিজের পথে বীর-বিক্রমে চলে যাওয়াও ভাল। যুদ্ধে পলায়নেরও সম্মানজনক স্থান আছে, দুঃসাহসেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। জীবনযুদ্ধে জয়ী হ'তে হবে, এইটাই হচ্ছে প্রধান কথা। জয় তার, যে অলস নয়, যে বৃথা-কল্পনাপরায়ণ নয়, যে প্রজল্পী নয়, যে বাক্য-বিলাসী নয়, যে নিষ্ঠাবান্, পরিশ্রমী এবং হতাশা বর্জ্জিত নিরলস কর্ম্মী। জয় তোমার হাতের মুঠায়, যদি তুমি লক্ষ্য কখনো না ভোলো। যেখানটায় মানুষ ভুল কিছুতেই কর্ব্বে না ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, হয়ত দৈববশাৎ সেখানেই জীবনের সব চেয়ে বড় ভুল, বড়

পতন, বড় অনাচারটা হ'য়ে গেল। এমন ঘটনা সর্ব্বদাই ত' ঘটছে। চারিদিকেই এমন অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। দৈব, পুরুষকার, হিসাব, আত্ম-বিচার, দোষানুসন্ধান এবং দোষবিদূরণ আদি সকল চেষ্টারই ক্ষণে ক্ষণে ব্যর্থতা প্রায়ই ত' দেখা যায়। সেই দৃশ্যগুলি এমনই হতবুদ্ধিকর যে, তা' দেখার পরে মানুষের মনে আর উৎসাহ থাকতেই চায় না, সর্ব্ব প্রকারের আত্মোন্নতির চেষ্টা যেন উষ্ণতাপে কর্পূরের মত উবে যায়। কিন্তু পরমেশ্বরের চূড়ান্ত অভিপ্রায়টীকে লক্ষ্য ক'রে নিয়ে সকল ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা কত্তেই হবে। জীবন এমনই একটা বস্তু, যার সত্যতা স্বীকার কত্তে হ'লে হতাশাকে নির্ব্বাসন দিতেই হয়। Satan, get thee behind, প্রলোভন, তুমি সামনে এসে দাঁড়িও না, ব'লে সময়বিশেষে ধমক দিয়ে চলা যেমন প্রয়োজন, আয়রে দুর্ম্মতি মায়াবী দানব, তোকে হত্যা ক'রে তোর বুকের রক্তপান ক'রে আমার রণোম্মাদনা শান্ত হবে, একথা ব'লে দুঃসাহসে ভর ক'রে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ারও সময়-বিশেষে তেমন প্রয়োজন।

প্রলোভন ও মনের গঠন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অপূর্ব্ব রূপসীর নবযৌবন-তরঙ্গিত-অনবগুণ্ঠিত নগ্ন চিত্র দেখে কবি ভাবে, কি আশ্চর্য্য, কি সুন্দর, কি মনোহর সুষমা, কি অনবদ্য কান্তি। দার্শনিক

ভাবে, কে ইহার স্রষ্টা, কেমনে ইহার আবির্ভাব, কি এই রূপ-যৌবনের সার্থকতা, কোথায় এর পরিণতি? ভক্ত ভাবুক তাপস ভাবে, মাগো, সর্ব্ব অঙ্গে এমন রূপবিভূতির ছড়াছড়ি ত' কবি-কল্পনায়ও আসে না, তুমি কেমন ক'রে এত সুন্দর হ'লে? তোমার প্রতি অঙ্গে বিশ্বস্রষ্টা যেন নিজেকে বিকশিত ক'রে তুলে ধরেছেন, তাই ত' তুমি তোমার প্রতিটি অঙ্গে দর্শনীয়া, পূজ্যা ও প্রণম্যা! ধন্য আমি যে, তোমাকে তোমার পূর্ণ বিভূতিতে দেখেছি। কিন্তু অন্যেরা? ইতর লোকেরা? নীচ-ধারণা-সম্পন্ন অর্ব্বাচীনেরা? তারা নগ্না নারীর উলঙ্গ মূর্ত্তি দর্শনে কি এরূপ মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হবে? তাদের বরং দুঃখ হবে যে, এটা একটা চিত্র মাত্র কেন, এটা শুধু পটেই আঁকা কেন, কেন এটার রক্তমাংসমেদমজ্জার অস্তিত্ব নেই? কেন এটা চলে না, টলে না, কথা ব'লে মন ভুলায় না, ইঙ্গিতে মুণ্ডপাত করে না? একই দৃশ্য কতজনের মনে কত রকম ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি করে। কোনটা তোমার জীবনের বাধা, তা' ত' নির্দ্ধারিত হবে তোমার মনের গঠন দিয়ে। উলঙ্গিনী কালী-প্রতিমা দর্শনে কামোন্মাদগ্রস্ত হয়, এমন পিশাচ কি জগতে দেখা যায় না?

নির্ব্বিকার মন ও প্রলোভন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনোমোহকর কিছু দেখে বা শুনে মনে লালসা বা উত্তেজনার উদ্রেক হবে কি, না হবে,

তা' অনেক কিছুর উপরে নির্ভর করে। তুমি যদি নানারূপে কদর্য্য চিন্তার অনুশীলনের দ্বারা তোমার মনের মাটিকে লালসার অনুকূল ক'রে গ'ড়ে তুলে থাক, তাহ'লে অতি সহজে তুমি অনুত্তেজক ব্যাপার থেকেও উত্তেজনার মাল-মশলা সংগ্রহ কর্ব্বে। তুমি যদি বিপরীত-ধর্ম্মী চিন্তা দ্বারা মনের মাটিকে কলুষমুক্ত করার চেষ্টা দীর্ঘকাল ধ'রে ক'রে থাক, তাহ'লে তার ফল-স্বরূপে তোমার পক্ষে অত্যন্ত উত্তেজক কারণগুলির প্রভাবকে অতিক্রম ক'রে চলাও সুসাধ্য হবে। আর, তুমি যদি ভাল-মন্দ জ্ঞানের উর্দ্ধে গিয়ে তোমার মনকে এক নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যের স্তরে নিয়ে ফেলতে সমর্থ হ'য়ে থাক, তবে জানবে যে, তুমি সত্যই বাহাদুর। প্রলোভন ও লালসা থেকে বাঁচার সম্ভাবনা তার পক্ষেই বেশী, যে নিজেকে সতর্ক রেখে বিচার ক'রে ক'রে পথ চলেছে কিন্তু প্রলোভন ও লালসা থেকে বাঁচা তার পক্ষে বেশী সহজ, যে উদাসীন, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার।

ভাগ্যবান্ ও বুদ্ধিমান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নির্ব্বিকার মনটীকে পেতে হ'লে উপায়-স্বরূপে ভগবানের নামটী অনুরাগ সহকারে স্মরণ করা এক মস্ত কথা। এক এক জনের মন স্বভাবতই নির্ব্বিকার। এঁরা ভাগ্যবান্ মানুষ। কিন্তু এরূপ মানুষ খুবই দুর্লভ। অধিকাংশ মানুষের মনই হাওয়া-ভরা ফানুসের মত অতি

অল্প বাতাসে উড়ে বেড়ায়। এই উড়ন্তপণা বন্ধ কত্তে হ'লে ভগবন্নামের নোঙর বেঁধে নেওয়া প্রয়োজন। বুদ্ধিমানেরা তাই করেন। ভাগ্যবান্ জগতে আর কয়জন? কিন্তু একটু চেষ্টা কর্ল্লে অধিকাংশ লোকেই বুদ্ধিমান্ হ'তে চেষ্টা কত্তে পারে।

পুপুন্কী আশ্রম
৮ই আষাঢ়, রবিবার, ১৩৪২
(২৩শে জুন, ১৯৩৫)

জনৈক ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবাবামণির জামা-কাপড়ে সাবান দিতেছে। প্রচুর সাবান আশ্রমে ছিল না, অতএব কাচিয়া কাপড় পরিষ্কার করিতে বেশী শ্রম হইতেছে। ব্রহ্মচারী বলিল,—এই ত' সেদিন আশ্রমে এলেন, আবার এখনি ভ্রমণে বেরুবেন? হাজারিবাগের ডাক্তার ভোলানাথ রায় না আপনাকে তিন মাস কাল ইজি-চেয়ারে শুয়ে থাকতে বলেছিলেন!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইজি-চেয়ার ত' একটা চট্টগ্রাম থেকে তৈরী হ'য়ে এসেছিল কিন্তু তাতে শুতে পারলাম কৈ? যেখানে কারণে অকারণে মানুষেরা মানুষকে আঘাত করে, রক্তপাত করে, যেখানে একটা কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গা বা লঙ্কা পর্য্যন্ত চোরের হাত থেকে রক্ষা করা যায় না, যেখানে ঘরে দশটা বা বিশটা টাকা রাখ্তে গেলেও রাত্রে ডাকাতের ভয়ে ঘুমানো যায় না, সেখানে তুমি বল্ছ ইজি-চেয়ারে শুয়ে

বিশ্রাম? তবে দোষটা দেশের নয়, দোষটা সময়ের। যুগটাই এমন যে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিশ্রাম করার উপায় নেই। তার চেয়ে চল বর্ষাকালের সব্জী-বীজের বস্তাটা ঘাড়ে ক'রে আমার সঙ্গে, আমি চারিদিকের চার পাঁচটা গ্রামে আজ বর্ষার তরিতরকারীর বীজ বিতরণ কর্ব্ব। বীজগুলি অনেক দিন হ'ল কলকাতা থেকে কিনে এনে রেখেছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা নাই এই শরীরে। গরুর গাড়ীতে যাব। তুই গিয়ে পাশের গ্রামে থেকে একটা গোযান ভাড়া ক'রে নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণে দুপুরের আহারীয় রুটি কয়খানা তৈরী ক'রে নিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে ঐ গ্রামে উপস্থিত হই। গাড়ী খুঁজতে অনেক সময় যাবে। গাড়ী আশ্রম পর্য্যন্ত আস্বে, তবে আমি যাব, এর মানে দুপুর এখানেই হ'য়ে যাবে। বীজের বস্তাটা সঙ্গে নিয়ে যা। গাড়ী পাওয়া মাত্র তাতে চাপাবি। গাড়ী পেতে পেতে অনেক দেরী হবে। কটা বাড়ীতে বিফলমনোরথ হ'য়ে তবে গাড়ী পাবি, তার স্থিরতা কি?

প্রত্যাশা ও আশাভঙ্গ

ব্রহ্মচারী বলিল,—এত যাদের আগ্রহের অভাব, এত যাদের দরদের অভাব, তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে আবার বিনামূল্যে টাটকা তাজা বীজগুলি বিতরণ কত্তে হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে আমার উপকার কর্ব্বে না,

আমি তারও উপকার কর্ব্ব, এটাই আমার ব্রত। সে যে আমার উপকারটা নিচ্ছে, এটাই ত' এক মস্ত কথা। সে যদি আমার সেবাটা না নিত, তবে আমি কি কত্তে পাত্তাম? আগে আগে যখন আম-কাঁঠালের চমৎকার চমৎকার চারা তৈরী ক'রে ঘরে ঘরে লাগাতে গিয়েছি, তখন অনেকে রাগ দেখাত। এখন বর্ষার সময়ে বীজ নিয়ে গেলে, রাগ দেখায় না, আগ্রহ ক'রে নেয়। অবশ্য, এতে যে কারো কোনো উপকার হচ্ছে, একথা কখনো স্বীকার কত্তে শুনিনি। কিন্তু কৃতজ্ঞতা-ভাষণ শোনার জন্য ত' আর আমি পকেটের পয়সা খরচ ক'রে বীজ কিনে এনে এদের মধ্যে বিতরণ করি না! তাই, এতে আমি দুঃখিত হই না। প্রত্যাশাই পাপ। কারো কাছে প্রত্যাশা করেছ কি মরেছ। প্রত্যাশা থাকলেই আশা-ভঙ্গের বেদনা ভুগতে হয়। আমি নির্দ্বন্দ্ব থাক্‌তে চাই।

বিপ্লব

এক ঘণ্টা পরে শ্রীশ্রীবাবামণি একটা গ্রামের মাথায় পৌঁছিলেন। একটী নবাগত অতিথি আশ্রমে আসিয়াছেন, তিনি পানীয় জলের পাত্রটী হাতে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি গরুর গাড়ীতে চাপিলেন। দুয়ারে দুয়ারে গাড়ী থামিলে, ঘরে ঘরে উচ্ছে, করলা, ঝিঙ্গা, বরবটী, ঢেঁড়শ, শশা, কুমড়া, লাউ প্রভৃতির বীজ প্যাকেটে প্যাকেটে করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি দিয়া যাইতে লাগিলেন। অতিথি

ভদ্রলোক বলিলেন,—এ যে এক বিরাট ব্যাপার দেখ্‌তে পাচ্ছি। পয়সাও ত' আপনার কম খরচ হচ্ছে না। এর ফলে এদেশে কৃষি-বিপ্লব উপস্থিত হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না রে বাবা, বিপ্লব যেখানে সেখানে আসে না। বিপ্লবের জন্যও মাটি তৈরী কত্তে হয়। কত বছর ধ'রেই ত' বীজ বিতরণ করে যাচ্ছি, কিন্তু প্রতি বছরই বীজ দিতে হয় কেন বল ত? এরা একটী বছরও নিজের ঘরের জন্য বীজ নিজে উৎপাদন কর্ব্বে না। বিশ্বগ্রাসী পাবার ক্ষুধার নাম বিপ্লব নয়, বিশ্বব্যাপী সৃষ্টির ক্ষুধা থেকেই বিপ্লব আসে। ঘরে ঘরে প্রচার-কার্য্য ক'রে যাচ্ছি যে, কেউ যদি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বীজ উৎপাদন কত্তে পার, তবে সেটা আমাকে দিয়ে দিও, আমি তার জন্য দাম দেবো। আমি কল্‌কাতার বাজারে ওটা বিক্রী ক'রে আমার টাকাটা তুলে নেবো। অমনি ওরা ব্যাখ্যা করেছে যে আমি ওদের ফাঁকি দিয়ে খাটিয়ে নিয়ে নিজের বীজ-বিক্রয়ের একটী ফলাও ব্যবসায় চালু কত্তে চাই। সুতরাং আমি নিঃশব্দ হ'য়ে গেলাম। নূতন কিছু দেখ্‌লেই যদি ঘাব্‌ড়ে যাও, তবে জান্‌বে, বিপ্লব তোমার দ্বারা হবার নয়। বিপ্লব আছে ব'লেই জগৎটা মানুষের বাসযোগ্য স্থান-রূপে বিদ্যমান আছে। বিপ্লব না থাক্‌লে মানুষের সঙ্কীর্ণতা আর সমাজের গ্লানি দূর হ'ত কিসের বলে? কিন্তু বিপ্লবের জন্য চাই মানবিক মন, চাই

নবনী হৃদয়, চাই কল্পনা-কুশল বুদ্ধিবৃত্তি, চাই ভবিষ্যৎ দেখ্‌তে পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন দৃষ্টিশক্তি।

সব দেশ আর সব জাতি সমান

পর পর দুইটী গ্রামে বীজ-বিতরণ শেষ হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি গ্রামের বাহিরে আসিয়া একটা গাছের ছায়াতলে বসিয়া রুটি-তরকারী খাইয়া লইলেন। সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী ও অতিথিও আহার সমাপন করিলেন। গরুর গাড়ীর চালককে চারিখানা রুটিও একটু তরকারী দেওয়া হইল।

চালক এই বদান্যতা প্রত্যাশা করে নাই। তাহার মনে খুব আনন্দ হইল। সরলপ্রাণ মানুষটী বলিয়া উঠিল,—তবে স্বামীজী আপনি অমুকের বাড়ীতে বেশী বেশী ক'রে সঞ্জীবীজ দিচ্ছিলেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাতে কি হ'ল?

চালক বলিল,—হল না? নিশ্চয়ই হ'ল। চারদিকের দশখানা গ্রামের চাষীরা সবাই ধান-ফসল ঘরে নেবার পরে অল্প অল্প ক'রে ধান দিল আপনার আশ্রমের জন্য। সব লোকের সব ধান এসে জমা হ'ল এই লোকটীর বাড়ীতে। কিন্তু কতক দিন পরে এই ধান এঁরই পরিচিত অন্য একজন সাধুর আশ্রমে চ'লে গেল মানভূম পার হ'য়ে একেবারে হাজারিবাগ জেলাতে। তার বাড়ীতেও আপনি সঞ্জীবীজ বিতরণ করে গেলেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—ওরে, ঐ ধানটা আমার ছিল না ব'লেই হাজারিবাগে চ'লে গেল।

—আপনার ছিল না, কি রকম?

—মানে, ঐ ধানটা আমি ত' কারো কাছে চাই নি যে আমার হবে। কারো বাড়ীতে যদি লোকের ধান প'ড়ে থাকে, তবে তাতে আমার কি? আর, সেই ধান যদি সাধুদের সেবার জন্য হাজারিবাগ জেলাতে চ'লে গিয়ে থাকে, তবে তাতেই বা আমার আফশোষ কি?

সঙ্গীয় অতিথি-ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। বলিলেন,—আমাদের দেশ হ'লে কখ্‌খনো এরকম হ'তে পাত্ত না। এদেশটা ত' বড়ই নচ্ছার দেখ্‌ছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভুল বল্‌ছ। পৃথিবীর সব দেশই সমান সুন্দর আবার পৃথিবীর সব দেশই সমান নচ্ছার। আশ্রমের নাম ক'রে কেউ কয়লার খনিগুলিতে গিয়ে টাকা তুলছে, চাল তুলছে, সেই চাল নিজের ঘরে রান্না ক'রে খাচ্ছে, সেই টাকা নিজের কাজে ব্যয় কচ্ছে,—এরকম ঘটনা তোমার দেশেও ঘটে, এই দেশেও ঘটে। তবে সে দেশে কলিয়ারি নেই, আছে চা-বাগিচা, এখানে চা-বাগিচা নেই আছে কয়লার খনি। সব দেশ সমান ভাল, সব দেশ সমান মন্দ, জান্‌বে। কাউকে দেশ তুলে আর জাত তুলে কখনো নিন্দা কর্ব্বে না। মানুষের ব্যক্তিগত দোষের জন্য তার জাতকে বা দেশকে ছোট জ্ঞান কত্তে নেই। কোন মানুষের

ব্যক্তিগত গুণোৎকর্ষ বা মহত্ত্বের জন্য যদি তার জাতকে বা দেশকে সম্মান করা সঙ্গত মনে কর, তবে সেটা ভাল কথা।

ভক্তি ও কর্ম্ম

প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যে ঝড়ের বাতাস বহিতেছে। তথাপি শরীরিক ক্লান্তি হেতু সকলে বৃক্ষতলে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন এবং তৎপরে পর পর অন্য তিনটী গ্রামে আসিলেন। সন্ধ্যাকালে যে গ্রামটীতে আসিলেন, সেখানে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। প্রত্যেক গৃহ হইতে কুল-ললনারা ধূপপ্রদীপ নিয়া আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল এবং কেহ কেহ উলুধ্বনি করিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেমন হে, দেখ্‌লে কাণ্ডখানা?

অতিথি ভদ্রলোক বলিলেন,—বাঃ! এরা ত' চমৎকার ভক্তিমতী।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—অতি ভক্তি আবার চোরের লক্ষণ না হয়। বীজগুলি সব নিয়ে যদি কেবল ধূপ-প্রদীপে তার আরতিই চলে, তাহ'লে এই বীজ সবই যাবে ইঁদুরের পেটে, একটাও মাটিতে পোতা হবে না।

স্থানীয় কর্ম্ম ও স্থানীয় কর্ম্মী

পল্লীটার নাম কামনাগড়া।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গ্রাম না ব'লে একটা পাড়া

বল্লেও হয়। কিন্তু বড় ভাল গ্রাম। স্ত্রীপুরুষ-বালকবৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সকলের মনে একটা বিনম্র ভক্তিভাব দেখে মনটা খুশীতে ভ'রে যায়। কিন্তু হায়, এরা দরিদ্র। দরিদ্রের মনে সৎপ্রেরণা জাগে আর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। দারিদ্র্য এক মহাব্যাধি, অজগর সাপের মতন আস্তে আস্তে সমগ্র দেশকে সমগ্র জাতিকে গ্রাস ক'রে ফেলছে। কিসে এরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই দিয়ে জীবন-যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারে, তার প্রেরণা দেওয়াই আমার কাজ কিন্তু স্থানীয় লোকের মধ্যে সহকর্ম্মীত্ব করার লোক মিলছে না। কুমিল্লা, চট্টগ্রাম আর ঢাকা থেকে কর্ম্মী এনে এদেশের কাজ চালানো শক্ত ব্যাপার। স্থানীয় কর্ম্মীরা স্থানীয় সৎকর্ম্মে উদ্যোগী হ'লে তবেই কাজ চালু হয়, স্থায়ী হয়, ব্যাপক হয়।

কর্ম্মীর কি কি চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অন্তর জুড়ে ত্যাগবুদ্ধি আর নিঃস্বার্থ সেবার প্রেরণা না এলে কেউ কর্ম্মী হ'তে পারে না। কর্ম্মীর চাই ত্যাগ, কর্ম্মীর চাই নিঃস্বার্থপরতা, কর্ম্মীর চাই সেবাব্রত। সেই কর্ম্মীই আমরা আমাদের আশ্রমটাতে তৈরী করার চেষ্টা কচ্ছি। কিন্তু লোকগুলিকে যে খেতে দিতে হবে রে বাপু। না-খেয়ে কেউ আশ্রমবাস কত্তে পারে না। সেই খাবারটা আসবে কোথা থেকে? আমি ত' চাঁদা তুলি না, "তোমরা আমাকে অযাচিত ভাবে দান কর" একথা মুখে

বলা ত' দূরের কথা, আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করাও আমার পক্ষে অবৈধ। আশ্রমের কোথায় অভাব, কি অভাব, তারও বিবৃতি প্রকাশ্যে বা গোপনে, খোলা মেজাজে বা কৌশল-সহকারে রেখে-ঢেকে বলাও আমার আচরিত নীতির বিরোধী। সুতরাং বাইরে থেকে কর্ম্মী আনতে হ'লে ব্যয়ের বোঝাটা আমারই স্কন্ধে চাপে। স্থানীয় লোকদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে, যাদের আশ্রমে খেতে দিলে তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে অভিলষিত প্রচার-কার্য্য ক'রে জন-মানসে দারিদ্র্য-বিদূরণের কঠোর সঙ্কল্প সৃষ্টি ক'রে দিয়ে আস্‌তে পারে। কিন্তু এদেশের ক্ষুধাবৃদ্ধিকর আবহাওয়াতে প্রতিপালিত মনুষ্যের পেট এক বেলাতে আড়াই-পোয়া চালের অন্নে ভরে না। কোন সাহসে সে ব্যবস্থা কর্ব্ব? কাজ করার জন্য কর্ম্মী চাই, এটাও সত্য, কর্ম্মীদের অন্নের ব্যবস্থা আমার এখানে হ'য়ে ওঠে নি, এটাও সত্য। বিপত্তিটা এইখানে।

অভিক্ষার পঞ্চতপা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্রীহট্টে এক মাসের মতন ছিলাম। একুশ দিন বক্তৃতা দিয়েছি। কোথাও গিয়ে চাঁদা তোলার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু শ্রীহট্টের লোক বড় গুণগ্রাহী। সভাস্থলে আমার বই বিক্রী হয়েছে দেড় হাজার টাকার উপর। এই টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে পুপুন্‌কীতে পাঠিয়ে দিয়েছি। টাকা না পেলে আশ্রমের কর্ম্মীগুলি চাল-ডাল কিনবে কি

দিয়ে? এখানে কে আছে যে, তাদের আহার্য্যের কথা ভাব্‌বে? আশ্রমে তারা গাইতি-কোদাল নিয়ে প্রাণপণে খেটে কৃষি করার চেষ্টা করে, সূর্য্যাস্ত হবার পরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব কৃষিজাত বস্তু কোথায় যে উধাও হ'য়ে যায়, কেউ জানে না। এ যেন ত্রেতাযুগের দণ্ডকারণ্যে রাক্ষস আর কবন্ধ দ্বারা পরিবেষ্টিত জীর্ণ-কুটীরে বাস। এখনো আমাদের শোবার ঘরখানা তৈরী হয় নি, এখনো আমাদের রান্না ঘরখানা নড়বড় কচ্ছে। এখনো আমাদের সঙ্কল্পিত পেয়ারা বাগানের গর্ত্তগুলিও ভাল ক'রে গোবর-সার দিতে পারিনি, বেড়া দিয়ে উঠ্‌তে পারিনি, কিন্তু একদিকে উনানে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে, আর কর্ম্মীদের জঠরে আগুন জ্বলছে সকলের দৃষ্টির অগোচরে। দুই দিকের আগুনের মাঝে ব'সে আমি নির্ব্বিকার চিত্তে আমার অভিক্ষার .পঞ্চতপা সাধন কচ্ছি।

পুপুন্‌কী আশ্রমে ফিরিতে ফিরিতে রাত্রি হইল। স্নান সারিয়া উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শরীরটা ভাল লাগ্‌ছে না রে। আজ আর রাত্রে খাব না।

বর্দ্ধমান

৯ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৪২

(২৪শে জুন, ১৯৩৫)

শ্রীশ্রীবাবামণি বিশ্রামের উদ্দেশ্যেই পুপুন্‌কী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্রাম সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। পর পর কতকগুলি উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটিয়া সর্ব্বপ্রকার শারীরিক

শক্তি অপহরণ করিয়াছে। তাই, তিনি বিশ্রামের জন্য পুপুন্‌কী বসিয়া থাকা অপেক্ষা বাহিরে গিয়া কাজ করাই অধিকতর সঙ্গত মনে করিলেন। পূর্ব্বদিন সায়ংকালেই প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র বাঁধা-ছাদা শেষ হইয়াছে। শেষ রাত্রে উঠিয়া কতিপয় পত্র লিখিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি মশারি ও কম্বল বাঁধিয়া বর্দ্ধমান রওনা হইলেন। দুপুরের পরে বর্দ্ধমান পৌঁছিলেন। বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন, শ্রীযুক্ত ভবানীদাস মজুমদারের সাদর আহ্বানে। ইনি স্থানীয় মোক্তার-বারের সভাপতি এবং সহরের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি।

অতি-কথার বিপদ

ভবানীবাবুর পুত্র উদীয়মান উকিল শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন মজুমদারকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুদিন মাত্র ভাষণ দিতে ইচ্ছুক আছি কিন্তু শ্রোতারা শুন্‌তে চাহিলে সাত দিনেও আপত্তি নাই। হাতে আমার সাত দিনের মতই সময় আছে।

শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন মজুমদার বলিলেন,—এটা ত' বর্দ্ধমানের পক্ষে মহাভাগ্যের কথা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু অতি-কথারও বিপদ আছে। বেশী কথা বললে বক্তার হয় বলহানি তথা আয়ুঃক্ষয়। বেশী কথা শুনলে শ্রোতার আসে ধৈর্য্যচ্যুতি ও বিরক্তি, নয়ত শক্লগ্রাহিতা ও মনোনিবেশের অভাব। বক্তব্য বিষয়কে

মনোহারী করবার জন্য বক্তাকে নিতে হয় বক্তীর আশ্রয়। সুচতুর বক্তা বাগ্-বিভূতির মহিমায় মানুষকে হয়ত সভাক্ষেত্রে দৃঢ়-রূপে আবদ্ধই ক'রে রাখতে পারলেন কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যহীন সাধারণ শ্রোতা শুধু কথাই শুনল আর বাহবা দিল, হাততালি দিল, একটী কথারও সারমর্ম্ম মস্তিষ্কে ধারণ ক'রে তারপরে সভাস্থল ত্যাগ করল না, এই বিপদটীর বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কিশোরগঞ্জে বক্তৃতা দেবার সময়েই আমি বুঝেছিলাম যে, শ্রোতাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সভাস্থলে আট্‌কে রাখা যায়, ঢাকাতে বক্তৃতা দেবার সময়ে আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলাম যে, ভগবানের করুণা থাক্‌লে সকল রকমের শ্রোতাকে দিনের পর দিন বেঁধে রাখা যায়, শ্রীহট্টের বক্তৃতার সময়ে এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় হয়েছে যে, পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক্ না কেন ভাষা-লক্ষীর আকর্ষণীয় শক্তি জগতে অপরাজেয় কিন্তু এত যে ব'লে যাচ্ছি, গ্রহণ কচ্ছে কে? ছিদ্রযুক্ত পাত্রে কি জলকে কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পারে? অনেক কথা শুন্‌তে শুন্‌তে শোনারই একটা নেশা এসে যায়, করার আগ্রহ ক'মে যায়। অতিকথার আসল দোষটা এখানে। কম কথা বল্লেও মানুষ কাজ করে, এমন অবস্থাটা যখন আস্‌বে, তখন অতিকথার প্রয়োজনই থাক্‌বে না। সেই দিনটারই আমি প্রতীক্ষা কচ্ছি, যেই দিন কম কথায় বেশী কাজ হবে, বেশী কথার প্রয়োজন হবে না। কথা না বল্লে চলে না কিন্তু অতি-কথার অনেক দোষ।

অতিকথার বিশেষ দোষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অতিকথার সব চেয়ে বড় দোষ দুটী, একটী দোষ বর্ত্তায় বক্তার উপরে, অপরটী বর্ত্তায় শ্রোতার উপরে। অনেক কথা শুন্‌তে শুন্‌তে শ্রোতার কাছে কথার দাম কমে যায়। কথার যদি দাম কমে, তবে সে কথা কে তার নিজের জীবন-কর্ম্মে লাগাবে? অনেক কথা বল্‌তে বল্‌তে বক্তার ভিতরে অহঙ্কার এসে যায়, নিজের অধীত কত বড় বড় বিদ্যার জাহাজ যে খালাস ক'রে দিয়ে সে শ্রোতাদের হতভম্ব ক'রে দিচ্ছে, এই কথা ভেবে সে মনে মনে বড়ই গর্ব্বিত হয়। এই গর্ব্ব তার নিজের নিকটে নিজের মূল্য কমিয়ে দেয়। ফলে, সে কেবল কথার জন্যই কথা বলে, কাজের জন্য কথা বলে না। অতিকথার সবচেয়ে বড় বিপদ হ'ল এইটী।

প্রাচীনের শ্রেষ্ঠত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের দেশের চির-প্রচলিত প্রাচীন প্রথাটী এর তুলনায় অনেক দিক্ দিয়েই ভাল। আমাদের প্রাচীনের অনেক প্রথাই খুব ভাল কিন্তু আমরা আলস্য ক'রে তা' ছেড়ে দিয়েছি বা অজ্ঞতাবশতঃ অবহেলা করেছি। সভাস্থলে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে বিদ্যার বহর দেখাবার জন্য বক্তৃতা করার চেয়ে অনেক অধিকতর ফলোপধায়ক উপায়

ছিল আমাদের পাঠ ও স্বাধ্যায়। একটী শাস্ত্র-গ্রন্থকে বা শাস্ত্রতুল্য গ্রন্থকে পাঠের আধার-রূপে গ্রহণ ক'রে তা' থেকে পাঠ ক'রে শুনান হ'ত এবং প্রয়োজন-স্থলে তার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় দুই চারিটি হিতবাক্য শ্রবণ করান হ'ত। মাতৃ-ভাষায় লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থ হ'লে ত' তা' পাঠ ক'রে শুনানই যথেষ্ট হ'ত। পয়ারে বা অন্য ছন্দে রচিত হ'লে সুর ক'রে শোনানও চল্‌ত। এতে পাঠকের পাণ্ডিত্যের অহমিকা বা বিদ্যাবত্তার গর্ব্ব আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ হ'ত কম, অথচ শ্রোতারা কথা শুনে সত্য সত্য লাভবান্ হ'ত, কারণ, সহজে তার মর্ম্ম তারা বুঝতে পারত।

অখণ্ড-সংহিতা-পাঠ-প্রকল্প

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই জন্যই আমি পূর্ব্ববঙ্গের রহিমপুরে আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কর্ম্মীদের পাঠিয়ে বা তৎতৎ অঞ্চলের কর্ম্মীদের সহায়তা নিয়ে আমার দিনলিপির সঙ্কলিত অংশ-সমূহকে গ্রামে গ্রামে পাঠ ক'রে শুনাতে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। দেখা গেল, লম্বা লম্বা বক্তৃতা শোনার চেয়ে এই সব ছোট ছোট সন্দর্ভ পাঠ কত্তে পাঠকের সফলতা ও আগ্রহ অনেক প্রবল আর শ্রবণ কত্তে শ্রোতার আনন্দ এবং উৎসাহ অনেক বেশী। তাই, আমি মনে মনে ভাবছি যে, ভবিষ্যতে আমি বক্তৃতা দেওয়া ছেড়েই দিব, যদিও আপাততঃ তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

শিক্ষা ও প্রাচীন পদ্ধতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাচীন পদ্ধতির কত যে ভাল ভাল জিনিষ আমরা পরিবর্জ্জন করেছি, তা' ভাব্‌লে মনে দুঃখ হয়। প্রাচীনকালে বিদ্যার্থীরা বিদ্যা ও অন্ন দুইটাই গুরুগৃহে পেত,—বিদ্যা পেত গুরুর অনুগ্রহে, অন্ন পেত নিজের পরিশ্রমে। সে প্রথাটা আজ নেই। যদি থাকত, তাহ'লে শিক্ষা-সমস্যার অর্দ্ধেক সমাধান এর দ্বারাই হ'য়ে যেত। প্রাচীন গুরুগৃহে, এমনকি এই সেদিনকার চতুষ্পাঠীগুলিতে পর্য্যন্ত, উচ্চমানের বিদ্যার্থীরা নিম্নমানের বিদ্যার্থীদিগকে পড়াত। এতে তাদের শিক্ষা হ'ত পোক্ত, শিক্ষকের অভাবটা হ'ত পরিপূরিত। সে প্রথা আজ নেই, কিন্তু পুনরায় সেই প্রথাতে ফিরে যাবার সামর্থ্যের মধ্যে নিহিত আছে আমাদের শিক্ষা-জগৎ-সম্পর্কিত সকল বিপদ-আপদ বিদূরণের সোণার কাঠি। প্রাচীনকে আমরা যত বেশী অবজ্ঞা কচ্ছি, তত আমরা বেশী ক'রে অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি এবং সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীর স্থিতিস্থান স্থির করা হইয়াছে শ্যামসাগরের পূর্ব্বতীরস্থ হরিসভাতে। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানটীর তত্ত্বাবধান করেন এবং এখানে সংস্কৃত-শিক্ষার্থীদিগকে নানা শাস্ত্রে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—স্বামীজী, আপনিও এলেন, আবার

আর একজন অসাধারণ যোগশক্তিসম্পন্ন বিভূতিমান পুরুষও এই সময়েই বর্দ্ধমানে এসেছেন। একটা অসুবিধার ব্যাপার হ'ল।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি অসুবিধা, পণ্ডিত মশায়?

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—অসুবিধাটা এই যে, বিভূতি-দর্শনেচ্ছু জন-সাধারণ ঐ দিকেই ঝুঁকে পড়বেন, এদিকটা তেমন মাড়াবেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—সে ত' ভালই হ'ল। ভিড় কম হ'লে আস্তে আস্তে কথা বল্‌ব। বেশী হ'লে ত' চীৎকার ক'রে কথা বল্‌তে হ'ত।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—আপনি যে কি বল্‌তে এসেছেন, তা' আমি ভাল ভাবেই জানি। সরোজ বাবুর মুখে আমি আপনার শ্রীহট্টের বক্তৃতাগুলির বিবরণ শুনেছি। সে সব বক্তৃতার খবর অমৃত বাজার পত্রিকায় নাকি প্রকাশিত হয়েছিল। এসব কথা শোনার প্রয়োজন দেশবাসীর সত্যই আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ একজন সত্যিকারের সাধক-লোক বা সিদ্ধপুরুষ এই সহরে এসে থাক্‌লে তাঁর পদরজঃস্পর্শে শত শত বিক্ষিপ্তমনা মানুষের মনে একাগ্রতা আস্‌বে। তার ফল পরম শুভ। সে সব লোকেরা যদি কোথাও এসে সৎকথা শুনতে পায়, তবে তারা বেশী লাভবান্

হবে। যে মহাপুরুষ বর্দ্ধমানে এসেছেন ব'লে আপনি মনে মনে শঙ্কা পোষণ কচ্ছেন, আমার মতে, তিনি যদি সত্যিকারের সৎ-পুরুষ হ'য়ে থাকেন, তবে তিনি মাটির মানুষগুলিকে সোণার মানুষে পরিণত ক'রে দিয়ে যাবেন। আমি সেই সব সোণার মানুষদের পেয়ে গেলে অল্প কথায় বেশী কাজ কত্তে পার্ব্ব। দেশের যে দুর্গতি যাচ্ছে না, তার কারণ এই নয় যে, আমাদের দেশে বক্তৃতা আর উপদেশ-দান খুব কম হয়েছে। আমাদের অনুন্নতির সব চেয়ে বড় কারণ এই যে, আমরা সুগ্রাহী সুপাত্র সৃষ্টি কত্তে পাচ্ছি না। বক্তৃতা দিচ্ছি কিন্তু কেউ কথা ধ'রে রাখবার যোগ্যতা অর্জ্জন কচ্ছে না। প্রকৃত মহাপুরুষের সঙ্গ-লাভের গুণে যদি সেই যোগ্যতা কারো কারো এসে যায়, তবে তারাই ত' হবে আমাদের অভীপ্সিত শ্রোতা।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি পণ্ডিত-মহাশয়কে একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন,—আমার প্রতি আপনার দরদ দেখে মুগ্ধ হ'লাম। এই ভালবাসা দেখে আমার ভালবাসাও আপনার দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রেমই প্রেমকে সৃষ্টি করে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার কর্ম্মপদ্ধতি কি জানেন? কারো সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা। নিজের কাজ নিজে ক'রে যাব কিন্তু অন্য কেউ কাজ কত্তে এলে তার কাজে কোনও

বিঘ্ন উৎপাদন কর্ব্ব না। এই জন্যই আমি যদি আগে থেকে জান্‌তে পাই যে, কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অন্য কোনও সজ্জন, সংঘ, সমিতি, মঠ, মিশন, আশ্রম বা প্রতিষ্ঠান এসে কাজ ধরেছেন, তাহ'লে সেই স্থানটী বাদ দিয়ে আমি আমার ভ্রমণ-তালিকা তৈরী করি। কারণ, এঁরাই ত' এই অঞ্চলে জীবহিত-সাধনের জন্য কাজ কচ্ছেন, তবে আমি আবার ওখানে গিয়ে ভিড় বাড়াই কেন? সব মঠ, সব মিশন জগতের কোনও না কোনও স্থানে কাজ কচ্ছেন। আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে, একা আমি সমগ্র জগতের সব জায়গায় কাজ কত্তে পারব। সুতরাং তাঁরা যেখানে যে কাজ কচ্ছেন, তা' তাঁ'দিগকে বিনা বাধায় কত্তে দেওয়া সঙ্গত। কারো কাজের মাঝখানে একটা বিঘ্ন বা দ্বিধা সৃষ্টি করা আমি সৎ বা সঙ্গত কাজ ব'লে মনে করি না। সাধুতে সাধুতে লড়াই বাঁধে তখন, যখন শিষ্য-সংখ্যা বর্দ্ধনের দিকে সাধুদের মন যায়। আমার ঐ দিকে মন নাই। তাই, কারো কাজকে আমি বিরুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখি না।

একটী বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের তরফ হইতে একজন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে একটী প্রস্তাব নিয়া আসিলেন যে, ঐ বালিকা-বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীবাবামণিকে একটী ভাষণ দিতে হইবে। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন যে, ভবানীদাস বাবুর সহিত পরামর্শান্তে মতামত জানানো হইবে।

চিরকৌমার্য্যের আদর্শ প্রচার কি আবশ্যক

ভদ্রলোক একটী কথা বলিলেন। বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় দুই একজন আশঙ্কা করিতেছেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণি বালিকাদিগকে আবার চিরকৌমার্য্য ব্রতধারণের উপদেশ দিয়া না বসেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কি বালক, কি বালিকা, কাহারও পক্ষেই চিরকৌমার্য্য একটা বাধ্যকর আদর্শ হ'তে পারে না। সৃষ্টির স্বাভাবিক ধারায় মানুষ যে ভাবে এই জগতে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার প্রতিকূলতা ক'রে নিজেদের বংশ-বিলোপ একটা সর্ব্বজনীন আদর্শ ব'লে পরিগৃহীত হ'তে নিশ্চয়ই পারে না। কিন্তু কিছু কিছু পুরুষ বা নারী সাংসারিক জীবন-যাত্রা গ্রহণ না ক'রে অকৃতদার বা চিরব্রহ্মচারী রয়ে গেলেন, এটার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। বৃহত্তর সুখের লক্ষ্যে কিছু মানুষ চিরকালই ক্ষুদ্রতর সুখকে বিসর্জ্জন দিয়েছে, এটাও মানবজীবনের একটী সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। বৃহত্তর পাওয়ার জন্য ক্ষুদ্রতরকে ত্যাগ মানব-জীবনের এক স্বাভাবিক রূপান্তর, যে রূপান্তর পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের জীবনে প্রত্যাশা করা যায় না। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ স্বভাবের পীড়নে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে কতকগুলি কাজ ক'রে বিপুল সৃষ্টিকে বিপুলতর করার অভিনিবেশে লেগেই আছে,

ইচ্ছা করলেও তারা সংযম অবলম্বন কত্তে পারে না। মানুষ তা' পারে। ইচ্ছা প্রবল হ'লে মানুষ অতীব দুর্দ্দমনীয় ভোগাকাঙ্ক্ষাকে অনায়াসে দমন ক'রে চল্‌তে পারে। এই দমন-চেষ্টাকে সফল করার জন্য ধারাবাহিক যে সাধনা তাকে মনের দিক দিয়ে কত্তে হবে, তারও ক্রম সে পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতার ফলে আবিষ্কার কত্তে সমর্থ হয়েছে। হাজার জনে এই একই চেষ্টা কত্তে গিয়ে বারংবার বিফল হ'য়ে হ'য়েও হাল ছেড়ে দেয় নি এবং পরিণামে বিজয় লাভ করেছে, এই ইতিহাস সে গড়্‌তে পেরেছে। এই ইতিহাসকে বদ্ধমূল সংস্কার-রূপে অসংখ্য তরুণ পুরুষ ও নারীর উদ্দাম-বাসনা-ব্যাকুল মনের উপরে সে প্রতিষ্ঠা ক'রে দিতে পেরেছে। মানুষের এক সুমহৎ কৃতিত্ব এইখানে। সে কেবল অতীত জ্ঞানকে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জন্য সহজলভ্য ক'রেই ছেড়ে দেয় নি, সে অতীত সাধনার সংস্কারকে ভাবী মানুষের মস্তিষ্কের উপরে সুচিহ্নিত ক'রে দিয়েছে। ফলে, কিছু কিছু মানুষ নিশ্চয়ই চিরকৌমার্য্যের প্রতি আপনা আপনি আকৃষ্ট হবে, এজন্য পৃথক্ প্রচারণার ত' কোনো আবশ্যকতাই নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মেয়েদের স্বভাবতই বাৎসল্য-ভাব খুব প্রবল। এজন্য অধিকাংশ মেয়েই সংসারী জীবনের প্রতিই প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু এমন অনেক মেয়ে থাকে, যাদের বাৎসল্য ভাব একটী দুটী পাত্রেই তৃপ্ত হয় না, তাদের বাৎসল্য-স্নেহ জগতের লক্ষ লক্ষ লোকের উপরে

পতিত হয়। কোনো কোনো মেয়ে এই সর্ব্বব্যাপিনী সন্তান-বৎসলতার স্বভাবটী নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তাদের মন জগতের সব শিশুর প্রতি করুণা-কোমল আবেগ নিয়ে ধাবিত হয়। তারা যদি পাকে-চক্রে বা ঘটনার বশে সংসারী হ'য়েও পড়ে, এবং এমনকি নিজ গর্ভজাত দু একটী সন্তানের জননীও হ'য়ে পড়ে, তবু তাদের মন বিশ্ববাসী সকল শিশুর প্রতি সমান আবেগে ধাবিত হ'তে থাকে। তারা আর ঘরের কোণে ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌তে পারে না। এমন দৃষ্টান্ত এ জগতে অনেক আছে, আমাদের এই দেশেও অনেক রয়েছে। কিন্তু পরিণামে যাকে সত্য সত্যই সহস্র সহস্র মানুষের মাতৃহারা সন্তানদের কথা ভাব্‌তেই হবে, তাকে জোর ক'রে বিবাহ দিয়ে সংসারী ক'রে দেওয়ারও কোনো মানে হয় না। মেয়েদের জীবনের সার্থকতা তাদের সেবায়, সেই সেবা যে প্রতিটি মেয়েই বিবাহ ক'রে সংসারী হ'য়েই জগৎকে দেবে, এমন বাঁধাধরা আইনের কোন্ প্রয়োজন আছে? স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক ভগিনী নিবেদিতাকে শিষ্যারূপে গ্রহণ করার ঘটনাটী এই ব্যাপারে আমাদের দেশে একটী নূতন পথ-নির্দ্দেশের সূচক। পাশ্চাত্য দেশে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মপ্রচারের ফলে যে শত শত কুমারী চিরকৌমার্য্যকে জীবনের শাশ্বত আদর্শ-রূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেটা একেবারে নিরর্থক আত্মনির্য্যাতন নয়। তার বিরাট সার্থকতাও রয়েছে। দেশ ত' দিনের পর দিন কেবলই ভোগবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

অদূর ভবিষ্যতে দেশের মেয়েদের মন কোন্ অন্ধকূপে ডুব্‌বে, তা' আজ অধঃপতনের গতিহার দেখে অনুমানও করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় কাছে-ভিতে দুচার দশটা চিরকৌমার্য্যধারিণী সত্যব্রতিনী শুচিশুদ্ধা ব্রহ্মচারিণীর পবিত্র মূরতি সহস্র সহস্র প্রাণে সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে আলোক-স্তম্ভের ন্যায় কাজ কর্ব্বে। যত জন পারে, সংসারী হোক্ কিন্তু দেশে ও জগতে চিরকৌমার্য্যব্রতধারিণী মহীয়সী মহিলার নিশ্চিতই প্রয়োজন আছে।

রাত্রে প্রচুর অবসর। দুই তিন জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছাড়া আর কেহ দর্শন-লাভার্থ আসেন নাই। শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

ব্রাহ্মণের আবার ভয় কিসের

জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ ত্যাগের আদর্শ, ভোগের নয়। এজন্যই ব্রাহ্মণের বিলুপ্তি কখনো ঘটতে পারে না। ভোগবান নিজেকে নিজে গ্রাস করে। ভোগাকাঙ্ক্ষা ছিন্নমস্তার মতন নিজের রুধিরে নিজেকে নন্দিত করে। যতক্ষণ ব্রাহ্মণ ত্যাগের উপরে প্রতিষ্ঠিত, ততক্ষণ তাঁকে কেউ পদচ্যুত কর্ত্তে সমর্থ হবে না। চারিদিকে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যে বিপুল আন্দোলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তা' ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে নয়, তা' হচ্ছে ব্রাহ্মণ নামটীর আড়ালে থেকে কর্ম্ম-শূদ্রেরা অন্যের কাছ

থেকে যে অন্যায় সুযোগ, সুবিধা, সম্মান ও প্রাধান্য আদায় করার অপচেষ্টা বা ভ্রান্ত শ্রম কচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে। সমাজ-সংস্কার-পন্থীদের ব্রাহ্মণ-বিরোধী কোনো আন্দোলনেই প্রকৃত ব্রাহ্মণের একটু মাত্রও ঘাবড়াবার প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণের আবার ভয়-কিসের? ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা প্রকৃত ব্রাহ্মণ হবার চেষ্টা করুন, এইটাই মাত্র তাঁদের প্রয়োজন। সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী আর সাত্ত্বিক-বোধ-সম্পন্ন নির্লোভ ব্রাহ্মণ যতক্ষণ এদেশের মাটিতে একটীও জীবিত আছেন, ততদিন তাঁদের পদধূলির বলেই মরণোন্মুখ চিররুগ্ন আমরা বারংবার নবজীবন লাভ ক'রে পুনরুত্থিত হব, আমাদিগকে জগতের কোনও শক্তি কদাচ নির্ম্মূল কত্তে পার্ব্বে না।

চাই ফাঁকি-হীন কর্ম্মী

কুমিল্লা জেলান্তর্গত মূলগ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজে কাজে নামিয়া গেলে দেখিবে, সহকর্ম্মী অনেক সময়ে না চাহিতেও মিলে। নিজের কাজে কণামাত্রও ফাঁকি না থাকিলে সৎ-সহকর্ম্মী সহজে মিলে। নিজে যদি ফাঁকির মধ্যে পা গলাও, তবে দেখিবে সহকর্ম্মীরা ফাঁকির তলায় মাথা পর্য্যন্ত ডুবহিয়া দিবে। এক ফাঁকি সহস্র ফাঁকিকে প্রসব করে। নিজেকে বা জগদ্বাসী অপর কাহাকেও কদাচ ফাঁকি দেওয়া হইবে না, এই পণ নিয়া যে যতটুকু পার, পরিবেশকে

পরিশোধিততর করিবার উদ্দেশ্যে কাজ কর। কাজের ধারাবাহিকতাকে কখনো দীর্ঘ বিরতির দ্বারা নষ্ট হইতে দিও না। উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে সর্ব্বদা ঐক্যবদ্ধ হইয়া বা একটী সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীন করিয়া বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করিয়া যাইবার জন্য প্রেরণা দিবে।

"তোমাদের প্রত্যেককে এক একখানা করিয়া আলাদা আলাদা পত্র লিখিতে মনে সাধ জাগে কিন্তু সময়েই কুলাইতে পারি না। শ্রমে আমার ক্লান্তি নাই কিন্তু অনেক টানাটানি করিয়াও চব্বিশ ঘন্টার দিনটাকে পঁচিশ-ঘন্টা-ব্যাপী করিতে পারিলাম না। আহার বা নিদ্রার প্রয়োজনকে জয় করা যায় কিন্তু কালকে জয় করিব কি করিয়া? কাল মানে সময়, কাল মানে মৃত্যু। একদা সময় অনেক থাকিবে কিন্তু এই লেখনী আর চলিবে না, এই কণ্ঠ আর বলিবে না।

"তোমাদের ওখানে যে অনেক সহকর্ম্মী আছে, তাহা আমি অনুভবে বুঝিয়াছি। তাহাদিগকে যথেষ্ট যত্ন সহকারে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং পরম সমাদরে যথাযোগ্য কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে হইবে। ইহা সম্ভব করিবার জন্য প্রচুর প্রাক্‌চিন্তা এবং প্রখর দূরদৃষ্টির প্রয়োজন আছে। তোমরা সকলে মিলিয়া পরামর্শে বসিয়া যাও যে, সকলের সকল মনীষা-সম্পদের কি করিয়া পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যায়। অনেকেরই সদ্‌বুদ্ধি প্রচুর থাকে কিন্তু কেহ আসিয়া তাহার এই সম্পদটুকুর কথা তাহাকে মনে করাইয়া দিল না বলিয়া

তাহা সদ্ব্যবহারে আনিবার জন্য তাহার আগ্রহ জাগে না। মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা বা বাহুবল যাদুঘরের শোভাবর্দ্ধন করিবে, ইহাও যেমন বাঞ্ছনীয় নহে, এইগুলি পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার মতন জঞ্জাল-স্তূপে গিয়া জমিয়া থাকিবে, ইহাও তেমন অভিপ্রেয় নহে। ইহাদের সদ্ব্যবহারই ত' সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং ইহাদের প্রকৃষ্টতম সদ্‌ব্যবহার হওয়াও চাই।"

সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ

নোয়াখালী জেলান্তর্গত রাজগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি একটী সম্প্রদায়ের মধ্যে আছ, ইহা কোনও দোষ নহে। কেহ কোনও ক্লাবের মেম্বার হইলে তাহার যেমন ঐ ক্লাবের প্রতি একটা মমতা থাকে, সম্প্রদায়ের ব্যাপারও প্রায় তাহাই। কিন্তু আমি এক সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি বিদ্বেষ রাখিব, ইহা অন্যায়। কেহ আমার অনিষ্ট করিতে চাহিলে অনিষ্টের প্রতীকার বা প্রতিষেধের জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি নিশ্চয়ই করিব কিন্তু তাহা করিব আমি আমার মানবিক কর্ত্তব্যের প্রেরণায়, বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে নহে। মানবিক কর্ত্তব্য পালনের চেষ্টার মাঝখানে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাকে কেন স্থান দিব? সাম্প্রদায়িক ভাব জীবন-বিকাশের একটা স্তরে নিশ্চয়ই

আবশ্যকীয় বস্তু কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট স্তর পার হইয়া মানুষ আর উন্নত হইতে পারিবে না, এমন অভিশাপ মানুষের উপরে থাকিতে পারে না। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি নিয়া দেশকে ও বিশ্বকে দেখিলে দেশসেবা ও বিশ্বসেবা কলুষিত, বিষাক্ত, পঙ্কিল ও পূতিগন্ধময় হইবেই হইবে,—ইহার হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই।"

তোমার জন্মগ্রহণ বিশ্বকুশলের জন্য

ঢাকা তরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিখিল বিশ্বের কুশলের জন্য তোমার আবির্ভাব, এই কথাটী সর্ব্বক্ষণ স্মরণে রাখিবে। তুমি হঠাৎ আবির্ভূত হও নাই, বহুজনের পুঞ্জীভূত প্রার্থনার প্রতিফলন-রূপে তুমি আসিয়াছ। বহু জনের বহু সাধ, বহু আকাঙ্ক্ষা, বহু প্রার্থনা, বহু কামনা তোমাকে পূরাইতে হইবে। জগতের সকলেই ক্ষুধিত ও পিপাসিত। তাহাদের ক্ষুধার অন্ন তোমাকে হইতে হইবে, তাহাদের পিপাসার পানীয় তোমাকে হইতে হইবে। যে যাহা পায় নাই বলিয়া অসম্পূর্ণ ও অকৃতার্থ জীবন-যাপন করিতেছে, তাহা তাহাকে তোমার দিতে হইবে। তোমার জন্মগ্রহণ একটা দিব্য দায়িত্ব, এক কল্পনাতীত কর্ত্তব্য-ভার

বহনের অপরিহার্য্য প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি তোমাকে পালন করিতে হইবে,—তবেই মানবজন্ম তথা মানবদেহ ধারণ তোমার সার্থক হইবে।"

কথার দাম

কুমিল্লা দৌলতপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অনেক বড় বড় কাজ জীবনে করিয়া যাইতে পারিলাম না বলিয়া আফশোষ করিব না। আমৃত্যু মানুষের নিকটে সদ্‌ভাব পরিবেশন করিয়া যাইব। সদ্‌ভাবের প্রচার করিতে করিতে এই জীবনের অবসান হউক। সৎকর্ম্ম কিছু করিতে পারিয়া উঠিলাম না বলিয়া অনুতাপের অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইতে চাহি না। সদ্‌ভাব প্রচারও একটা কাজ, তবে হাল্‌কা কাজ। এই কাজটার বিরুদ্ধে এই একটী মাত্রই অভিযোগ তোলা যায়। কিন্তু সদ্‌ভাব প্রচারের যোগ্য হইতে হইলে নিজের জীবন-প্রণালীকে স্বচ্ছ, সুন্দর, সাবলীল ও কৃত্রিমতাবর্জ্জিত করিতে হয়। এ কাজটুকু একান্তই নিজের ঘরের কাজ, যাহার জন্য আর বাহিরে দৌড়িতে হয় না। আমি আদর্শ জীবন-যাপন করিব ত' নিজের চোখের সামনে। এই জীবন যাপন-চেষ্টার মধ্যে বাহিরের চক্ষুকে আমন্ত্রণ করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। এখানেই রহিয়াছে এক শান্তির নীড়। নিজেকে নিজে গড়িয়া তোলা এক মহোল্লাসের

ব্যাপার। নিজেকে নিজে চেনা, নিজেকে নিজে জানা, নিজেকে নিজে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করা,—ইহা এক মজার ব্যাপার। এ কাজটী যদি লোকচক্ষুর অগোচরে বসিয়া নিয়ত করিয়া যাইতে পারি, তবে আমার মুখের কথা জগদ্বাসী উৎকর্ণ-শ্রবণে কেন শুনিবে না? কথা বলিলেই তাহা সার্থক হয় না, কথাগুলি কেহ শুনিল, কেহ ইহা মনে রাখিল এবং প্রত্যেকে তদনুযায়ী জীবন-গঠন করিল, তবে ত' কথার দাম।"

পিতামাতার দায়িত্ব

নোয়াখালী জেলান্তর্গত ফেণী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পিতামাতার কর্ত্তব্য পিতামাতা করিবেন না, বলিবেন 'হে শিক্ষাদাতা অধ্যাপক, তুমি আমার দুষ্ট ছেলেমেয়েকে সংশোধন করিয়া দাও', বলিবেন 'হে শিক্ষাদাতা গুরু, তোমাদের কর্ত্তব্য ইহাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া',—ইহা কোনও কাজের কথা নহে। ইহা খামখেয়ালী আবদার মাত্র। পুত্রকন্যার জন্য অধিকাধিক শ্রম ও তপস্যা ত' পিতামাতারই করণীয়। আর পিতামাতার পক্ষে তাহা সহজে সম্ভবও। পিতা আর মাতা দুই, তিন বা চারিটী সন্তানের জন্য যতটা সময়, শ্রম, অভিনিবেশ ও একাগ্রতা অর্পণ করিতে পারিবেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কলেজের

অধ্যাপক কি শত শত ছেলের জন্য ঠিক ততটা দিবার সুযোগ পাইবেন? দীক্ষাদাতা গুরু যদি খ্যাতিমান্ পুরুষও হন, তথাপি তিনি কি তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যের প্রতিজনের জন্য তদ্রূপ দিতে সমর্থ হইবেন? ইহা একটা সাধারণ হিসাবের কথা। তোমার পুত্র, তোমার কন্যা প্রত্যক্ষ ভাবেই তোমার নিজের ভবিষ্যৎ। তাহাদের জন্য তোমার শ্রমদান ত' অতীব আবশ্যকীয় ব্যাপার এবং স্বাভাবিক ব্যাপারও বটে। শিক্ষক, অধ্যাপক বা আধ্যাত্মিক সাধনদাতা গুরু পিতৃতুল্য হইলেও তাঁহার সদ্‌গুণাবলি ত' বংশানুক্রমিকতার সুযোগ নিয়া ছাত্র বা শিষ্যদের মধ্যে নামিয়া আসে না। তাঁহাদের ত্যাগ, তপস্যা এবং শ্রম দৃষ্টান্ত-হিসাবে বা আদর্শ-রূপে ছাত্র বা শিষ্যদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়। সুতরাং প্রতিবেশ-প্রভাবানুসারে একই গুরুর বা একই অধ্যাপকের শিষ্য বা ছাত্রদের মধ্যে একই সদুপদেশের বিচিত্র বিকাশ অসম্ভব নহে। কিন্তু একই পিতামাতার ঔরস-গর্ভ-জাত পুত্রকন্যারা কতকগুলি সদ্‌গুণ নিজেদের চেষ্টা ব্যতীতই স্বাভাবিক ভাবে পিতামাতার নিকট হইতে পাইয়া থাকে, যাহার ঋণ কদাচ অস্বীকার করা যায় না। সাধারণতঃ গায়ক বা শিল্পী পিতামাতার সন্তানদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই আপনা আপনি সাঙ্গীতিক বা শৈল্পিক কতকগুলি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইহা দ্বারা মানবের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জীবনকে প্রভাবিত

করিবার পক্ষে পিতা ও মাতার স্বাভাবিক সুবিধাজনক স্থানটীকে স্বীকার ও সম্মান করিবার যুক্তিযুক্ততা বাড়িয়া যায়। ছেলেমেয়ে খারাপ হইলে মাষ্টার বা গুরুর দায়িত্ব নিশ্চয়ই কিছু না কিছু আছে কিন্তু প্রধান দায়িত্বটা যে পিতা মাতার, এই কথাটি ভুলিয়া যাইও না।"

আত্ম-প্রচারের দোষ

কুমিল্লা জেলান্তর্গত কালীকচ্ছ-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আত্মপ্রচারের তাড়না হইতে অনেকের মনে সৎকর্ম্মের প্রেরণা আসিয়া থাকে। যতক্ষণ তাহারা সৎকর্ম্মেই লিপ্ত রহিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই আত্ম-প্রচার-চেষ্টা নিন্দনীয়ও নহে, দোষণীয়ও নহে। বরং প্রশংসার্হ। কিন্তু আত্ম-প্রচারের সূক্ষ্ম ইচ্ছার ইহাই এক অবাঞ্ছনীয় পরিণতি যে, কিছু লোক-প্রতিষ্ঠা আসিয়া গেলেই তুমি বেপরোয়া হইয়া আত্মসেবার দিকে মন দিবে এবং জনসেবাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। অবশ্য জনসেবার ভাঁওতা বা ধাপ্পা তোমাকে দিতেই হইবে, কারণ লোকে তোমাকে জনসেবক না জানিলে সম্মানও দিবে না, পূজাও করিবে না। তখন তোমাকে নিজ বিবেকের সহিত বিরোধ করিয়া চলিতে হইবে এবং আস্তে আস্তে নানা অসৎ-কর্ম্মের অনভিপ্রেত আসক্তি তোমার মনের ভিতরে শক্ত করিয়া শিকড় গাড়িবে।"

সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুন্নতির উপায়

নোয়াখালী জেলান্তর্গত সোনাইমুড়ী-নিবাসী জনৈক পত্র-প্রেরকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সর্ব্বদা মঙ্গলময় ভগবন্নাম স্মরণে রাখিবে। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে, মন যেন উর্দ্ধগামী থাকে, মন যেন নিম্নগামী না হইতে পারে। হেয় বা অবজ্ঞেয় বস্তুর প্রতি ভোগাভিলাষী মন ধাবিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে প্রত্যাহার করিয়া বলপূর্ব্বক অন্য দিকে পরিচালন একটী প্রাথমিক সদুপায়। কিন্তু ভাল মন্দ সকল বস্তুতে ও সকল বিষয়ে শ্রীভগবানের পুণ্যময় অবস্থিতি কল্পনা করিয়া মনকে ভগবদ্‌ভাবে ভাবিত ও ভগবৎ-প্রেমে আমোদিত করিবার চেষ্টা তার চেয়েও অধিকতর কুলীন এবং সম্ভ্রান্ততর। ইহা অশেষ ফলপ্রদও বটে। ভগবানকে সর্ব্বপবিত্রতার আকর জানিয়া সর্ব্ববস্তুতে এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার দিব্য উপস্থিতি চিন্তন এক অত্যাশ্চর্য্য কাজ। নিজের মনের উন্নতির সাথে সাথে অপর দশটী পরিজন বা প্রতিবেশীর মনকেও যাহাতে উর্দ্ধমুখীন করা যায়, তাহার জন্য চেষ্টা করিবে। এই প্রণালীতে কাজ করিলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুন্নতি অতি সহজে এবং সুস্থির ভাবে হইতে পারে। ইহার সদুপায় স্বাধ্যায় বা সদ্‌গ্রন্থের নিয়মিত পঠন, পাঠন, শ্রবণ, ও গ্রন্থনিহিত কথার নির্গলিতার্থের সপ্রেম অনুধাবন।"

আমার ভালবাসা

২৪-পরগণা মগরাহাটি-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একজনকে দুইজনকে নহে, সকলকে ভালবাসিয়া আমার ভালবাসা সার্থক হইবে। প্রাণভরা ভালবাসা উজাড় করিয়া আমি ঢালিয়া দিতে চাহি। পাত্র ছোট না বড় বিচার করিতে চাহি না। পাত্র বিদ্বান্ না মূর্খ, ধনী না নিষ্কিঞ্চন, সৌভাগ্যবান্ না দুর্ভাগ্যহত, তাহা আমার বিচার করিবার অবসরও নাই। আমার ক্ষুদ্র একটী হৃদয় হইতে ক্ষুদ্র একটী ছিদ্রপথে এত সূক্ষ্মস্রোতে ভালবাসা নির্গত হইতেছিল যে, আমি প্রথমে বুঝিতেই পারি নাই যে, কতটা দূর অগ্রসর হইয়াই সে একটী ভাগীরথী হইবে, আমি ধারণাও করিতে পারি নাই যে, তারপরে সে সহসা এক মহাসমুদ্রের আকার ও আয়তন নিবে। এই অফুরন্ত ভালবাসা নিয়া আমি এমন বিব্রত হইয়াছি যে, কেবল একজন দুই-জনে আমার চলিবে না, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভালবাসা ঢালিবার পাত্র আমার চাই। তাই, আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতন দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া বেড়াইতেছি।"

মহাপুরুষ-দর্শন

শ্রীহট্ট পাথরকান্দি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মহাপুরুষ-দর্শন কোনও মামুলী ব্যাপার নহে। ইহা ভাগ্যের ফল। ইহা সাধনার সিদ্ধি। তপস্যা না করিলে মহাপুরুষ চেনা যায় না, ফলে দেখিয়াও দেখা হয় না। প্রকৃত মহাপুরুষকে যাহারা দেখিয়াছে, প্রকৃত মহাপুরুষের মুখের কথা যাহারা শুনিয়াছে, প্রকৃত মহাপুরুষের সঙ্গ যাহারা করিয়াছে, প্রকৃত মহাপুরুষকে সেবা দিবার সুযোগ যাহাদের হইয়াছে, তাহারা জগতে ভাগ্যবান্ কৃতী পুরুষ বলিয়া নিজেদিগকে গণনা করিতে পারে। মহাপুরুষ দেখা, না পরমসুন্দরকে দেখা। মহাপুরুষের সঙ্গ করা, না পরমসুন্দরের সঙ্গ করা। মহাপুরুষের নির্দ্দেশ পালন করা, না জাগ্রত ভগবানের প্রত্যক্ষ উপদেশাবলিকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করা। মহাপুরুষকে হেলা করিও না। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলিতেছি না যে, তোমরা এমন আচরণ কর, যাহার সুযোগে উচ্চ কোটির মহাপুরুষেরও পতন ঘটিয়া যায়।"

বর্দ্ধমান

১০ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৪২

(২৫শে জুন, ১৯৩৫)

মুদ্রিত বিজ্ঞাপন-সমূহ শ্রীশ্রীবাবামণি সঙ্গে করিয়াই নিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সরোজ রঞ্জন বাবুর মুহুরী এবং শ্রীশ্রীবাবামণির সহকর্ম্মী ব্রহ্মচারীটি তাহা সহরের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে বিলি করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাতে সমাগত যুবকদিগকে যৌগিক আসন-

মুদ্রার শিক্ষাদান করিতেছিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন,—বিকালে বক্তৃতা শুনিতে তেমন লোক আসবেন ব'লে মনে হয় না। দেখ্‌লাম, সবাই যেন নির্ব্বিকার এবং উদাসীন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঘাবড়ে যেও না। সহরটার নাম বর্দ্ধমান। ক্রমশঃ বাড়ে ব'লেই এর নাম বর্দ্ধমান। ভয় পাবার কিছু নেই।

কিন্তু বিকাল বেলা সভাস্থলে সত্য সত্যই জনসমাগম অত্যন্ত অল্প হইল। শ্রোতার সংখ্যা বোধ হয় পঁচিশ অতিক্রম করিবে না। শ্রীশ্রীবাবামণি হরিসভার হলঘরেই ভাষণ সুরু করিলেন। বলিলেন, পূরা আড়াই ঘণ্টা। অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় অতীত ভারত।

অতীতের ঋণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অতীতকে ভুলে যাওয়া ভুল, অতীতকে অস্বীকার করা পাপ, অতীতের সম্পদকে কুড়িয়ে এনে নবীন জীবনে নূতন ক'রে ব্যবহার করার চেষ্টা না করার নাম অপচয়, অতীতকে অমর্য্যাদা করা অপরাধ। কিন্তু নব্যতাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রকেই অতীতকে কটাক্ষ ক'রে কথা বল্‌তে শোনা যায়। অতীতে যদি আমরা সত্য সত্য কতকগুলি বানর মাত্রই ছিলাম, তথাপি একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, সেই বানরগুলির কাছে আমরা আপাদমস্তক ঋণী। সেই ঋণ যদি আমাদের কাছে লাভজনক নাও হ'য়ে

থাকে, তথাপি সেই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব থেকে আমরা কোনও প্রকারেই অব্যাহতি পাই না। ঋণকে স্বীকার করা এবং সেই ঋণকে সুদে-আসলে শোধ ক'রে দেওয়ার চেষ্টারই নাম মনুষ্যত্ব, এই চেষ্টার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে দেওয়ার নাম সভ্যতার বিকাশ, এই ঋণের ফলকে অনন্তযুগবিস্তারী মানব-সমাজের উপরে শুভপ্রদ-রূপে প্রসারিত ক'রে দেওয়ার নাম নূতন ইতিহাস রচনা।

বর্দ্ধমান শহরের বাছা বাছা লোকেরাই বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সকলেই আফশোষ করিলেন যে, এমন একটী উপাদেয় ভাষণ শহরের লোকেরা অধিকাংশই শুনিতে পাইলেন না।

জনসমাগম কমিয়া গেলে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

সংযম ও সদাচার জাতির যথার্থ গৌরব

২৪-পরগণা বসিরহাট-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংযম ও সদাচারকে কেবল ব্যক্তির সম্পদ বলিয়া মনে করিও না, ইহা সমগ্র জাতির সম্পদ। এই সম্পদ অর্জ্জন করিতে অন্যের সম্পদ-হানির কোনও সম্ভাবনা নাই।

ধন ও সম্পত্তির একটা সীমা আছে, যাহার অধিক ব্যক্তিগত অধিকারে আসিলে সমগ্র জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংযম ও সদাচার সম্পর্কে সে কথা খাটে না। তোমরা প্রতিটি প্রাণীকে সংযমী ও সদাচারী করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টিত হও। ইহার ফলে সমগ্র জাতির প্রকৃত গৌরব এবং ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত হইবে, জাতির অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় মানব-গোষ্ঠীর আয়ু এবং সৌষ্ঠব বাড়িবে।"

চিন্তা ও কর্ম্মের দূরত্ব তথা ব্রহ্মচর্য্য

দার্জ্জিলিং জেলান্তর্গত মাটিগড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভারতবাসী আমরা স্বভাবতই একটু অতিরিক্ত চিন্তা-পরায়ণ অথচ কর্ম্মের বেলায় আমরা সর্ব্বদাই খুঁতখুঁতে বা কুণ্ঠিত। একই ব্যক্তিতে বা একই সমাজে যুগপৎ এই দুইটী লক্ষণ দেখা দিলে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের চিন্তা-প্রণালীর মধ্যে কোথাও কোনও গুরুতর ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। আমরা যাহা চিন্তা করি, তাহার প্রতিটি কথার অর্থ ঠিক ঠিক বুঝি কি? বুঝিলে, কর্ম্মে কেন এত নিরুদ্যমতা, শ্রমে কেন এত কাতরতা? সজীব চিন্তা সজীব কর্ম্মের দিকে আমাদিগকে ধাবিত করিবে, ইহাই ত' স্বাভাবিক। যাহা প্রকৃতই স্বাভাবিক,

আমরা তাহা হইব না কেন? চিন্তার সহিত কর্ম্মের এই যে দুস্তর ব্যবধান, তাহা আমাদিগকে চেষ্টা করিয়া দূর করিতে হইবে। চিন্তাহীনের হঠাৎ-কর্ম্ম সর্ব্বদাই বিপজ্জনক। সেই বিপদের ঝুঁকি না নিয়া আমাদিগকে আত্ম-সংশোধন করিতে হইবে। ইহার উপায় হইতেছে, প্রতিটি চিন্তাকে তৌল করিয়া তাহার মূল্য ও ওজন নির্দ্ধারণ করা। ইহার জন্য প্রয়োজন হইবে অপক্ষপাতে বিচার করিবার যোগ্য প্রচুর বুদ্ধি-বিবেচনা সংগ্রহ করা। তাহার উপায় আবার হইতেছে, ব্রহ্মচর্য্যের কায়মনো-বাক্যে সাধনা। আমি ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে আমাদের সর্ব্বপ্রকার জাতীয় ব্যাধির চিকিৎসাসাধ্য মহৌষধ আবিষ্কার করিয়াছি এবং এই জন্যই আমি ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি এত অনুরাগী হইয়াছি।"

প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"নিজেকে ব্রহ্মচারী বলিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইবার নাম ব্রহ্মচর্য্য নহে, সকলের অজ্ঞাতসারে অতীব সঙ্গোপনে দেহমনোব্যাপী পবিত্রতার প্রকৃত সাধনার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের দোহাই দিয়া অনেক স্থানে এমন অনেক রকমের উল্লম্ফন ও উল্লঙ্ঘন-সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার সহিত ব্রহ্মচর্য্যের নিকট বা সুদূর কোনও প্রকার সম্বন্ধই নাই। ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত পরিচয় আত্মস্থতাদানে, ব্রহ্মচর্য্যের

যথার্থ পরীক্ষা দুরন্ত বিপদের সময়ে বুদ্ধির স্থিরতায়, ব্রহ্মচর্য্যের দিগ্‌দেশব্যাপী প্রভাব শত্রুকেও মিত্রকরণে, বিরুদ্ধকারীকেও নিজ-পৌরুষ-বলে নিরস্ত্রীকরণে। হিংসা ব্রহ্মচর্য্যের সাথী নহে, বিদ্বেষও নহে, সর্ব্বজীবে পরমা প্রীতিই হইতেছে ব্রহ্মচর্য্যের অমৃতময় সুফল। আমি যখন ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগিতার কথা ভাবি, তখন বিশ্বময় শান্তি-শীতলতা, জগন্ময় প্রীতি-কোমলতা আমার মানস-নয়ন আচ্ছাদন করিয়া রাখে। দিকে দিকে প্রসারিত স্নেহ-স্নিগ্ধ করাঙ্গুলী-স্পর্শ মানুষের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী দুষ্টক্ষত-গুলিকে নীরোগ করিতেছে,—আমার ব্রহ্মচর্য্যের আলেখ্য ইহা।"

ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ও শুদ্ধতার পবিত্র অঙ্গীকার

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"দেশব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের প্রচার করিতে হইবে, এই কথার মানে যদি ইহাই হয় যে, একদল নূতন ভিখারীর আবির্ভাবকে করিতে হইবে সম্ভব, তাহা হইলে এমন ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের আন্দোলনের সহিত আমি নিজেকে যুক্ত রাখিতে চাহি না। অব্রহ্মচারী ভিখারী এই দেশে সংখ্যায় কিছু কম নহে। ইহার পরে আবার ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকের দল সৃষ্টির মধ্যে সার্থকতা কোথায় রহিয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখ। ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান

করিলেই কেহ ব্রহ্মচারী হয় না, ব্রহ্মচারী হয় সংযম-সাধনাকে জীবনের অপরিহার্য্য ব্রত-রূপে স্বীকার করিয়া লইলে। এই ব্রতের সহিত গৈরিক বসন, ভিক্ষার ঝুলি, দণ্ড-কমণ্ডলু, উদ্দণ্ড ত্রিশূল বা সাম্প্রদায়িক উম্মাবিকাশক ধর্ম্ম-ব্যাখ্যানের কোনও আত্মীয়তা নাই। কেহ ব্রহ্মচারী হইয়া ইহাদিগকে গ্রহণ করিলে করিতে পারে, কেহ বা এগুলিকে পরিত্যাগ করিতেও পারে। ব্রহ্মচর্য্যের আসল অবস্থিতি হইতেছে নিজ জীবনের নিভৃত প্রদেশে সংযম ও শুদ্ধতার পবিত্র অঙ্গীকারে। এই অঙ্গীকার সর্ব্বপ্রকার শক্তির বর্দ্ধক এবং প্রকৃত শক্তির উৎস-মূলে অপার্থিব শক্তির সঞ্চারক। তোমরা এই সত্যকে সুনিশ্চিত-রূপে জানিয়া এবং বুঝিয়া প্রকৃত ব্রহ্মচারী হইবার চেষ্টায় নামিয়া পড়।"

আলস্য, পরমুখাপেক্ষিতা ও শিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"আমার দ্বারা দেশের বড় বড় হিতকর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারিল বা না পারিল, তাহার হিসাব নিয়া আমার মনে কোনও দুশ্চিন্তা কদাপি উকিঝুঁকি মারে না। কারণ, আমি আলস্য, পরমুখাপেক্ষিতা আর ভিক্ষার অপরুচিকে জাতীয় জীবনের সব চেয়ে মারাত্মক শত্রু বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। কেহ যদি আলস্য বিদূরণের জন্য উৎসাহ-পূর্ব্বক

ভিক্ষাকর্ম্মে লাগিয়া যান, তাহা হইলে আমি তাঁহার উদ্দেশ্যের সততায় বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস না করিয়াও বলিব যে, শত চেষ্টার ফলে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র জাতির জন্য ইনি পরমুখাপেক্ষিতারই পুঁজি সঞ্চয় করিতেছেন এবং এইরূপ হেয় মূলধন জাতির শক্তি বর্দ্ধিত না করিয়া জাতির দুর্ব্বলতাকেই সম্বর্দ্ধিত করিবে। দেশসেবার উপায় সম্পর্কে নানা জনে নানা ভাবে চিন্তা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং আমি যে ভাবে চিন্তা করিয়া থাকি, অন্য অনেকে তাহা অপেক্ষা পৃথক-রূপে ভাবিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু অন্যেরা দেশহিত-সাধন করিতে গিয়া যদি ভিক্ষোপজীবীর সংখ্যাই বর্দ্ধিত করেন, তাহা হইলে, সেই সংখ্যাবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর গৌণ ভাবেই হউক, জাতীয় শক্তির মূলাধারকে অংশত হইলেও ক্ষীণবল হীনশক্তি করিবেনই করিবেন। এখানে 'বল' শব্দটীকে গতিবিশিষ্ট শক্তি এবং 'শক্তি' শব্দটীকে গতিহীন বল বলিয়া মনে করিও।"

বর্দ্ধমান

১১ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৪২

(২৬শে জুন, ১৯৩৫)

বর্দ্ধমান হরিসভাতে প্রাতঃকালীন যৌগিক আসন-মুদ্রার অনুশীলন চলিতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীর সহযোগে সমাগত স্থানীয় যুবকদের মধ্যে আসন-মুদ্রার শিক্ষাদান করিতেছেন।

সংসারী জীবন ও যৌগিক আসন-মুদ্রা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাংসারিক জীবনে যাঁরা সুদীর্ঘকাল শ্রমক্ষম থাকতে চান, তাঁদের পক্ষেও যেমন যৌগিক আসন-মুদ্রার অভ্যাস প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে যাঁরা সুদীর্ঘ কাল নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা ক'রে যেতে চান, তাঁদের পক্ষেও তেমন যৌগিক আসন মুদ্রাগুলির অনুশীলন আবশ্যক। যৌগিক আসন-মুদ্রা অভ্যাস কত্তে গেলেই সংসার ত্যাগ ক'রে তপোবনে যেতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। প্রাচীন কালে বনবাসী তপস্বীরা এসব অভ্যাস কত্তেন ব'লেই একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, যৌগিক আসনমুদ্রা সংসারীরা কত্তে পারে না। প্রাচীন-কালের সমাজ-ব্যবস্থা এমন ছিল যে, প্রায় প্রতিটি ঘরের ছেলেরা—এবং অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরাও আট বৎসর বয়সে গুরুগৃহে গিয়ে বিদ্যার্জ্জন-কালে যৌগিক-আসন-মুদ্রা শিক্ষা কত্ত এবং সংসারে যখন তারা ফিরে আসত, তখন ত' এসব শিক্ষার সুফল তাদের আগে থেকেই মজ্জাগত হ'য়ে আছে। সুতরাং এ প্রশ্নটাই কখনো উঠ্‌ত না যে, সংসারী লোকের যৌগিক আসন-মুদ্রা করা উচিত কিনা, মঙ্গলজনক কিনা, প্রয়োজন কিনা। সংসারী হও আর সন্ন্যাসী হও, দৈহিক পটুত্ব রক্ষা প্রত্যেকের পক্ষেই প্রয়োজন। সুতরাং

যৌগিক আসন-মুদ্রা অভ্যাসে কারো বাধা নেই। তবে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যারা যাপন কর্ব্বে, তাদের এসব শেখার সার্থকতা কি থাক্‌তে পারে, এরকম প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠতে পারে। যৌগিক আসন-মুদ্রার অভ্যাসকারীর পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযমের দিকে লক্ষ্য রাখা নিশ্চয়ই উচিত, কেননা, তাতে সে শ্রমের উপযুক্ত শুভফল পাবেই পাবে। কিন্তু অধিকাংশ যৌগিক আসন মুদ্রারই প্রত্যক্ষ শুভফল হচ্ছে মনঃসংযম। এই কারণে এই সকলের অনুশীলন স্বভাবতই ইন্দ্রিয়-সংযমের ক্ষমতাবর্দ্ধক।

পুরুষানুক্রমিকতার শক্তি আবিষ্কার এক সুমহতী সংকীর্ত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পুরুষানুক্রমে কোনও অনুশীলন নিয়মিত ভাবে চলতে থাক্‌লে তার ফলে এতদ্বংশজাত পুরুষ ও নারী মাত্রেরই কতকগুলি স্বাভাবিক সম্পদ জন্মের সঙ্গে লব্ধ হ'য়ে থাকে। এই সত্যকে আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা জান্‌তেন। "জান্‌তেন" বলার চেয়ে বোধ হয় "আবিষ্কার করেছিলেন" বল্লে বেশী সত্য বলা হবে। কি কর্ম্মে পিতা অপেক্ষা পুত্র, পুত্র অপেক্ষা পৌত্র, পৌত্র অপেক্ষা প্রপৌত্র ক্রমশঃ অধিকতর দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ-রূপে আবির্ভূত হ'তে পারে, সেই বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ ও আকুলতার অভাব ছিল

না। এই বিষয়টীকে তাঁরা এত অধিক প্রয়োজনীয় বলে জ্ঞান কত্তেন যে, পুরুষানুক্রমিকতার শক্তিকে আবিষ্কার কত্তে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন এবং এই আবিষ্কারের আলোকে অনন্ত কাল ধ'রে যুগযুগব্যাপী পথ-পরিক্রমা পরিচালনে তাঁরা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁদের সমাজ-বিধি, সদাচার, তপশ্চর্য্যার ধারা এবং চিন্তাপ্রণালী এই একটী অসাধারণ আবিষ্কারের আলোকে ছিল আলোকিত এবং নিখুঁত। যুগ-পরিবর্ত্তনের এক বিপজ্জনক সময়ে আর্য্য-সন্তান তাঁর সাধনার সূত্রটী যেন হারিয়ে ফেল্‌ল। জ্ঞান-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞা মানব-জাতির পরিচালনে অক্ষম হ'য়ে বনে জঙ্গলে নূতন ক'রে আশ্রয় খুঁজে নিল আর বলপ্রবৃদ্ধ উদ্ধত ক্ষত্রিয় আমোদের প্রয়োজনে জিগীষা-মত্ত হ'য়ে দেশজয়ের নেশায় ভুলে ধরিত্রীকে অকারণ নর-রক্তে রঞ্জিত কত্তে লাগল। আর্য্যসভ্যতা তার খেই হারিয়ে ফেল্‌ল এবং যা-কিছু অতীত, তা' শুধু গর্ব্বের সামগ্রী মাত্রে পর্য্যবসিত হ'ল, অতীতের অনুশীলন চিরবিস্মৃত হ'য়ে কতকগুলি প্রতীকী আচরণ প্রাচীনের কঙ্কাল-রূপে সমাজের গললগ্ন হ'য়ে রইল। জীব তখন কেবল ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির লক্ষ্যে নিজের স্বভাবকে আবর্ত্তিত বিবর্ত্তিত কত্তে লাগ্‌ল গুটিবদ্ধ রেশম-পোকার মত। তবু বল্‌ব, আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা যে পুরুষানুক্রমিকতার শক্তিকে আবিষ্কার কত্তে পেরেছিলেন, এটা তাঁদের এক সুমহতী সংকীর্ত্তি।

আমার কাম্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাচীনের সংকীর্ত্তিকে আধুনিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে যুগকে জাগ্রত ও সুধন্য করবার প্রয়োজনেই আমার দেশ-ভ্রমণ, শিক্ষান্দোলন, বক্তৃতা-প্রদান ও পত্র-লিখন। আমি আমার একটী কাজও নিজেকে প্রচারিত বা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কচ্ছি না। আমি আমার প্রতিটি শ্রমের মধ্য থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে দূরে সরিয়ে রেখে কাজ করার প্রয়াস পাচ্ছি। কতটা সফল হচ্ছি, ভবিষ্যৎ তা' বল্‌বে। আমি যশ চাই না, মান চাই না, লোকের দান চাই না কিন্তু মানুষের ঘরে অতিমানুষ বা মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব হোক্, এটা চাই। যা' আমার আসল কাম্য, তার পূরণ না হ'লে ছোটখাট অন্য জিনিষ পেয়ে আমি তুষ্ট, তৃপ্ত ও শান্ত হ'তে পারি না।

পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল আসন মুদ্রার শিক্ষাদান চলিবার পরে সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবাবামণির আহারীয় রন্ধনে চলিয়া গেলেন এবং শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র-লিখনে রত হইলেন।

হিন্দু ও মুসলমানে মিলনের উপায়

ফরিদপুর জেলান্তর্গত দেওরা গ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হিন্দু এবং মুসলমানের মিলন-সাধনের উপায় সম্পর্কে তোমার বন্ধুবর যে উপায়টী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সুচিন্তিতও নহে, সুবুদ্ধি প্রসূতও নহে। তাহার মধ্যে চিন্তার অস্বচ্ছতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে আসল পার্থক্য এই নয় যে, হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করেন না আর মুসলমানেরা তাহা করেন। অতীত কালের হিন্দু ও অতীত কালের মুসলমানে এই পার্থক্য ছিল যে, একদল যুদ্ধকার্য্যে অনিচ্ছুক নানা-ব্যবসায়ে রত অংশত-ধনবান্ ও সম্পন্ন নরনারী, অন্যদল সুযোগ পাওয়া মাত্র যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, মূলতঃ-দরিদ্র ও ধনগত দরিদ্রতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাগত দারিদ্র্যেও প্রপীড়িত। কিন্তু ইহার চেয়ে বড় পার্থক্য ছিল, ধর্ম্মবিশ্বাসের বিশেষ ভঙ্গীতে। একজন হিন্দু যে বারো মাসে তেরোটী পার্ব্বণ করে, তাহা স্পষ্টতঃ এবং বাহ্যতঃ পরমেশ্বরকে যেন বহু বলিয়া সম্মাননা করে, একজন মুসলমান সারা বৎসরে যতগুলি ধর্ম্মোৎসব করে, তাহা বারংবার তাহাদিগকে এক আল্লার কথা এবং আল্লার একমাত্র রসুল মহম্মদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ধর্ম্ম বিশ্বাসের এই টুকুর পার্থক্যের দরুণ সারা বৎসরে নানা উৎসবে ও নামাজে মুসলমান বারংবার একমাত্র আল্লাকে এবং একমাত্র হজরৎ মহম্মদকে স্মরণ করে। হিন্দুর পক্ষে এরূপ হয় না। হিন্দুরা বারো মাসে তের পার্ব্বণের মধ্য দিয়া নানা প্রতীকের সমারোহ করে এবং সব প্রতীক একজনকে উপলক্ষ্য করিয়া

এই কথাটী মুখে মুখে বলে। মুখে যাহা বলে, তাহা প্রতিটী হিন্দুর আন্তরিক উপলব্ধি কিনা, এই প্রশ্নটী করিবার অবকাশ রহিয়াছে। যেরূপ পরিপন্থী পরিস্থিতির মধ্য দিয়া মুসলমানদের ধর্ম্ম আরব দেশে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছিল, তাহাতে মক্কায় পূজিত অসংখ্য দেববিগ্রহকে ধ্বংস করিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল কিনা, সম্ভবতঃ কোনও ঐতিহাসিক উপকরণ হইতে তাহার তত্ত্ব সংগ্রহ আজ সম্ভব নহে। কিন্তু পরমতকে বিধ্বস্ত করার বাধ্যকর অবস্থার মধ্য দিয়া যাহার স্বাভাবিক প্রকাশ, সেই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা ভারতের বর্ত্তমান হিন্দুদের নানা দেব-দেবীর নানাবিধ পূজাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখিবেন এবং তৎসম্পর্কিত আচরণ সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমানের কি হইলে হইতে পারে, ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। মুসলমানেরা মসজিদে আজান দিলে যদি তোমাদের কর্ণপটহে বিরক্তিকর বেদনার সঞ্চার হয়, আর তোমাদের দেবপূজার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে যদি কোথাও ইসলাম বিপন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা গোমাংস ভক্ষণ সুরু করিলেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইয়া যাইবে, এমন প্রত্যাশা করা চলে না। অন্যান্য কারণে বিরোধ-বিদ্বেষ ঘটুক আর না ঘটুক, ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পার্থক্যের দরুণ যদি বিদ্বেষ-বিরোধ ঘটে, তবে তাহার প্রকৃত প্রতীকার কি, তাহা আমাদিগকে আগে চিন্তা করিতে হইবে। হিন্দুকে গোমাংস

খাওয়াইবার পরেও যদি সে হিন্দুই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ঐক্য ঘটিবার প্রধান অন্তরায়ই রহিয়া গেল। অনুরূপ ভাবে আবার যদি রাজপুত এবং শিখরা তাহাদের পক্ষে অভ্যস্ত কোনও মাংস ঐক্যের অনুরোধে সকল মুসলমানকে খাইতে অনুরোধ করিয়া বসে, তবে তাহাও নিতান্ত তুচ্ছ সঙ্কটের সৃষ্টি করিবে না। অতএব, ঐক্য-স্থাপনের পক্ষে তোমার বন্ধুবরের প্রদত্ত প্রস্তাব ঠিক যুক্তি সিদ্ধ হয় না।

"তবে কি হিন্দু ও মুসলমানের মিলন কখনো হইবে না? চিরকালই কি বর্ত্তমানের ন্যায় দ্বন্দ্ব চলিবে এবং পুরুষানুক্রমে ইহা কেবলই বাড়িতে থাকিবে? অতীতের কয়েক শত বৎসর ত' এই বিরোধের বিশেষ চর্চ্চা আমরা সকলে নানা ভাবে করিয়াছি। এখনো কি ইহার আর প্রয়োজন আছে? অথবা সমুদ্র-মন্থন করিতে করিতে কালকূটের আবির্ভাব ঘটা পর্য্যন্ত আমরা অমৃতের আশা করিতেই পারি না বলিয়া দুই পক্ষে কেবলি রেষারেষি চালাইব?

"ভারতে গোমাতার পূজা আছে কিন্তু গোজাতির যত্ন নাই। এই কারণে গোমাতা ভারতীয়দের সম্পদ-সৃজনে সহায়িকা হইতে পারিতেছেন না। গোমাতাকে পূজার নামে শোরগোল করিলেও গোজাতির প্রতি ব্যাপক অযত্নের অভিযোগ খণ্ডন করিবার মত যুক্তিবল আমাদের নিতান্তই সীমাবদ্ধ। তথাপি গোজাতি সম্পর্কে হিন্দুমনে যে স্বাভাবিক কতকগুলি সংস্কার বা দুর্ব্বলতা রহিয়াছে, তাহাকে সম্মানের

দৃষ্টিতেই দেখিতে হইবে। তাহাকে অসম্মান করিয়া কোনও নূতন প্রস্তাব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে মানসিকতার কারণেই তাহা বাজারে অচল হইবে। রোগ দেখিলে তাহার ঔষধ নিশ্চয়ই দিতে হয় কিন্তু এমন ঔষধ রোগীকে দিয়া গ্রহণ করান সম্ভব নহে, যাহার প্রতি তাহার স্বভাবতই প্রচণ্ড বিরক্তি বা অনিচ্ছা রহিয়াছে।

"মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য-বোধ বিদূরণ করিতে হইলে প্রত্যেককে আগে মানুষ হইতে হইবে। আমি বহুবার তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আমি হিন্দুও চিনি না, মুসলমানও চিনি না, আমি মানুষ চিনি। তুমি কি মানুষ হইয়াছ? তোমার নিকটে আমার একমাত্র প্রশ্ন ইহা। মানুষ হইতে হইলে কি কি সদ্‌গুণের সমাবেশ নিজের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য হাজারখানা পুঁথি-পুস্তক পাঠ করিবার প্রয়োজন পড়ে না, একমাত্র নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। নিজ বিবেককে বারংবার জিজ্ঞাসা করিবার সৎপ্রবৃত্তি, সদ্রুচি এবং সৎপ্রয়াস তোমার ভিতরে থাকিলে আস্তে আস্তে তুমি নিজেই সেই অপার-জলধি-সম বিরাট জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে পারিবে, যাহাকে প্রকাশ করিয়া ধরিবার জন্য সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব যুগে নানা শাস্ত্র রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। তুমি খাঁটি হিন্দু কিনা, তুমি পাক্কা মুসলমান কিনা, এই প্রশ্ন তোমার নিকটে আমি করিব না। আমার জিজ্ঞাসা, তুমি অন্যকে প্রবঞ্চনা না করিয়া নিজে

বড় হইবার চেষ্টা করিবার সৎসাহস রাখ কিনা, তুমি তোমার নৈতিক চরিত্রকে এমন ভাবে গঠিত করিবার কার্য্যে নিরত কিনা, যাহাতে তোমার আত্মমঙ্গলসাধক কর্ম্মগুলি জগতের সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষে হিতকর ও লাভজনক হইতে পারে। তুমি নিজে সৎ হইবে, অপরকে সৎ করিবার জন্য, শাসন করিবার জন্য নহে। তুমি নিজে ধনী হইবে, অপরকে ধনবান্ হইবার সহায়তা করিবার জন্য, শোষণ করিবার জন্য নহে। এই প্রতিজ্ঞাটী তোমার মনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা, তাহাই তোমার কাছে আমার জিজ্ঞাস্য হইবে।

"হিন্দুর বহুদেববাদমুখী আচরণকে এক ও অদ্বিতীয়ের অভিমুখী মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত করিবার চেষ্টা বহু মহামানব করিয়া গিয়াছেন। ইহার সুফল যে সমাজে ফলে নাই, এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না। কিন্তু আদি আর্য্য যখন তাঁহার ব্রহ্মময় জগতের উপলব্ধি নিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ-কালে নানা জাতির, নানা গোষ্ঠীর, নানা শ্রেণীর মানুষকে তাহাদের নিজ নিজ চির-প্রচলিত খণ্ডপূজাপদ্ধতির বিলোপ সাধন না করিয়া সহিষ্ণুতার দৃষ্টিতে সহিয়া নিয়াছিলেন, তখন উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেও সাধারণ ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মনগুলিকে বহুদেববাদের গোলক-ধাঁধায় নিক্ষেপ করিবারই এক আয়োজন নিজেরা না জানিয়াই হয়ত করিয়াছিলেন, একথা মনে করিলে বড় রকমের কোনও ভুল করা হইবে

না। একের পূজক কেন একককে লইয়া মনকে লিপ্ত রাখিবে না, একের পূজক কেন একককেই সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিবে না, একের পূজক কেন বহু দিকে মনকে বিচলিত করিবে, একের পূজক বহু-পূজ্যে অভিনিবেশ স্থাপন করিয়া কে বড়, কে ছোট, কে মাঝারি এই দুশ্চিন্তায় কেন কাল কাটাইবে, একের পূজকেরা পরস্পর কেন নিজেদের মধ্যে একটী মাত্র স্নেহের ডাকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া পড়িবে না, একের পূজকেরা কেন সকলে দল-মত-নিরপেক্ষ ভাবে একটী কার্য্য সাধনে প্রয়োজনের সময়ে আগাইয়া আসিয়া দুঃসাহসিক মৃত্যু-বরণ করিয়াও নিজেদের চরিত্র ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের প্রদীপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে না,—এগুলি হিন্দুর নিকটে যুগদেবতার এক একটা বিরূপ প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলির উত্তর এড়াইয়া গেলে চলিবে না। অভ্যুদয়ের পথ যাহারা গ্রহণে অনাগ্রহী, পতন তাহাদের জন্য সুনিশ্চিত। পতনে যাহাদের অরুচি নাই, মৃত্যু তাহাদের অবধারিত।

"একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিও। হজরত মহম্মদ যে ইসলাম প্রচার করিলেন, তাহার মধ্যে মহম্মদের প্রতিমূর্ত্তির কোনও পূজা নাই, স্থান নাই বা প্রয়োজন নাই। এখানে হজরত মহম্মদের আত্মবিলোপের চেষ্টাটী বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তিনি ত' শস্ত্রধারী, রণকুশল, প্রবল-প্রতাপান্বিত একজন যোদ্ধা বা সেনাপতিও ছিলেন। তিনি নিজের পূজাকে প্রবর্ত্তিত কেন করিলেন না? নিজের পূজা-প্রবর্ত্তন না করিয়াই তিনি

প্রতিটী মুসলমানের প্রাণপ্রিয় রসুল হইয়া রহিলেন। নিজের নামটীকে ইসলামের মুলমন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া তিনি নিজের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার চেয়ে অনেক বড় কাজ করিয়া গেলেন। দলে দলে পরবর্ত্তীরা আর নিজ নিজ মূর্ত্তি-পূজার প্রবর্ত্তনে নামিতে পারিল না, বারো শত বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক মুসলমান মহম্মদের নামের মহিমায় একমাত্র আল্লাকে ভজিতে তৎপর রহিল। হজরৎ মহম্মদ কেবল ধর্ম্মদাতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবিকারও দাতা। যাহারা তাঁহার যুগে মুসলমান হইয়াছে, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে হাতে পাইয়াছে যুদ্ধের অস্ত্র, বক্ষে পাইয়াছে বর্ম্ম, নিতম্বতলে পাইয়াছে রণপটু অশ্ব। কর্ম্মমার্গের এই কঠোর প্রবৃত্তি তাহাদের সাধারণ ভাবালুতা ও ভিন্ন-মার্গাভিমুখতাকে দমন করিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আর তোমাদের কি হইয়াছে? এক এক জন করিয়া ধর্ম্মপ্রবক্তার আবির্ভাব ঘটিয়াছে আর এক একটা মন্দির গড়িয়া তোমরা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পূজার হিড়িক সৃষ্টি করিয়াছে। নিত্য নূতন সাধক পুরুষের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তোমরা নিত্য নূতন ধর্ম্মপন্থার প্রসার সাধন করিতেছ এবং তোমাদের "যত মত" গিয়া "তত পথে" পরিণত হইলেও অবতারে অবতারে বিরোধ বাঁধিতে অসুবিধা ঘটে নাই। ধর্ম্মের মধ্যে যাহাদের এত বিচিত্রতা, তাহারা তাহাদের সহিত একত্বানুভব করিবে কি করিয়া, যাহারা অতিরিক্ত বিচিত্রতাকে সযত্নে দাবাইয়া রাখিয়া এক মহম্মদকে রসুল ও

এক আল্লাকে উপাস্য বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখিয়াছে? তোমাদের ধর্ম্মমত উহাদের মধ্যে প্রচার করিবে আর উহাদের ধর্ম্মমত তোমাদের মধ্যে প্রচার করিবে,—ইহা পরস্পরকে বুঝিবার পক্ষে একটী সদ্‌ব্যবস্থা। কিন্তু একের ধর্ম্মমত অপরে গ্রহণ করিবেই, এরূপ আশা করার প্রয়োজন কি? একে অপরের ধর্ম্মমত জানিয়া নিজের মনকে তাহার সম্পর্কে সর্ব্বতোভাবে বিদ্বেষমুক্ত করিয়া লইল, ইহার প্রয়োজন আছে। এ কাজটী করিবার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি যাঁহারা সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়েরই কল্যাণ সাধন করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সহস্রশঃ কৃতজ্ঞতা জানাইব।

"কিন্তু প্রশ্নটা কেবল হিন্দু আর মুসলমানকে নিয়া নহে। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইহুদী, বৃক্ষপূজক, প্রস্তর-পূজক, ভূত-প্রেতের পূজক বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী সকলকে লইয়াই পৃথিবীর সুবিস্তীর্ণ মানব-সমাজ। ইহাদের প্রতিজনকে প্রতিজনের প্রতি প্রেমাকৃষ্ট করিতে হইবে। অশনে, বসনে, বিচরণে সামাজিক জীবনে ইহাদের প্রত্যেককে এক করিয়া দেওয়া একটী অসম্ভব ব্যাপার। সকলের নাম একটী মাত্র ভাষায় রাখিয়া সকলের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করিবার কল্পনাও হয়ত কখনো কেহ কেহ করিবেন। কিন্তু তাহা একদিকে যেমন অসম্ভব, অন্য দিকে তেমন নিষ্প্রয়োজনীয়। বিচিত্র এই ধরিত্রীর বক্ষ হইতে বিচিত্রতাকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া কোনও অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার নহে, সহস্র বিচিত্রতার মধ্যেও একত্ব-বোধকে জাগ্রত

করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনই সকলের চেয়ে অধিকতর গরীয়ান্। জগতে বিচিত্র ধর্ম্ম থাকিবে, বিচিত্র খাদ্য থাকিবে, বিচিত্র সমাজ থাকিবে, বিচিত্র মনোভঙ্গী সব থাকিবে, কিন্তু বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ যে পশু বা পক্ষীর মত নহে, এই বোধকে জাগ্রত করিতে হইবে। হিন্দু হিন্দু থাকিয়াই পশুপক্ষীর মানসিক স্তরের উর্দ্ধে বিরাজ করুক, মুসলমান মুসলমান থাকিয়াই তাহা করুক, খ্রীষ্টান খ্রীষ্টান থাকিয়াই তাহা করুক, নাস্তিক নাস্তিক থাকিয়াই তাহা করুক। আমি যে মানুষ, এই বোধটা যদি আমার লুপ্ত হইয়া যায়, তবে আমি মিলিতেই বা যাইব কাহার সঙ্গে, মিলিয়াই বা কি লাভ হইবে? প্রতিটি মানবদেহধারীর অন্তরে 'আমি মানুষ' এই বোধটীকে জাগাইতে হইবে। আমাদের প্রয়োজন হইতেছে জাগরণের সেই উপায়টীকে খুঁজিয়া বাহির করা।

ব্রহ্মচর্য্যই সারাৎসার

"ভারতের প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্যকে সেই উপায় বলিয়া জানিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য কথাটা শুধু বীর্য্য ধারণেরই ইঙ্গিত করে না, এক বিন্দু বীর্য্যের সহিত যে অতীতের বহুপুরুষব্যাপী সাধনার সারতত্ত্ব ক্ষরিত হইয়া পরবর্ত্তী পুরুষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই কথাটীও ইহার ভিতরে রহিয়াছে। এক বিন্দু শুক্র যে বর্ত্তমান পুরুষটীর নিকট হইতে ক্ষরিত হইয়া তাহার পরবর্ত্তী পুরুষের দেহটীর নির্ম্মাণে সহায়তা করিবে,

'ব্রহ্মচর্য্য' মাত্র ততটুকু কথাই বলে না। এই শুক্রবিন্দু পুরুষানুক্রমিক সাধনে বহিয়া নিয়া পরবর্ত্তী বহু শত বৎসরের পরের মানুষকেও উন্নত হইতে উন্নততর, মহৎ হইতে মহত্তর, জ্ঞানবান্ হইতে জ্ঞানবত্তর, শক্তিমান্ হইতে শক্তিমত্তর, মহীয়ান্ হইতে পরমমহীয়ান্, গরীয়ান্ হইতে পরমগরীয়ান্ করিবে,— 'ব্রহ্মচর্য্য' কথাটুকু এই ইঙ্গিতকেও বহন করে। ব্রহ্মচর্য্য কেবল সন্ন্যাসী সৃষ্টির জন্যই আবশ্যক নহে, গৃহী সৃষ্টির জন্য, সদ্‌গৃহীর যোগ্য পিতাকে মাতাকে সৃষ্টির জন্য, সদ্‌গৃহীর যোগ্য পিতামহকে পিতামহীকে সৃষ্টির জন্য, সদ্‌গৃহীর যোগ্য প্রপিতামহকে প্রপিতামহীকে সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন।

"সুতরাং কাহারও ধর্ম্মমতের বা ধর্ম্মবিশ্বাসের উপরে বিন্দুমাত্রও হস্তক্ষেপ না করিয়া যদি ধারাবাহিক ভাবে অতীব দীর্ঘকাল সমগ্র ভারত ব্যাপী এবং সমগ্র জগৎ জুড়িয়া ব্রহ্মচর্য্যের বাণী আমরা কেবলই ছড়াইয়া যাইতে সমর্থ হই এবং নিজেদের প্রতিজনের ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলনকে সযত্নে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে থাকি, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব হইতে সমুৎপন্ন নবজাগ্রত এক চেতনা ভেদ-বিচ্ছেদ-বিরোধ-প্রপীড়িত মানবসমাজের নিকটে এক নূতন পন্থার নির্দ্দেশনা প্রদান করিবে, যাহা সত্য সত্যই সকলে অনুসরণ করিতে পারিবে, অনুসরণ করিতে রুচি বোধ করিবে, অনুসরণ করিয়া লাভবান্ হইবে। ব্রহ্মচর্য্যকে মুলবস্তু বলিয়া গ্রহণ করার ফলেই ভারতে এমন এক প্রদীপ্ত

সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল, যাহা কালের করাল গ্রাসে আজও বিলুপ্ত হয় নাই, অথচ সম-সাময়িক আরও কত সভ্যতার তরঙ্গ জগতে উঠিল আর বিলীন হইল। ব্রহ্মচর্য্যকে তপস্যার সার বলিয়া পরিগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর জীবনে এমন এক রূপান্তর আসিবে, যাহার ফলে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, অতীতের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রকৃত শক্তিমান কি করিয়া হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যকে মনুষ্য-জীবনের সারসত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে, খ্রীষ্টান দেখিতে পাইবে যে, ঘরে ঘরে স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টের তুল্য অসাধারণ পুরুষেরা কাহারও পুত্র হইয়া কাহারও পৌত্র হইয়া সানন্দে বিচরণ করিয়া ধরিত্রীকে মিলনানন্দে পূর্ণ করিয়া দিতেছে। ব্রহ্মচর্য্যকে নিজেদের জীবনে এবং সামাজিক আচরণে তথা যাবতীয় সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যে যোগ্য স্থান দিতে পারিলে আজিকার মুসলমান সুদূর ভবিষ্যতে এমন অত্যদ্ভুত মর্য্যাদার অধিকারী হইবে যে, পৃথিবীর একটী প্রাণীকেও ডাকিয়া আনিয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে হইবে না, মানুষ নিজের প্রাণের পরিপূর্ণতর অভীপ্সা পূরণের পুণ্যময়ী প্রেরণায় স্বেচ্ছায় গিয়া ইসলামের পতাকা-তলে স্থান লইবে।

"এক এক ধর্ম্মের এক এক রকমের বিশেষত্ব আছে। ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম্ম নিজেকে প্রচারে পটু এবং সচেষ্ট। বিপুল প্রচার-প্রচেষ্টা না থাকিলে মাত্র দুই হাজার বৎসরে বা বারো শত বৎসরে পৃথিবীতে খ্রীষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বী বা মুসলমান-

ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা এত বাড়িতে পারিত না। বস্তুতঃ এই দুই ধর্ম্মাবলম্বীদের নিজ ধর্ম্ম প্রচারের উদ্যম অপরাজেয় এবং অব্যাহত। একজনকে নিজ-ধর্ম্মাবলম্বী করার মত পুণ্যকার্য্য ইঁহাদের নিকটে আর কিছু আছে কিনা, সন্দেহ। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মে এই বিশেষত্বটী ছিল না এবং নাই। হিন্দু অপরের ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া মনে মনে বলিয়াছে,—"যাহা করিতেছে, ভালই করিতেছে। পরমেশ্বরকেই ত' ভজনা করিতেছে। আমরা যে ঢংয়ে করি, সেই ঢংয়ে নহে, ইঁহাদের ঢং একটু আলাদা। হউক আলাদা, আমাদের তাহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। আমরা যেই পরমেশ্বরকে চাহিতেছি, ইঁহারাও ত' তাঁহাকেই চাহিতেছে। সব নদী ত' এক সমুদ্রেই পড়িবে।" নিত্য নূতন মতবাদীদের সংস্পর্শে আসিয়া বহু কাল হিন্দুরা তাহাদিগকে সহিয়া নিয়াছে। চাতুর্ব্বর্ণ্য-শাসিত নিজেদের সমাজের মধ্যে কোনও একটা বর্ণে স্থান দানের পরে বলিয়াছে, তোমরা তোমাদের পূজা অর্চ্চনা করিয়া যাও, বাধা কি? কিন্তু যখন বাহুবলদৃপ্ত বিদেশী ধর্ম্ম অস্ত্রবলে দেশাধিকার করিয়া নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল, তখন যেন হিন্দুর মেজাজে পরিবর্ত্তন ঘটিল। যে হিন্দুর ধর্ম্মে দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় পাশাপাশি অবস্থান করিয়া ধর্ম্মীয় উপলব্ধিতে নিজ নিজ অবদান পুঞ্জিত করিতেছিলেন, সেই হিন্দু ক্ষত্রিয়েরা নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, নিবৃত্ত বা পরদাস হইয়া আধ্যাত্মিক জীবন হইতে অপসৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে

ব্রাহ্মণকে কমঠ-নীতি অবলম্বন করিয়া আবার নবাগত বিদেশী ধর্ম্মাবলম্বীদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হইল। ধর্ম্ম যখন ক্ষত্রিয়ের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হয়, তখন তাহার আত্মরক্ষার তাগিদ বাড়িয়া যায় এবং তখন সে নিজের পরিধিকে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর করিয়া নিয়াও কোনও প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার অভিলাষ করে। ভারতে হিন্দু-রাজত্বের অবসানের পরে হিন্দুরাই মাত্র এইরূপ একটী উপায় অবলম্বন করিয়া আত্ম-সঙ্কোচনের মধ্য দিয়া আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করিল, তাহা নহে। ব্যাবিলন হইতে নির্ব্বাসন প্রত্যাগত ইয়াহুদীরা জেরুজালেমে ফিরিয়া আসিয়া ঠিক এই অবস্থাতেই পড়িয়াছিল। এজ্‌রা আন্তর্জ্জাতিক বিবাহকে আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কারণ রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা যাহাদের অস্তমিত হইয়াছে, আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ দ্বারা তাহারা তাহাদের বিশেষ চরিত্রকে বিলুপ্ত করিতেই বাধ্য হয়। ইস্‌রায়েল ধর্ম্মের প্রকৃত সারবস্তু তাহাদিগকে সকল বিদেশীদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে বাধ্য করিল। রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা যখন সফল হইবার কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারিল না, তখন তাহারা নিজ ধর্ম্মের প্রতি সুদৃঢ় ভাবে নিষ্ঠাবান্ হইয়া থাকিবার ভিতরেই বাঁচিয়া থাকিবার শ্রেষ্ঠ উপাদান সংগ্রহ করিল। প্রবল-পরাক্রান্ত গ্রীস ও রোম কর্ত্তৃক ইয়াহুদী ভূমি পর পর সুদীর্ঘকাল ধরিয়া গ্রাস করিয়া রাখা সত্ত্বেও ইয়াহুদীরা অটল

অচল হইয়া নিজেদের ধর্ম্ম এক প্রকার সঙ্কীর্ণতা দ্বারাই রক্ষা করিল, যেমন করিয়া সমুদ্রগর্ভস্থ শৈলশৃঙ্গ সহস্র ঝঞ্ঝাবাত্যা ও তরঙ্গোৎক্ষেপ সত্ত্বেও অটল অচল থাকে। ক্ষাত্রশক্তির অবনতি বশতঃ যখন ইয়াহুদীরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিল, তখন তাহারা অত্যদ্ভুত ধর্ম্মীয় কমঠ-নীতি দ্বারাই আশ্চর্য্য-জনক ভাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার কৃতিত্ব দেখাইতে তৎপর হইল। এই ইয়াহুদী জাতি আশ্রয়ার্থী-রূপে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু নিজেদের ধর্ম্মীয় বিশেষত্ব কদাচ বিসর্জ্জন দিতে চাহে নাই। স্পেনে, ফ্রান্‌সে, ইটালিতে, জার্ম্মেণিতে, ইংল্যাণ্ডে কত দেশেই তাহারা গিয়াছে আর অকথ্য অত্যাচার ও দুঃসহনীয় অবিচার ও লাঞ্ছনা সহিয়াছে। কিন্তু আমেরিকায় গিয়া তাহারা নিজেদের এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহ গড়িয়াছে, যাহার ফলে একদা তাহারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। অবস্থা-বিশেষে পড়িয়া কমঠ-নীতি কেবল হিন্দুরাই গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় নাই, পরন্তু ইয়াহুদীদের জাতীয় জীবনেও ইহার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। স্বাভাবিক প্রয়োজনেই হিন্দুকে সঙ্কীর্ণতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ভারতের হিন্দু দীর্ঘকাল এভাবে মরার মত বাঁচিয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ দেহ তাহার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া ইংরাজ-শাসন-কালে অনেক মহানুভব ব্যক্তির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহাদের অনেকেই

প্রাচীন অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের ভিতরে মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইলেন। ভারতের দীনতম সন্তান আমি,—আমি খুঁজিয়া পাইলাম আরও একটী স্থানে, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য।

বিধবার দান

"সতীদাহের নামে অনেক মহামনা ব্যক্তির প্রাণে করুণা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা যুগোচিত ভাবে তাহার প্রতীকারও করিয়াছেন। আমি কিন্তু ঐ দুর্দ্দম দুঃখময় ব্যাপারটীর পিছনে একটী ক্ষুদ্র রজত-রেখা দেখিতে পাইয়াছি। তাহা হইতেছে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য শব্দটা অভিধানেই ছিল। কদাচিৎ দুই একজন শাস্ত্র পাঠের সময়ে শব্দটাকে উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু জীবনের ভিতরে ব্রহ্মচর্য্যকে কাহারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনাদি যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিয়াছেন, বল ত'? হিন্দু-সমাজের অনাদৃত এক অংশে নীরবে অশ্রুমোচনকারিণী একদল বিধবা লোকচক্ষুর অগোচরে একটী আদর্শকে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন,—তাহা ব্রহ্মচর্য্য। তাঁহাদের এই নিঃশব্দ আত্ম-বিসর্জ্জনের কি সার্থকতা আছে, তাহা নিয়া বিতর্কের ঝড় কম ওঠে নাই। বিধবার পুনর্বিবাহের আইনও প্রণীত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। তবু বিধবারা ব্রহ্মচর্য্যকেই যেন সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, ছাড়িবেন না। তোমার, আমার এবং সকলের অজ্ঞাতসারে

তাঁহারা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগী, তপস্বী ও যতিদেরও পথ-প্রদর্শিকা হইয়া আছেন। কোন্ মঠের কোন্ মণ্ডলেশ্বর কোন্ বস্তু আহার করিবেন বা করিবেন না, তাহা জানিতে হইলে, শাস্ত্রের পুঁথি পড়িয়া লাভ নাই, যে-কোনও পল্লীর ক্ষুদ্র একটী অন্ধকার কুটীরে একটী নিষ্ঠাবতী বিধবার কাছে যাও। দেখিবে, তিনি কি খাইবেন আর কি খাইবেন না, তাহার উপরেই নির্ভর করিবে যে, ভারতের সর্ব্বস্থানে সর্ব্বস্তরে সব চেয়ে সম্মানী সাধু, সন্ত, মহাপুরুষেরা কোন্ খাদ্যকে বর্জ্জনীয় বা গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিবেন। যতদিন ভারতবর্ষে অন্ততঃ একটী মাত্রও নিষ্ঠাবতী বিধবা জীবিত থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত দীর্ঘকালের সংস্কার-সেবিত সুপথ্যকে বর্জ্জন করিয়া দীর্ঘকালের পরিবর্জ্জিত নূতন খাদ্যকে সজ্জন নামে পরিচিত মানুষদের মধ্যে প্রচলন করা এক অসাধ্য ব্যাপার জানিও।

হিন্দু ও গোমাংস

"একদা হিন্দুরা গোমাংস সেবন করিতেন বলিয়া একটা কথা বর্ত্তমানে খুবই আলোচিত হইতেছে। খাইতেন, একথা সত্য হইতে পারে, সত্য নাও হইতে পারে। এখন খাওয়া যে দোষাবহ মনে করেন, ইহা ত' সত্য! কি কারণে দোষাবহ জ্ঞান করেন, তাহা সম্পর্কে তাঁহাদিগকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করিতে চাহিলে, অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের কাছেও অনুরূপ

কৈফিয়তের দাবী আসিতে পারে। তার চেয়ে ইহাই ভাল কথা যে,—আপরুচি খানা, যে যাহা খাইবার, নিজের পছন্দমত খাউক।

মানুষে মানুষে মিলন

"খাওয়া-দাওয়া এক রকম না করিলে জাতিতে জাতিতে ঐক্য আসিবে না, সম্প্রীতি জন্মিবে না, এই সব ধারণা মধ্যযুগীয়। সকলকে নিজ নিজ রীতি-নীতিতে স্বাধীনতা দিয়াও তাহার সহিত যে সম্প্রীতি স্থাপন, ইহাই স্থায়ী শুভপ্রদ। হিন্দু-মুসলমানের বর্ত্তমান মত-পার্থক্যকে খুব বড় করিয়া দেখিবার প্রয়োজন দেখি না। আরও কত পার্থক্য আসিবে, আরও কত অশান্তি, রক্তপাত, গৃহদাহ, নারী-নির্য্যাতন ভবিষ্যতে ঘটিবে, কেহ জানে না। যদি আরও এক শতাব্দী এইরূপ ভয়াবহ অবস্থা চলে, তথাপি আমরা প্রত্যাশা করিব যে, একদা মানুষকে মানুষের মত দেখিব এবং মানুষের সহিত মানুষের মিলন নিশ্চয়ই স্থাপিত হইবে। দেশজয়ের ইতিহাসই মানব-সভ্যতার ইতিহাস নহে। মানুষ যে মিলিতে শিখিল, তাহার ইতিহাসই মানব-সভ্যতার ইতিহাস। একদা এক মানুষ অপর মানুষকে মারিয়া আগুনে সেঁকিয়া অর্দ্ধদগ্ধ মাংস খাইত। সেই মানুষ অন্য মানুষকে নিয়া সমাজ গড়িল। সেই মানুষ অন্য গোষ্ঠীর সহিত নিজের গোষ্ঠির কুটুম্বিতা স্থাপন করিল। সেই মানুষ আজ পৃথিবীব্যাপী সকল মানুষের

সহিত সৌহৃদ্য, আত্মীয়তা কুটুম্বিতা স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করিতেছে। সেই মানুষই একদা তাহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা সামলাইয়া লইয়া সকল মানুষকে একত্র বসাইয়া নীবার-কণায় দগ্ধোদর তৃপ্ত করিবার কালে আনন্দ সহকারে একদা বলিবে,—'পাইয়াছি, সকলকে আমি আমার বক্ষে পাইয়াছি, আমি গর্ব্বিত, আমি ধন্য।' সেই দিনই মানুষ প্রকৃত সভ্য হইবে।"

অপরাহ্ণে বর্দ্ধমান হরিসভাতে ভাষণ সুরু হইল। অদ্যও হরিসভার হলেই বক্তৃতা হইল, হলে কিছু জনসমাগমও হইয়াছিল। কিন্তু ঐ হলে যে পরিমাণ জনতার স্থান-সঙ্কুলান হইতে পারে, জনতা তার অপেক্ষা কম ছিল।

বর্দ্ধমান প্রকৃতই বর্দ্ধমান

বক্তৃতারম্ভে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রচারের দিক দিয়ে আমরা কোনো ত্রুটী রাখি নাই। আমি কোথাও গেলে প্রচারের দায়িত্ব স্থানীয় লোকের উপরে রাখি না। কারণ, সৎকথা প্রচারে আমারই লাভ বেশী। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে নির্ম্মাণ কর্‌বেন যাঁরা, তাঁদের খুঁজে বের করাই আমার প্রধান কাজ। ভিক্ষা কর্‌তে বা চাঁদা তুলতে আমি কোথাও আস্‌বার ক্লেশ স্বীকার করি না, ভিক্ষায় বা চাঁদায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই। স্বাবলম্বন-প্রতিষ্ঠা আমার ক্ষুদ্র কর্ম্মচেষ্টা বাইরের আর্থিক সহযোগের জন্য লালায়িতও নয়।

মনে যখন যে সদ্‌ভাবটী জাগ্রত হয়, তখন তা' সর্ব্বসাধারণকে শুনিয়ে দিয়ে বুকের বোঝা কমাবার জন্যই আমি স্থান থেকে স্থানান্তরে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ ক'রে বেড়াই। তাই, এই সহরে এসে প্রচার-কর্ম্মের কোনো ত্রুটী আমি থাক্‌তে দিই নাই। কিন্তু সভাস্থলে লোকসংখ্যার অল্পতা সত্যই বিস্ময়কর। বহুশ্রুত বর্দ্ধমান সব দিনই এরূপ ক্ষীয়মাণ অবস্থায় থাক্‌বে ব'লে বিশ্বাস করি না। সুতরাং আজ দ্বিতীয় দিনেও আপনারা অতীব স্বল্প-সংখ্যায় এসেছেন ব'লে মনে লজ্জার গ্লানি রাখ্‌বেন না। আমি এই সহর থেকে চলে যাবার আগে নিশ্চয়ই প্রমাণ ক'রে যাব যে, বর্দ্ধমান প্রকৃতই বর্দ্ধমান, কদাপি ক্ষীয়মাণ নয়।

জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের ব্যর্থতা

বক্তৃতা অন্যও আড়াই ঘণ্টাকাল চলিল। এই আড়াই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে একটী শ্রোতাও ক্ষণকালের জন্য কণামাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অতীত ভারতবর্ষ শিক্ষা-সমস্যার কি ভাবে সমাধান করেছিলেন, তার একটা স্পষ্ট পরিচয় আজ আমাদের পাওয়া প্রয়োজন। ইংরাজি ১৯০৫ সাল হ'তে ১৯১৪-১৫পর্য্যন্ত আমরা আমাদের দেশে শিক্ষাপদ্ধতির সংশোধনের চেষ্টা কত্তে গিয়ে অনেকগুলি

জাতীয়-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছি কিন্তু সেগুলি যে প্রকৃত প্রস্তাবে বিদেশীদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, একথা আমরা বুঝতে পারি নি। যে শিক্ষার বনিয়াদে নাই ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা, যে শিক্ষার বিস্তারে নাই ব্রহ্মচারি-জন-সুলভ পবিত্র দৃষ্টির প্রসার, যে শিক্ষা দেহের অস্তিত্বকে দেহাতীত সত্যকে উপলব্ধি করার প্রয়োজনে প্রয়োগ করার সুগম পন্থা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত, কাতর বা অক্ষম, যে শিক্ষা ব্যক্তিত্ববোধের প্রাখর্য্যকে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনের প্রয়োজনে নিয়োজিত করার দিকেই দিবে প্রশ্রয়, যে শিক্ষার মধ্যে বিশ্বাভিমুখী সার্ব্বভৌম চেতনার নাই সুসম্মানিত স্থান, সেই শিক্ষাকে ভারতবর্ষ কদাপি জাতীয় শিক্ষা ব'লে স্বীকার কত্তে পারে না। স্বদেশী বোতলে বিদেশী সুরা ভরার মতনই এক হাস্যাস্পদ প্রয়াস হ'য়ে দাঁড়াল আমাদের দেশব্যাপী জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনটী। অথচ যাঁরা এই আন্দোলনের হোতা, তাঁরা অন্তরে অতীব শুদ্ধ ও পূর্ণতঃ সাত্ত্বিকী উপলব্ধি নিয়েই কাজে নেমেছিলেন।

জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁরা জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে অতীব শুদ্ধ চেতনা ও পূর্ণতঃ সাত্ত্বিকী উপলব্ধি

নিয়েই কাজে নেমেছিলেন, তবু তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হ'ল কেন? এটী একটী সঙ্গত প্রশ্ন। এর উত্তরও আছে। শিক্ষা যাদের জন্য, তাদের জীবনের লক্ষ্য কি? তা' কি অর্থার্জ্জন নয়? তা কি পরিজন-প্রতিপালন নয়? তা কি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের দায়িত্ব-পালন নয়? কিন্তু সরকারী চাকুরী আর নকরী পেলে মানুষ যত নিশ্চিন্ত, অন্য কোনও জীবিকায় কি মানুষ তত নিশ্চিন্ত? বিদেশী শাসক দেশের শাসন-কার্য্য পরিচালনের জন্য থানায়, কাছারিতে, ডাকঘরে এবং আরও কত কত স্থানে কত কত লোককে চাক্‌রী-বাকরী দিয়ে পালন কচ্ছেন, তার দিকে নজর না রেখে শিক্ষার্থীরা কতকাল জাতীয় শিক্ষা নামধারী একটা ভবিষ্যৎ-সুযোগ-বর্জ্জিত শিক্ষাকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে থাক্‌বে? ছাত্র-সংখ্যায় স্ফীতাতিস্ফীত জাতীয় বিদ্যালয়গুলি আস্তে আস্তে ছাত্র-বিরল হ'তে লাগল, শিক্ষকেরা ভিন্ন জীবিকার দিকে আকৃষ্ট হ'তে লাগলেন, আস্তে আস্তে একটী একটী ক'রে জাতীয়-বিদ্যালয়ের ছাদনের চালা বা ঘরের বেড়া উইপোকার উৎপাতে আর ঝড়বৃষ্টির দাপটে খসে পড়তে লাগল, আস্তে আস্তে একটী একটী ক'রে হাজার হাজার বিদ্যালয়ের মুক্ত দুয়ার রুদ্ধ হ'য়ে গেল। আন্দোলনগুলি থেমে গেল, জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয় মানুষ ভুলে গেল।

শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষ গড়া। মানুষ হ'তে হ'লে তাকে নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জন ক'রে নেওয়াও শিখ্‌তে হয়, কিন্তু অন্নার্জ্জনটাই তার শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। দুমুঠা অন্নের জন্য সে পরদাস হবে না, পরশ্রমার্জ্জিত অন্ন কৌশলে গ্রাস ক'রে সে জীবন-ধারণ কর্ব্বে না, পরপিণ্ডোপজীবী হ'য়ে সে দেশের আর্থিক দুর্গতিকে বাড়াবে না,—এগুলি ত' তার জীবন গঠনের প্রধান সর্ত্ত হবেই, পরন্তু সে অপরকে অন্নদানের সামর্থ্য অর্জ্জন কর্ব্বে অপরের ভিতরে অন্নার্জ্জনের সামর্থ্য বর্দ্ধন কর্ব্বে, অপর দশ জন বুভুক্ষুর জঠর-জ্বালার সঙ্গে নিজের জঠর-জ্বালাকে মিলিয়ে নেবে, কেবল নিজের জন্য না বেঁচে আর দশ জনের জন্যও বাঁচবার চেষ্টা কর্ব্বে, স্বার্থপর কূপমণ্ডূকের জীবন-যাপন না ক'রে পরার্থপর উদারহৃদয় জগৎ-প্রেমিকের জীবন-যাপন কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্বে, তার শিক্ষা লাভের এগুলিও অপরিবর্ত্তনীয় সর্ত্ত হওয়া প্রয়োজন। গণ-মানসে এই প্রয়োজন-বোধটীও জাগ্রত করা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। গণ-চেতনায় প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনকে উদ্ভাসিত করা যায় নি। ভাসা-ভাসা আন্দোলন চারিদিকে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে, প্রেরণার জন্মদান করে নি।

ভবিষ্যতেরই জন্য অতীতকে পুনরাবিষ্কার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই বিপত্তির মূলে আমাদের অজ্ঞতা যতখানি কাজ করেছে, বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি আমাদের মজ্জাগত মোহ, বিদেশী চিন্তাধারার প্রতি আমাদের অন্ধবৎ অনুকরণের স্পৃহা এবং মুখে স্বদেশীর গালভরা বুলি থাক্‌লেও যা-কিছু বিদেশী, তার প্রতি অন্তরের অন্তরে দাস-সুলভ অনুরাগ তার চেয়ে শতগুণ কাজ করেছে। ফলে আমরা আমাদের অতীতের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কতটুকু ভাল ছিল বা থাকা সম্ভব, তা সম্ভবতঃ অনুসন্ধান ক'রে দেখিনি। অতীতকে নূতন ক'রে আবিষ্কার কত্তে পারার আগে যে ভবিষ্যতের জন্য আমরা কর্ম্মপন্থা সঠিক ভাবে নির্ণয় কত্তে পার্ব্ব না, এই কথাটি হয়ত আমরা ভুলে গিয়েছিলাম।

বিদ্যাদাতার অন্নদাতা-রূপ যুগ্ম-ভূমিকা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অতীতের অধ্যাপক কেবল শিক্ষকই ছিলেন না, ছাত্রের অন্নদাতাও ছিলেন। পৃথিবীতে আর্থিক ব্যাপারে যতই অনটন বা জটিলতার সৃষ্টি ঘটে থাকুক না কেন, গুরুগৃহে শিষ্য অন্ন-পান লাভ ক'রে বিদ্যার্জ্জন কর্ত্তো, এই সুপ্রাচীন আদর্শটির মধ্যে একটা বিশেষ সার্থকতার

বীজ লুক্কায়িত আছে। গুরুকে বেতনগ্রাহী ভৃত্য রূপে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাত্রগণ আজ শিক্ষকগণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে এত পরাঙ্মুখ যে, শিক্ষকও মনে মনে নিজেকে একটা চাকর ছাড়া আর কিছু জ্ঞান করেন না। তারই জন্য দেখা যায়, পরীক্ষার হলে শিক্ষক ছাত্রের খাতা নকল ক'রে দিতে লজ্জা-বোধ করেন না, পরীক্ষার সময়ে বই দেখে টুকে লিখতে সহায়তা কত্তে কুণ্ঠা বোধ করেন না, গোপনে প্রশ্নপত্র চুরি ক'রে এনে ছাত্রকে সরবরাহ কত্তে তাঁর মনে দ্বিধা আসে না। বিদ্যার্থী যেখানে অধ্যাপকের নিকটে আকণ্ঠ ঋণী, সেখানেই বিদ্যার্থীর শ্রদ্ধা এমন এক উচ্চ গ্রামে আরোহণ কত্তে পারে, যেখানে পৌঁছুলে বিদ্যার্থী তার অধ্যাপকের সম্মান রক্ষার জন্য প্রয়োজন স্থলে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে। নূতন যে যুগ ভারতবর্ষে প্রত্যাসন্ন ব'লে আমাদের প্রত্যাশার পর প্রত্যাশা, সেই যুগে অধ্যাপক মাত্রেই বিদ্যার্থীদের অন্নার্জ্জনের যোগ্যতাবর্দ্ধনে নিজেদের জীবনোৎসর্গ কর্ব্বেন, এইটাই স্বাভাবিক। কি কি ঘটনাবলী পরম্পরা-ক্রমে আমাদের সম্মুখে এসে অদূর এবং সুদূর ভবিষ্যতে আত্মপ্রকটন কর্ব্বে, তা' আমরা আজই অনুমান কত্তে সমর্থ হচ্ছি না বটে কিন্তু ভারতের যাবতীয় জাতীয় আন্দোলন নব নব রাষ্ট্রীয় চিন্তার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতিজনকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ ক'রে এই কথাটিই বল্‌ছে যে, উপায় থাকুক আর না থাকুক, "অন্নং

বহু কুর্বীত—প্রচুর অন্ন অর্জ্জন কর",—এই মহাবাক্যকেই শিক্ষাদানের মধ্যমণি ব'লে মেনে নিতে হবে। নতুবা সঙ্কটের পর সঙ্কট দেশকে ঘিরে ফেল্‌বে।

আলোচনার ফললব্ধ প্রত্যয়কে রূপদান প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রকৃত সমস্যাকে চিনে নিতে আমরা যত বেশী ক'রে দেরী করব, সমস্যার গভীরতা এবং বিপজ্জনকতা তত বেশী ক'রে দুরপনেয় হ'তে থাকবে। প্রতিটি মিনিটে দেশের লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘট্‌ছে। অর্থাৎ, প্রতিটি মিনিটে মানুষের জন্য অধিকতর খাদ্যের জন্য দাবী বেড়ে যাচ্ছে। শিশুরা চীৎকার কত্তে পারে কিন্তু আন্দোলন কত্তে পারে না, এই শিশুরাই একটু বড় হ'লে দেশময় ক্ষুধার অন্ন দাবী ক'রে আন্দোলন চালাবে। তখন তাদের দমন করার জন্য কত বন্দুক, কত বেয়োনেট, কত কামানের প্রয়োজন হবে। দেশের অর্থ নানা ছিদ্রপথে অবিরাম বিদেশে চ'লে যাচ্ছে ব'লে দেশের ঐশ্বর্য্য দেশের সম্পদ-সম্ভাবনা-বৃদ্ধির কাজে নিয়েজিত হ'তে পাচ্ছে না,—একদিকে এইটী যেমন এক মারাত্মক দুরবস্থা, দেশের মানুষ দেশের প্রকৃত প্রয়োজনকে চিনতে না পারার দরুণ নিজেদের কর্ম্মশক্তি একত্র ব্যূহবদ্ধ ক'রে কোনও সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনায় পরিচালন

কত্তে উদ্যত হচ্ছে না,—এইটীও তেমন আর একটী গুরুতর দুর্লক্ষণ। এখন প্রয়োজন প্রতিস্থানে দেশের প্রকৃত অবস্থাটির বিশ্লেষণাত্মক পর্য্যালোচনার জন্য লক্ষ লক্ষ আলোচনা-সভার। আর প্রয়োজন আলোচনার ফললব্ধ প্রত্যয়কে কার্য্যকর প্রয়োগে রূপদান করা।

বক্তৃতার শেষ দিক দিয়া দেখা গেল যে, বর্দ্ধমান হরিসভার হলে আর তিলধারণের স্থান নাই। অনেকেই আফশোষ করিলেন যে, বক্তা যে ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বক্তৃতারম্ভ করিবেন, তাঁহারা এই বিষয়ে ধারণা করিতে পারেন নাই বলিয়াই না-জানি কত কত কাজের কথা শুনা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

বর্দ্ধমান

১২ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২

(২৭শে জুন, ১৯৩৫ ইং)

অদ্য প্রাতে যৌগিক আসন-মুদ্রার শিক্ষার্থীর সংখ্যা এত বেশী হইল যে, হরিসভার হলের বাহিরে বৃক্ষতলে শতরঞ্চ বিছান হইল। অনেক বর্ষীয়ান এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাও আসন-মুদ্রা শিখিতে আসিয়াছেন। প্রত্যেকটী আসন বা মুদ্রা নিজে প্রদর্শন করিয়া তৎপরে তাহা যত্ন পূর্ব্বক অপরকে অভ্যাস করাইতে করাইতে শ্রীশ্রীবাবামণি আসনটীর বা মুদ্রাটীর শারীরতত্ত্ব-গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করিতেছেন।

আশা ও ভালবাসা

বেলা সাড়ে নয়টায় আসনমুদ্রার ক্লাস বন্ধ হইলে বিদায়-গ্রহণকারী একজন জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—কালকে সুদীর্ঘ বক্তৃতাদানকালে আপনাকে দেখ্তে পেলাম যেন উচ্চাঙ্গের একখানা সাহিত্য-গ্রন্থ অনর্গল পাঠ ক'রে যাচ্ছেন, সভাস্থল খালি হ'য়ে গেলে দেখলুম আপনি দিস্তা খানিক কাগজে ত্রিশ চল্লিশ খানা পত্র লিখে একটী স্তূপ করলেন। দূরে ব'সে ব'সে সব কাণ্ডখানা দেখেছি। আজ আবার প্রাতে দুটি ঘণ্টা ধ'রে আমাদের আসন-মুদ্রা শেখালেন। অথচ কণামাত্র ক্লান্তি আপনার নেই। একটুকু বিরক্তিও নেই। এত ধৈর্য্য আর এত বল আপনি কোথায় পেলেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না। গতকল্যকার-লিখিত পত্রগুলির মধ্য হইতে একখানা পত্র বাছিয়া নিয়া তাহা খাম হইতে বাহির করিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে পড়িতে দিলেন।

উক্তপত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়াছিলেন,—আমার ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, হতাশা নাই। আমার আছে আশা আর আছে ভালবাসা। আশা এই যে, অধঃপতিত দেশের, অবনত জাতির, পদানত মানবতার অভ্যুদয় একদা নিশ্চয়ই হইবে। ভালবাসা তাহাদের তরে, যাহাদের আত্মোৎসর্গে মৃতপ্রায় অকর্ম্মণ্য এই দুর্ব্বল জাতির নবজীবনোন্মেষ ঘটিবে। অফুরন্ত

আশা আর সুগভীর ভালবাসা আমার জীবনের সার-সর্ব্বস্ব ধন, অন্য ধন আমি উপার্জ্জন করিবার অবকাশ পাই নাই।

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি যে পুঞ্জীকৃত পত্র-সমূহের উত্তর দিলেন, তন্মধ্যে কয়েকখানার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল।

কাজ চালাইতে থাক

চট্টগ্রাম-রাউজান-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাজ আস্তে আস্তে করিয়া যাও। কর্ম্মে হঠকারিতা অনেক সময়ে কর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সমূলে উৎখাত করে। অবশ্য, এমন ঐতিহাসিক সময় কখনো কখনো আসে, যখন বিদ্যুতের তীব্র গতিতে এবং ভূকম্পের ভয়ঙ্করতা নিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে হয়, কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, এদেশের এক পরম শত্রু হইতেছে অকারণ সাম্প্রদায়িকতা। কে কোন্ মুখে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিল, কে কোন্ দিক ফিরিয়া ওজু-নমাজ করিল, ইহার বিচারের সহিত প্রকৃত দেশ-সেবার আসল সম্পর্কটা কি এবং কোথায়, ইহা ভাবিবার অবসর অধিকাংশ লোকেরই নাই। মানুষ মাত্রেরই নিজস্ব একটা সম্ভ্রম আছে এবং সেই সম্ভ্রমের হানি না ঘটাইয়া, মানুষের মানবিক মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন না করিয়া নিশ্চয়ই প্রতিটি সম্প্রদায়ের লোক প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রীতিপ্রদ প্রতিবেশী-রূপে বাস করিতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝি এই

যুগে হইবার উপায় নাই। এমন সব শক্তিশালী যন্ত্র পারস্পরিক বিদ্বেষ, সন্দিগ্ধতা ও অসহিষ্ণুতা সৃজনের জন্য, পরিপোষণের জন্য চালু হইয়াছে যে, প্রকৃত দেশহিতৈষীরাও ভাবপ্রবণতার এই হট্টগোলের মধ্যে নিজের দেশটার মূর্ত্তি একেবারেই দেখিতে পাইতেছেন না। বিদ্বেষের বিষবাষ্প সর্ব্বত্র চক্ষুর কাচখানাকে ঝাপসা করিয়া দিতেছে। তাই, তোমাদের একজনেরও হঠকারী হইলে চলিবে না। ধীর মন্থর গতিতে কিন্তু দৃঢ়পদে তোমাদের প্রতিজনের অগ্রসর হইতে হইবে এবং হিন্দুকেও নহে, মুসলমানকেও নহে, প্রকৃত মানুষকে তোমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মানুষ যদি পাও, তবে তাহাদের লইয়া কাজ করিতে পারিবে, অমানুষেরা যেই সম্প্রদায়েরই হউক, কেবল কাজের ক্ষতিই করিবে। আস্তে আস্তে কাজ করিয়া যাও, কাজের যেন বিরাম না ঘটে, কাজে যেন পূর্ণচ্ছেদ না পড়ে, কাজ যেন থামিয়া না যায়। সতর্কতা সহকারে পথ চল, পা যেন তৃণাচ্ছাদিত গভীর গর্ত্তে পড়িয়া জখম না হয়, পায়ে যেন অনর্থক সর্পাঘাত না ঘটে। এভাবে কেবল চলিতেই থাকিলে একদা দেখিতে পাইবে যে, দুস্তর মরুভূমির রুক্ষ আক্রোশের প্রভাব-পরিধি তুমি অনেক আগেই হঠাৎ একদিন নিজের একেবারে অগোচরে পার হইয়া আসিয়াছ। চারিদিকে যাহারা কৌতূহলী নেত্রে তাকাইয়া আছে, তাহাদের মনে সাত্ত্বিকী সেবার প্রেরণা জাগাও। চতুষ্পার্শ্বে যাহারা বিদ্বেষের ভীমরুল খেপাইয়া

বেড়াইতেছে, তাহাদের শ্রদ্ধার দৃষ্টি কি করিয়া আকর্ষণ করা যায়, তার দিকে লক্ষ্য দাও। তাহাদিগকে পর ভাবিও না, শত্রু জ্ঞান করিও না। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে যদি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পার, তবে দেখিবে, তাহারাই তোমার সব চেয়ে বড় সুহৃৎ। কাজ চালাইয়া যাও, বাধা সত্ত্বেও চালাও, বিঘ্ন সত্ত্বেও চালাও, মনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে হতাশায় দমিয়া গিয়া হালের বৈঠাকে শিথিল হইতে দিও না।"

কৃতজ্ঞতা সুমহান্ ধর্ম্ম

ঢাকা-কমলপুর নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ধর্ম্মবোধ, ধর্ম্মচেতনা, ধর্ম্মানুরাগ নানা উপলক্ষ্য করিয়া মানুষের মনে জাগিয়া থাকে। কেহ বলেন, ভয়কে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের বিকাশ, কেহ কেহ জানেন, বিস্ময় হইতেই ধর্ম্মের প্রকাশ। এতৎসঙ্গে ইহাও বলিতে পারা যায় যে, কৃতজ্ঞতা-বোধ হইতেও ধর্ম্মের অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ, যে ব্যক্তি উপকারীর প্রতি অকৃতজ্ঞ, সেই ব্যক্তি অন্য সহস্র প্রকারে নানা-গুণ-বিভূষিত হইলেও ধার্ম্মিক বলিয়া সম্মানিত হইবার যোগ্য কিনা, নিশ্চয়ই বিবেচ্য। ঋণ আছে, শোধ করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু ঋণটাকে অন্তরের অন্তরে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে মনে এক প্রকারের সুবিনীত ভাবের উদ্রেক হয়। তাহার নাম কৃতজ্ঞতা। কে আমরা কাহার নিকট

কতখানি ঋণী, তাহার সঠিক নির্দ্ধারণ সম্ভব না হইলেও, আমি সত্যই ঋণী, না সম্যক্ অঋণী, একথা বুঝিতে কোনও ক্লেশ থাকিবার কথা নহে। যে অপরের নিকট নিজের ঋণকে বুঝিতে পারিল, সে যদি মনে মনে সেই ঋণকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে স্বভাবতই তাহার যে মনোভঙ্গিমা হইবে, তাহারই নাম কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা রাজার পক্ষেও ধর্ম্ম, প্রজার পক্ষেও ধর্ম্ম। প্রজারা যে রাজাকে করদান করিয়া সমৃদ্ধ করেন, এজন্য প্রজাদের প্রতি রাজার কৃতজ্ঞতা থাকা সঙ্গত। রাজা যে প্রজাদিগকে বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে, চৌরকুল হইতে, দস্যুবর্গ হইতে নিয়ত রক্ষা করেন, এজন্য প্রজারা রাজার নিকটে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য। পিতামাতা যে নিজেদের সহস্র স্বার্থকে খর্ব্বিত করিয়া পুত্রকন্যাকে আশৈশব সযত্নে লালন-পালন করিয়া মানুষ করিয়া তোলেন, এই জন্য পিতামাতার প্রতি পুত্রকন্যার কৃতজ্ঞতা থাকা কর্ত্তব্য। হিসাব করিতে গেলে নানা ভাবে আমরা অতীত কালের অসংখ্য মানুষের, পশুর, পক্ষীর, কীট-পতঙ্গের নিকটও কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য। সকলের কাছে আমাদের কত ঋণ কত ভাবে জমিয়াছে, তাহার হিসাব-নিকাশ সম্ভব নহে কিন্তু সকলের প্রতি সর্ব্বজনীন প্রেম দিয়া আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতাকে জানাইতে পারি। কৃতজ্ঞতা কখনো কখনো অনেক পশুর মধ্যেও দেখা যায়। সেই অবস্থায় আমরা যদি মানুষ হইয়াও মানুষের প্রতি অকৃতজ্ঞ

থাকি, তবে আমাদিগকে মানুষ ত' বলা চলিবেই না, পশু বলিয়া গালি দিলেও পশুদের মধ্যে অনেককে অপমান করা হইবে। কথাটি তর্ক করিবার জন্য নহে, ভাবিয়া দেখিবার জন্য।"

নিন্দনীয় কৃতজ্ঞতা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—"কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের নাম ধরিয়া অনেক সময়ে লঘুচিত্ত ব্যক্তিদের অবচেতন মনের অনেক দুর্ব্বলতা আত্মপ্রকাশ করে, যাহা ধরা পড়িয়া যাওয়ার পরেও তাহাকে কৃতজ্ঞতা-রূপ পরম ধর্ম্ম পালনের প্রশংসনীয় প্রয়াস বলিয়া বর্ণনা করিয়া সাফাই গাহিবার চেষ্টা হয়। কৃতজ্ঞ-স্বভাব মানুষকে কিন্তু এই বিষয়টীতে সচেতন হইতে হইবে। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের জন্য যেখানে মানুষকে নিজ ধর্ম্মমত বিসর্জ্জন দিতে হইবে, নিজ ধর্ম্মপথকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, স্বকীয় চরিত্রের মহিমাকে অবনমিত করিতে হইবে, নিজ জীবন ব্রতে শিথিল হইতে হইবে, তেমন কৃতজ্ঞতা যে ধর্ম্ম নহে, বরং তাহার বিপরীত, ইহা বুঝিবার মতন স্বাধীন-চিত্ততা প্রত্যেক মানুষের থাকা কর্ত্তব্য। যে কৃতজ্ঞতা পুরুষকে পরনারীতে এবং নারীকে পরপুরুষে আসক্ত করিতে পারে, যে কৃতজ্ঞতা মানুষকে সদাচার-ভ্রষ্ট করিতে পারে, যে কৃতজ্ঞতা মানুষকে স্বধর্ম্মদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী, স্বদেশদ্রোহী

করিতে পারে, সেই কৃতজ্ঞতা কদাচ ধর্ম্ম হইতে পারে না, তাহা অতীব নিন্দনীয় অধর্ম্ম মাত্র। একজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা যখন তোমাকে বহুজনের প্রতি বিদ্বিষ্ট করিবে, একজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধ যখন তোমাকে বহু জনের শান্তিভঙ্গ ঘটাইতে উদ্যত করিবে, তখন তোমাকে বুঝিতে হইবে যে, তোমার কৃতজ্ঞতা-বোধের ভিতরে কোনও গোঁজামিল ঢুকিয়াছে। অনেকে পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার দোহাই দিয়া নিজ পিতামাতাকে নির্য্যাতিত করিয়াছে, সাধ্বী পত্নীকে হত্যা করিয়াছে, আত্মীয়-পরিজনের গৃহে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছে, এমন ঘটনা বিরল হইলেও একেবারে দুর্লভ নহে। বলিতেই হইবে যে, এসব ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ তুমি যেমন পতিব্রতা পত্নীকে বনবাসে পাঠাইতে পার না, পত্নীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ তেমন তুমি তোমার পিতামাতাকে অপমান অসম্মান করিতে পার না। কৃতজ্ঞতা উত্তম এক ধর্ম্ম কিন্তু যে কৃতজ্ঞতা মানুষকে অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম-পদবাচ্য নহে। নারী-পুরুষের স্বভাব-সঞ্জাত প্রকৃত আসক্তিকে যখন কৃতজ্ঞতার ধড়াচূড়া পরাইয়া বিনোদবিহারী মূর্ত্তিতে তুলিয়া ধরা হয়, তখন ছলনামুগ্ধ নয়ন দেখিতে পায় না যে, লালসা-রাক্ষসীর সুতীক্ষ্ণ নখর পিছন হইতে উঁকি মারিতেছে। যাহার নিকটে তোমার যতখানি কৃতজ্ঞতা সঙ্গত-

ভাবে থাকা প্রয়োজন, তাহাকে তৌল করিয়া দেখিতে হইবে। একার্য্য সহজ নহে কিন্তু মানুষের মতন বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ইহা ছাড়া উপায়ও নাই।"

ধর্ম্মজগতে কৃতজ্ঞতা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—"ধর্ম্মের জগতে কৃতজ্ঞতা আরও একটী বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে, যাহা সৃষ্টি করিয়াছে এক গোলক ধাঁধার। এই গোলক-ধাঁধায় যাহারা পড়ে, তাহারা পাণ্ডাকুল পরিবেষ্টিত গয়া-যাত্রীর দুর্দ্দশার অনুকরণ করে। কেহ কাছা ধরিয়া, কেহ কোছা ধরিয়া, কেহ শার্টের হাতা ধরিয়া, কেহ কোটের বোতাম ধরিয়া টানিতেছে আর বলিতেছে, 'তুমি আমাদের যজমান, দেখ না তোমার প্রাক্তন চতুর্দ্দশ পুরুষের সকলের নাম আমাদের খাতায় লেখা আছে, তোমাকে গয়ার পিণ্ড আমারই সাহায্যে দিতে হইবে।' মানুষ প্রকৃত পথ-প্রদর্শকের খোঁজে দুনিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, গুরু যদি মিলিয়া গেল, তবে তাঁর নির্দ্দেশ মত যৎ-সামান্য কিছু কিছু ভজন-পূজন করে। কিন্তু তাহাতেও তাহার রক্ষা নাই। চতুর্দ্দিকে ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদের দল হাজার হাজার দালাল লাগাইয়া মানুষের কেবল দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে। ফলে সরলস্বভাব মানুষগুলি একটীর বদলে পর পর তিন, চারি, পাঁচটী করিয়া গুরু করিতেছে এবং নানারূপ-প্রহরণধারী নানা দেবতার অর্চ্চনা

করিতে করিতে বিভ্রান্ত হইয়া অধিক বয়সে পাষাণময় চাতালে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। প্রতি জন গুরু এই নিরীহ সাধকটীকে কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক সম্পদ হয়ত দিয়াছেন, প্রত্যেকটীরই ঋণ তাঁহাকে স্বীকার ত' করিতেই হইবে। কিন্তু কৃতজ্ঞতার কত রকমের ট্যাক্স্ সে কত বার কত জায়গায় দিবে? শুধু ক খ গ ঘ যিনি শিখাইয়াছেন, তিনিও গুরু। এম-এ ক্লাসের পড়া যিনি শিখাইলেন, তিনিও গুরু। শত শত গুরুর হাত দিয়া একটা মানুষ আসিয়া শেষ পরীক্ষাটীর জন্য প্রস্তুত হইল। এমন সময়ে সবাই যদি এক সঙ্গে আসিয়া তাহার নিকটে 'গুরুঋণ শোধ কর' বলিয়া ডাক হাঁক ছাড়িতে থাকেন, তাহা হইলে এই বেচারীর উপায়টী কি হইবে? তাহাকে কি কিছুটা মাত্রাজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে হইবে না? বহু জনের ঋণ এক সঙ্গে শুধিতে হইলে আসল ঋণটী, সব চেয়ে বড় ঋণটী যাহার নিকটে রহিয়াছে, তাহার প্রতি আর কর্ত্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও একটুখানি হিসাবী বুদ্ধির পরিচয় প্রয়োজন।"

পুরুষ ও নারীর মতামত সমমূল্য

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের জন্য তাঁহার অনুরোধে স্বকীয় ধর্ম্মপত্নীকে তালাক্ দিয়া বন্ধুবরের

দ্বারা তাহার বিবাহ-কার্য্য-সম্পাদনের সুযোগ করিয়া দেওয়া কৃতজ্ঞতা-বোধের দৃষ্টিতে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত হইলেও, প্রকৃত ধর্ম্ম-বিচারে ইহা ক্ষমাযোগ্য কিনা, ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন। একজন আর একজনের সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইবে, ইহা কি ন্যায়তঃ একজনেরই অধিকার? অন্য জনের কি এই ব্যাপারে কিছুই বলিবার নাই? একজন ছাড়িয়া দিলেন, এই জন্য অন্য জনও কি ছাড়িতে ন্যায়তঃ বাধ্য? কাহারও শাস্ত্রে পুরুষকে এই বিষয়ে নিরঙ্কুশ অধিকার যদি প্রদান করিয়াও থাকে, তথাপি মানুষের অশাস্ত্রজ্ঞ সাধারণ বিবেক এবং সহজ বুদ্ধিবিবেচনা কি এইরূপ ব্যাপারকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া ভাবিয়া থাকে, না ভাবিতে পারে? ইহা দেখিতে হইবে। শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধারণের বুঝিবার কথা নহে, শাস্ত্রাজীব অসাধারণ পণ্ডিতেরাই তাহা বুঝিতে সমর্থ। কিন্তু সরল মানুষের সহজ মন কি সাধারণ যুক্তি-বিচারের দ্বারা ভাল-মন্দ, সুফল কুফল, ন্যায্যতা-অন্যায্যতা সম্পর্কে কোনও ধারণা করিতে পারে না, কিম্বা কোনও ধারণা পোষণ করে না? সেই দিকেও তাকাইতে হইবে। বন্ধুর নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিলেই কেহ নিজ পত্নীকে তালাক দিয়া বন্ধুর সহিত তাহার বিবাহের পথ সুগম করিয়া দিতে পারে না, যদি স্ত্রী নিজে এইরূপ ব্যবস্থায় নিজ সম্মতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রদান না করে। পৃথিবীতে প্রতিটি ব্যাপারে পুরুষের মতামত যতটা মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইবে, নারীর মতামতের মূল্য তাহা অপেক্ষা অল্প বলিয়া বিবেচিত হইবে কেন, এই প্রশ্নটী সুসঙ্গত, স্বাভাবিক এবং ধর্ম্মোপেত।"

নারীর মর্য্যাদা ও সভ্যতা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—"আমরা আমাদের কচি বয়সে সহরের নামজাদা দুই পুরুষ-বন্ধুর সম্পর্কে গাল-গল্প শুনিতাম যে, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি এমন প্রীতিবদ্ধ যে, জামা, গেঞ্জি, মোজা, রুমাল প্রভৃতি বদলের ন্যায় তাঁহারা নির্ব্বিচারে পত্নী-বদলও করিতেন এবং ইহার দরুণ দুইটী সংসারে কখনো কোনো মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় নাই। এই সব গালগল্প এত অধিক ভাবে সুপ্রচারিত ছিল যে, ইহা অনেকে বিশ্বাসও করিত। আমাদের কর্ণে ইহা বিষবৎ ঠেকিত এবং আমরা এই সকল উপকথা কদাচ বিশ্বাস করিতাম না। আমাদের সুদৃঢ় ধারণা ছিল যে, নারীকে যত অবহেলাই মানুষের সমাজ করিয়া থাকুক না কেন, তাহারা থালা, ঘটি, বাটি, গাড়ু, ঝারি, বালতি, কলসী প্রভৃতি বস্তুর ন্যায় জড় পদার্থ নহে এবং তাহারা হাটে বিক্রয়-যোগ্য বা বিনিময়-যোগ্য গরু, মহিষ, ছাগলও নহে। নারী যে দিন মানবের সমাজে গৃহিণীর মর্য্যাদা পাইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে স্বভাবতই তাহার কতকগুলি স্বাধিকার জন্মিল, যাহার তালিকা প্রাচীন পুস্তকাবলিতে লিখিত না থাকিলেও মনুষ্য জাতিকে সভ্য হইতে সভ্যতর করিবার ইতিহাসের অলিখিত পৃষ্ঠাগুলিতে সঙ্গোপনে আঁচড় কাটিয়া গিয়াছে। মানুষ যতই সভ্যতার উচ্চতর স্তরে উঠিবে, নারীর এতদ্বিষয়ক মহিমা তত অধিকতর

স্বীকৃতি ও সমর্থন পাইবে। যে-কোনও প্রথা, আচরণ, আইন বা আন্দোলনের দ্বারা নারীর মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিলে তাহা দ্বারা সভ্যতা ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।"

ভগবান্ মঙ্গলময়

কুমিল্লা-চম্পকনগর নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দ্রুত নিরাময় হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। নিয়ত মঙ্গলময় ভগবানকে স্মরণ করিতে থাক। তিনি সত্যই মঙ্গলময় কিনা, এই বিষয়ে তোমার সন্দিগ্ধ মন বারংবার কলকণ্ঠে প্রশ্ন তুলিবে। উত্তর দিও,—তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গলময়। উত্তর দিও,—তিনি নিরাশার অন্ধকারে অভয় আলোক। উত্তর দিও,—তিনি ভুল করেন না, করিতে পারেন না, কদাচ করিবেন না। যাহা তোমার পক্ষে মঙ্গল, তিনি তাহাই করিতেছেন। পুরুষকার দিয়াছেন তোমাকে স্বশক্তি-বিকাশের অনুশীলন করিবার জন্য কিন্তু তিনি তোমার যাহাতে ভাল, তাহাই করিবেন। কাল-প্রতীক্ষা করিতে জানি না বলিয়া আমরা তাঁহার মঙ্গলময়ত্ব উপলব্ধিতে আনিতে পারি না। তিনি নাই, তিনি কিছুই করিতে পারেন না, অথবা তিনি এতকাল যাহা করিয়াছেন সবই ভুল এবং মিথ্যা, একথা বলিয়া আমরা বৈজ্ঞানিক দম্ভ প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু তিনি আছেন, একথা ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র অন্তর

জুড়িয়া যে প্রশান্তি ও প্রসন্নতার সঞ্চার হয়, তাহার তুল্য মহৌষধ মানুষের বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তিনি আছেন, তিনি তোমার অন্তরতম প্রভু হইয়া তোমারই ভিতর নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, তিনি কদাচ তোমাকে ছাড়িয়া যান না, যাইবেন না, এই কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সকল রোগের অশান্তি দূর করিয়া দাও। অতীতে যদি ভুল কিছু করিয়া থাক, তবে তাহার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইবার প্রয়োজন নাই। এখন আর তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিও না। তাঁহাতে নির্ভর কর, তাঁহাতে প্রেম অর্পণ কর।"

ভারতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও ধর্ম্মান্তর

কলাকোপা-ঢাকা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"উক্তির সহিত আচরণের পার্থক্য ঘটিয়া গেলে যে সকল বিভ্রাটের সৃষ্টি হইতে পারে, হিন্দু-সমাজের জন্য সেই সকল বিভ্রাটই স্বাভাবিক নিয়মে আসিয়াছে। এজন্য বিধাতা-পুরুষকে দোষ দিয়া লাভ নাই। আমরা এক ব্রহ্মকেই ভজনা করিতেছি, ব্রহ্ম আমাদের বহু নহে, সেই এক ব্রহ্মকেই বিপ্রগণ বহুধা বলিয়াছেন কিন্তু নানা রকমের নানা দেবতার উপাসনার বিচিত্রতা আমাদিগকে এমন ভাবে পাশবদ্ধ করিয়া

রাখিয়াছে যে, ধর্ম্মের যুক্তিতে আমরা কখনও এক হইতে পারি না। শক-হূণ আক্রমণের যুগে আমরা ঠিক কি ব্যবহার নিজেরা নিজেদের প্রতি করিয়াছিলাম, তাহা সঠিক নির্ণয় সম্ভব না হইলেও, গ্রীক আক্রমণের মুখে নিখিল হিন্দু জাতি যে পুরু রাজার পশ্চাতে ছিলেন না, ইহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। আর পশ্চিমাগত ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদের আক্রমণের মুখে আমরা কেবল যে নিজেরা নিজেদের হইতে বিচ্ছিন্নই ছিলাম, মাত্র এই টুকুই সত্য কথা নহে, আমরা মুসলমানকে কেহ কেহ সাদরে আমন্ত্রণও দিয়াছিলাম, কেহ কেহ মৌন সমর্থন দিয়াছিলাম। ইহা যে করিতে পারিলাম, তাহা দ্বারা একরূপ প্রমাণ হইয়া যাইতেছে যে, আমাদের নানা দেবতার নানা রকমের পূজা আমাদের মধ্যে ধর্ম্মীয় মনোভাব অনুশীলনের পক্ষে যতই বিচিত্র ভঙ্গীর সহায়তা করিয়া থাকুক না কেন, আমাদের মধ্যে ঐক্যবোধ, সখ্যবোধ, মমত্ববোধ, ও সমত্ববোধ জাগাইতে পারে নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের বজ্রগর্জ্জনে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ভারত হইতে একরূপ বিতাড়িতই করিলেন কিন্তু শঙ্করপন্থী বিরাট সন্ন্যাসি-সমাজের পানে তাকাইলে কি দেখিতে পাইবে, তাহা বলা কঠিন। বিশ্বৈকব্রহ্মবাদ যদি কেবল ওষ্ঠেরই বিলাস হয়, আচরণের প্রেরয়িতা না হয়, তাহা হইলে স্ত্রী-শূদ্রের প্রতি অবজ্ঞা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে, আর তাহা হইলে অন্যান্য দেবগণ একই দেবতা না হইয়া শিব বা মহাদেব যদি

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য বিগ্রহ হন, তবে তাহাও আশ্চর্য্য নহে। সমগ্র ভারতের প্রতি প্রান্তে মহাদেবের পূজা প্রচারিত হইতেছে প্রধানত কি বেদান্তবাদী একেশ্বরবাদী সন্ন্যাসী-সাধকদের দ্বারাই নহে? ইহা ভাল কি মন্দ, সেই বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু শিবপূজার প্রবর্ত্তন-চেষ্টা ব্রহ্মসূত্র-বিধৃত বেদান্ততত্ত্বের সহিত সমতালে চলিতে পারে কি না, এই প্রশ্নটী বিবেচ্য হইয়া পড়ে। শিবপূজার প্রবর্ত্তন অত্যধিক মাত্রায় সম্ভব হইলে বিষ্ণুপূজক ভক্তশ্রেণী কি অধীর ও বিহ্বল হইয়া আবার বিষ্ণুপূজাকে বা বিষ্ণুর অবতার-সমূহের পূজাকে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য কোমর কাছিয়া কাজে লাগিয়া যাইবেন না? মধ্যযুগের দুই দিনটী শতাব্দীর ভারতীয় ধর্ম্মীয় ইতিহাস ত' এই অভাবনীয় সংঘর্ষটীরই একটী প্রতিচ্ছবি। শঙ্করাচার্য্যকে ধন্যবাদ যে, তিনি রাজানুগ্রহ ব্যতীতই নিজ অদ্বৈত মতবাদ প্রচার করিতে পারিয়াছেন এবং মাত্র আটটী বৎসরের পথ-পরিক্রমণের ক্ষমতায় সকল বৌদ্ধদিগকে নির্জ্জিত করিয়া প্রচার-শৈলীর অসাধারণত্ব এবং নিজ-মত-প্রতিষ্ঠার অকল্পনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া জগদ্বাসীকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার মতবাদের সমক্ষে বিরাট বিরাট জ্ঞানী বৌদ্ধ আচার্য্য যেন সূর্য্যদর্শনে শিশির-বিন্দুর ন্যায় উবিয়া গেলেন, তিনি হিন্দু-সমাজকে অসাধারণ তত্ত্বকথাই উপহার দিয়া যাইতে পারিলেন, দিতে পারিলেন না সামাজিক সাম্য। অধিকাংশতঃ-শূদ্রদের-দ্বারাই অধ্যুষিত

এই ভারতবর্ষের সমাজে শূদ্রের উচ্চাধিকার স্বীকৃত হইল না, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে যদিও প্রতিটি ব্রাহ্মণেরই ন্যায় শূদ্রও একজন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' হইয়া গেলেন। এই যে তত্ত্ব-বিচার আর সামাজিক আচরণের মধ্যে দুস্তর দূরত্ব, তাহারই যে ফল ভারতে অতি দ্রুত ইসলামের প্রচার, এই কথাটী মানিয়া লইতে আমাদের মধ্যে অনেকেই অনাগ্রহী। ক্ষাত্রশক্তিসম্পন্ন রণকুশল রক্ত-পিপাসু বিজেতাদের অত্যাচারের ফলে যে লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে ধর্ম্মান্তর ঘটিয়াছে, একথা ঐতিহাসিক সত্য হইলেও, সমাজের মধ্যে সাম্যের ব্যবস্থা থাকিলে হারাণো ছেলেমেয়েদের নিশ্চয়ই পুনরায় ঘরে ফিরাইয়া আনা যাইত। সুতরাং স্থায়ী ভাবে ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বীদের এদেশে চিরকাল থাকিয়া যাওয়ার এবং বংশবৃদ্ধির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আস্তে আস্তে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনার পথ কোনও প্রকারেই অবরুদ্ধ হইল না, সেই পথ চিরকাল অবারিতই রহিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধানত হিন্দু-সমাজের বৈষম্য-নীতির সুযোগ নিয়াই দলে দলে লোককে নিজ-ধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছে, নবধর্ম্মের বিচিত্র আকর্ষণের চেয়েও এই কারণটী অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া কাজ করিয়াছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূর্ব্ববঙ্গে এবং আফগানিস্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম এমন ব্যাপক বিস্তার পাইয়াছিল, যাহা ভারতের ইতিহাসে তুলনাহীন। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আফগানিস্থানে শতকরা আট

নয় জনের বেশী হিন্দু নাই এবং এই আফগানিস্থানেই জন্ম নিয়াছিলেন বৈয়াকরণিক পাণিনি মুনি এবং যোগদর্শনের প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি। চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাঁহাদের এই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কেবল বাড়িতে থাকিবারই স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া তাহারা সাহস করিতে পারে যে, অন্যত্র যেখানে মুসলমানের সংখ্যা অত্যল্প, সেখানেও বারংবার কিছু কিছু করিয়া উপনিবেশস্থাপনকারী পুরুষদের প্রেরণ করিয়া আস্তে আস্তে তত্তৎ অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা গড়িয়া তুলিতে তাহারা সমর্থ হইবে। সামাজিক সাম্যবোধ ইহাদের মজ্জাগত বলিয়া যে-কোনও দেশে একটী পুরুষ একাকী চলিয়া গেলেই যথেষ্ট হইল, নূতন উপনিবেশে যে কোনও জাতির বা গোষ্ঠীর একটী পছন্দমত ক'নে জোগাড় করিয়া বিবাহ করিতে পারিলেই তাহার সংসার-রথের চক্র চলিতে পারিবে। তাহার পুত্র বা কন্যার জাত লইয়া কেহ প্রশ্ন করিবে না, তাহাকে বা তাহার পুত্রকন্যাকে নামাজ পড়িতে মসজিদে কেহ বাধা দিবে না, তাহার পুত্র বা কন্যার সহিত ঐ অঞ্চলের কোনও মুসলমান নিজ কন্যা বা পুত্রের বিবাহ দান অসঙ্গত জ্ঞান করিবে না, অবশ্য যদি অন্য প্রকারের (যথা আর্থিক, শারীরিক স্বাস্থ্য প্রভৃতির) বাধার কারণ না থাকে। অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ এদেশে

ছিল বলিয়াই এবং সর্ব্বং-খল্বিদং-ব্রহ্ম সম্পর্কে উপলব্ধি এদেশে অসংখ্য জনের হইয়াছিল বলিয়াই আরব, তুরস্ক, পারস্য আদি দেশের মতন এদেশে শতকরা প্রায় একশত জনই নিজ ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারে নাই, শত ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়াও তাহারা তাহাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের সাধনার ধারার সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে, যাহা পারে নাই মিশর বা সুদানের অধিবাসীরা, যাহা পারে নাই তুরস্কের অধিবাসীরা বা পারস্যের অধিকাংশ পুরুষ ও নারী। কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়া আমরা যতই উচ্চস্তরে অবস্থান করিয়াছি, সামাজিক সদ্ব্যবহারের দিক দিয়া আমাদের মতিভ্রম ততই সর্ব্বনাশসাধক হইয়াছে। 'হায় আচার্য্য শঙ্কর, পৃথিবী বোধ হয় তোমার মতন ধীমান্ পুরুষের পদধূলি আর কখনও পায় নাই, কিন্তু তুমি উচ্চ তত্ত্বই দিলে, তত্ত্বের ঝঞ্ঝায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের রাজানুগ্রহ-স্ফীত বিরাট কলেবরকে শীর্ণ-বিশীর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিলে কিন্তু যাঁহাদের জন্য তোমার প্রকৃত আবির্ভাব তাঁহাদিগকে তত্ত্ববিচারের সঙ্গে সঙ্গে সকলকে আপন দেহেরই অংশ মাত্র বিবেচনায় আলিঙ্গন করিয়া সমাজের বুকে সম্মানিত প্রতিষ্ঠায় ফিরাইয়া আনিবার কৌশল শিখাইয়া গেলে না,—ইহা ভারত-সভ্যতার শ্যামল অরুণিমার বুকে এক তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,'—এই বলিয়া বেদনা-মথিত চিত্ত আমার নিয়ত হাহাকার করে। ব্রিটিশ রাজত্ব-কালে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম নির্জ্জীব অবস্থায় অসাড় দেহে পড়িয়া আছে বলিয়া মনে হইলেও লক্ষ্য করিও যে,

সহস্র সহস্র গুণগ্রাহী হিন্দু এই ধর্ম্মের মূল সত্যগুলিকে বুঝিবার জন্য অধ্যবসায়-সহকারে পালি ভাষার শিক্ষা নিতেছেন। হিন্দুদের স্বাভাবিক গুণগ্রাহিতার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পর্কে অতীব সভ্রান্ত জনমত গঠিত হইয়া যাইবে। এই জনমতের সুযোগে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে নিজসঙ্ঘ-বিস্তারের চেষ্টা স্বভাবতঃই আত্মপ্রকাশ করিবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, (১) বৌদ্ধরা হিন্দু নহে, (২) হিন্দুরা অসংখ্য লোককে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, (৩) এই অবিচারের প্রতীকারার্থ হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা,—এই তিনটী যুক্তিতে অদূরকালমধ্যেই যে বিরাট ও ব্যাপক স্বধর্ম্মত্যাগের হিড়িক আরম্ভ হইবে, ইহা অনুমান করা শক্ত নহে। দুই চারিজন এমন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকের সহিতও আমার সাক্ষাৎকার হইয়াছে, যাঁহাদের প্রচারের পুঁজি বিদ্বেষ। বিদ্বেষের সুযোগ দিয়াছে আমাদের সামাজিক সাম্যবিচারের অসামর্থ্য। কতকাল আমরা দলে দলে লোককে অসমান করিয়া রাখিব, ইহা ভাবিবার বিষয়। মৌখিক বৈদান্তিক সাম্যবাদ ইহাদের মনের আশা পূরাইতে সমর্থ হইবে না। ইহাদের মনে চাপা বিদ্বেষ রহিয়াছে এবং প্রকৃত ধর্ম্মলাভের জন্য নহে, পরন্তু প্রতিহিংসা সাধনের উপায়-রূপে ইহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে পারে। তদবস্থায় ধর্ম্মান্তরের জন্য নৈষ্ঠিক ব্যবস্থারও প্রয়োজন হয়ত পড়িবে

না। লক্ষ লোক একত্র হইয়া এক জনসভায় চীৎকার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেই হইয়া গেল,—'আমরা বৌদ্ধ হইয়া গেলাম, আমরা হিন্দু নহি।' হিন্দুর নিম্নশ্রেণীর মানুষদের জন্য পরিকল্পিত নানা আর্থিক ও রাষ্ট্রিক সুযোগগুলি গ্রহণে ইহাদের আপত্তি থাকিবে না কিন্তু আত্ম-পরিচয় দিবার কালে ইহারা বলিবে,—'আমরা বৌদ্ধ।' বিদ্বেষ-বুদ্ধির মধ্য দিয়া ধর্ম্মের কদাচ প্রকৃত প্রসার সম্ভব নহে, অন্তরের সাত্ত্বিক পরিবর্ত্তন ও নবতর আধ্যাত্মিক আস্বাদনের মধ্য দিয়াই ধর্ম্মান্তর সার্থকতা লাভ করে। বিদ্বেষের হেতুতে যে সকল ধর্ম্মান্তর ঘটিয়া থাকে, তাহা ধর্ম্মীয় কারণের দিক দিয়া মানুষের স্বভাব, আচরণ, রুচি, প্রয়াস বা আদর্শবাদকে কোনও উন্নততর প্রভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া দিতে পারে না। ফলে একজনের মজ্জাগত বিদ্বেষ বংশানুক্রমিক বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়। বংশানুক্রমিক বিদ্বেষ অন্ধ আক্রোশে পরিণত হয়। অন্ধ আক্রোশ হিতাহিত-জ্ঞান হারাইয়া এমন সব অকাণ্ড করিয়া বসে, যাহা ভাবিতে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

অদ্য অপরাহ্ণে বক্তৃতার স্থান হলের বাহিরে হরিসভার মাঠে করিতে হইল। জনতায় আজ মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। আকাশের অবস্থা ভাল নহে, বৃষ্টিপাত যে-কোনও সময়ে আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু এত জনতা হলের ভিতরে ঢুকান সম্ভব নহে। সুতরাং যথাকালে বাহিরেই বক্তৃতারম্ভ হইল।

বৰ্দ্ধমান বৰ্দ্ধমানই বটে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ কিন্তু বুঝা যাচ্ছে যে, বৰ্দ্ধমান প্রকৃতই বৰ্দ্ধমান, ক্ষীয়মাণ নয়। শহরের নানা পল্লীতে অনেক দিনের পুরোণো দালানগুলির অবস্থা দেখ্‌লে একথাই প্রত্যেকের মনে হবে, এ শহরের নাম আবার বৰ্দ্ধমান হ'ল কেন? শহরের বুকের উপর দিয়ে একটা বাঁকা নদী, নদীর দুই তীরে অসংখ্য বন-জঙ্গল, শহরের মধ্য দিয়ে দুই তিনটা প্রধান রাস্তা আর রাস্তার দুই পারে দূরে দূরে মনুষ্য-বসতি, এই সব দেখে অনেকেরই মনে প্রশ্ন হবে, এটা আবার একটা কি শহর? অথচ শহরটার প্রাচীন ইতিহাস আছে, মানুষের গৌরবপূর্ণ অবদান আছে, অতীত ঘটনাবলীর সম্ভ্রম আছে, সাহিত্য ও কৃষ্টির স্মরণীয় কীৰ্ত্তি আছে। তবু এ কয়টা দিন কেবলই মনে হচ্ছিল, তবে কি শহরটা বৰ্দ্ধমান নয়, তবে কি শহরটা ক্ষীয়মান? মানুষের ভিতরে সাধারণ ভাবে যখন দৈন্য বিরাজ করে, তখন একজন শক্তিশালী ভূম্যধিকারীর বিশাল প্রাসাদ বা মনোরম পুষ্পোদ্যান কখনো শহরের মহিমাটাকে উঁচু ক'রে ধ'রে রাখ্‌তে পারে না। এই কয়দিন অবস্থাটা প্রায় তাই ছিল। আজ এই বিরাট জন-সমারোহ দেখে, সমাগত জনগণের আগ্রহ-ব্যাকুল আননের ভাস্বর জ্যোতি দর্শন ক'রে আমাকে বল্‌তে হচ্ছে, না, বৰ্দ্ধমান বৰ্দ্ধমানই বটে, বৰ্দ্ধমান ক্ষীয়মাণ নয়।

জনসাধারণই দেশের সম্পদ ও সম্বল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধারণ মানুষ যখন অসাধারণ আগ্রহের প্রমাণ দিতে সুরু করে তাদের চিন্তায়, বাক্যে ও আচরণে, তখনই অনুমান করা সঙ্গত হয় যে, দেশ শ্রীবৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে, অপচয় বা অবক্ষয়ের দিকে নয়। মুষ্টিমেয় দুই চারিজন বিশেষ প্রতিভাশালী বা বিত্তবান্ পুরুষের ভিতরে যখন ঐ সকল বিশেষত্বের সঞ্চার ঘটে, তখন তা' অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখবার মতন আশ্চর্য্যজনক বস্তু নিশ্চিতই হয়, কিন্তু তাঁদের চিন্তা, তাঁদের বাক্য, তাঁদের আচরণ প্রকৃতির একটা আশ্চর্য্য খেয়াল-রূপে একেবারে নিঃসঙ্গ পথিকও হ'য়ে যেতে পারে। দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ বা শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি সাধারণ মানুষকে নবভাবের উদ্দীপনা দিয়ে যখন গতিমুখীন ও আগ্রহব্যাকুল ক'রে তোলা যায়, স্বীকার করা সঙ্গত যে, সমগ্র জাতির নবজাগরণকে স্বাগত জানাবার তখন সময় এসেছে। মানবদরদী প্রকৃত প্রেমিক নিয়ত ডাক দিয়ে বলেছেন,—

এস হে শূদ্র, এস হে ক্ষুদ্র,
এস হে অপাংক্তেয়,
সবাই আপন, সবাই জীবন,
কেহ নহে মোর হেয়।

সেই ডাক শু'নে নির্ব্বিচারে যাঁরা মোহশয্যা পরিহার ক'রে তমোনিদ্রা ছেড়ে দিয়ে সবার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ছুটে এসেছেন, চিরকাল দেশ ও জাতিকে জাগিয়েছেন তাঁরা। দেশের জনসাধারণই দেশের সম্পদ, দেশের সম্বল, দেশের আশা, দেশের ভরসা। আজ তিন দিনের দিনে মাঠ-ভরা লোক দেখে তাই আমার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়েছে।

প্রেম আমাদের বিশ্বমুখী হউক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেমন ক'রে ছুটে যেতে হয় জনসাধারণের মধ্যে, সেই দেবগণ-লোভনীয় পরমা বিদ্যা আমি শিখি নি, শিখবার সুযোগ পাই নি, কিন্তু আমার আহ্বানের মধ্যে দুর্ব্বলতা থাকা সত্ত্বেও যে এত লোকের আজ সমাবেশ হয়েছে, তা' দেখে আমি আপনাদের প্রেম-শীলতায় মুগ্ধ হয়েছি। আপনাদের সকলের প্রেমকে দুটী মাত্র বাহু দিয়ে বেষ্টন ক'রে নিজের কাছে বন্দী ক'রে রাখার সাধ্য আমার নেই, তাই ঠিক করেছি যে, এই প্রেমকে আমি ধ'রে নিয়ে বিশ্বের প্রতিটী মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। একাকী প্রেম-সম্ভোগ আমার স্বভাবের মধ্যে নেই, বিশ্বের সকলকে সাথে নিয়ে আমি জগতের প্রত্যেকটী সুখের আস্বাদন পেতে চাই। আর, প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিশ্বৈকমুখীনতাই প্রাচীন ভারতের পরম অবদান, যা' একদা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে অনেকের জীবনে পূর্ণ সংসিদ্ধি অর্জ্জন করেছিল ব'লেই এই

অধঃপতিত হীন দশায় পতিত হ'য়েও আমরা আজও বেঁচে আছি। উন্নতি, অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য্য, গৌরব ও মহিমা যা-কিছু আমাদের কাম্য আছে, তার সবই আমরা সকলকে সঙ্গে নিয়ে যেন পাই, একা একা চোরের মতন ভগবদ্দত্ত সৎসৌভাগ্যকে লুকিয়ে লুকিয়ে যেন ভোগ করতে না চাই। অন্তরের একমুখ প্রেম পরমেশ্বরে সমর্পিত হোক্ আর তাই পুনঃ সূর্য্যদেবের প্রতিটি কিরণচ্ছটার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রতি জনকে আভাসিত, বিপ্লাবিত, পুনরুজ্জীবিত করুক।

আত্মশক্তি ও অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের গড়তে হবে ভবিষ্যৎ। আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ আমরা নিজেরাই গড়্‌ব। তার জন্য পরমুখপানে তাকিয়ে থাক্‌ব কেন? কেন প্রত্যাশা করব যে, সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে আমাদের বন্ধন-দশার মুক্তি আস্‌বে? কেন আমরা স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী এবং আত্মশক্তির প্রবোধনে উদ্যোগী হব না? আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আসে তার, যার নিজের অতীতের মহিমাতে বিশ্বাস আছে। এই জন্যই প্রয়োজন পূর্ব্বপুরুষদের জীবনকে অনুসন্ধান করা। সেই সব জীবনের মধ্যে যে সকল গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় আছে, প্রয়োজন হচ্ছে তা' অধ্যয়ন

করা, সম্ভবমত অনুসরণ করা। যা-কিছু অতীতে ঘটেছে, তার সবই মহিমোন্নত না হ'তে পারে, কিন্তু স্তূপীকৃত ভস্মের মধ্যে যদি কণামাত্রও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়, তবে সেই স্ফুলিঙ্গকে কাজে লাগাতে হবে। যা-কিছু নূতন, তাই যে অসামান্য বা অসাধারণ হবে, তাই যে আমাদের জীবন-বেদ হবেই হবে, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। কালের নিকষ-পাষাণে পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত কোনো কিছুরই প্রকৃত মূল্য চূড়ান্ত-ভাবে নির্ণীত হতে পারে না। বর্ত্তমানের উদ্ভাবিত তথাকথিত সদুপায়-সমূহ যে সত্য সত্যই অভাবনীয় ভাবে সৎ, এর যখন নিশ্চয়তা নেই, তখন অতীতে আবিষ্কৃত যে সকল উপায় কালের বিচারে উত্তীর্ণ হ'য়ে এসেছে, সেগুলিকে আমরা কেন দৃঢ় হস্তে অবলম্বন কর্ব্ব না? কোনও জিনিষ অতীতের ব'লেই তাকে বস্তাপচা নোংরা মাল ব'লে আমরা কেন অবজ্ঞা কত্তে যাব? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন সব গঞ্জিকাসেবী মদিরামত্ত অব্যবস্থিতের দল, একথা ভাব্‌বার যুক্তিসঙ্গত যথেষ্ট কারণ কে দেখাতে পেরেছে? এই ভারতে যখনি যিনি নূতন কোনও কথা বল্‌তে চেয়েছেন, তখনি তাঁকে অতীতের ধূলিমলিন জীর্ণ ঝুলিতে হাত বুলাতে হয়েছে। গৌতমবুদ্ধ ভারতের ঐতিহাসিক জগতের প্রথম বিপ্লবী। তিনি যা-কিছু দেশকে দিয়েছেন, তা' তিনি এই দেশের ধন-ভাণ্ডার থেকেই পেয়েছেন। তাঁর আগে সত্য, অহিংসা,

মৈত্রী, মুদিতা, করুণা প্রভৃতি সাত্ত্বিক চিত্তভাবের সঙ্গে এদেশে কারো পরিচয় ছিল না, এমন কথা বলা অসঙ্গত। এই দেশেরই অতীতের জ্ঞান-মঞ্জুষা থেকে তিনি যুগোপযোগী ভাবে বেছে বেছে কতকগুলি বিশেষ অনুশীলন নিজ অনুবর্ত্তীদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। তিনি কোনও নবীন দার্শনিক তত্ত্বেরও স্রষ্টা নন, তিনি প্রচলিত সৎ ও অসৎ নানা অনুশীলনের মধ্য থেকে এবং প্রচলিত নানা জটিল ও সরল মীমাংসার মধ্য থেকে, বেছে বেছে কতকগুলি জিনিষকে এমন প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকের সম্মুখে তুলে ধরলেন যে, জগদ্বাসী বিশেষ ক'রে ভারতের অগণিত অব্রাহ্মণ-অদ্বিজেরা, মনে করল যে, কে এক বিশ্বামিত্র বুঝি এসে এক নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের পৌরাণিক যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী কিন্তু নূতন সৃষ্টি তিনিও কিছুই করেন নি, বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ-সমূহ থেকে সবকিছু আহরণ ক'রে পরস্পর বিভেদ-সম্বন্ধযুক্ত মতগুলিকে এক সামঞ্জস্যের সূত্রে বেঁধে যেন তত্ত্বদর্শনের এক মণিময়ী মালা রচনা কর্লেন। পুরাতনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে কোনো মহৎ নূতনের আবির্ভাব জগতে সত্যই বিরল। মহতেরা তাঁদের নূতন নূতন মতবাদের মধ্যে দেশের চিরাচরিত সদনুশীলন এবং চিরপোষিত সংসংস্কার থেকে কিছুই নেন নি, অথচ একটা প্রকাণ্ড রকমের ভাব-সংস্কার দেশের চিন্তা-জগতে ক'রে গেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। রাজা রামমোহন এসেছিলেন হিমাচলের

বিশালতা নিয়ে, স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন ঝটিকার মহাবল, মত্ততা ও দুর্ব্বার গতি নিয়ে, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এসেছিলেন গ্র্যাণাইট পাথরের দৃঢ়তা নিয়ে,—কিন্তু এঁরা কি অতীতকে অগ্রাহ্য ক'রে চল্‌তে পেরেছেন? অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরাই ভবিষ্যৎকে সহজে গড়্‌তে সমর্থ হন। আমাদের তাই চাই অতীতের শ্রেষ্ঠ অবদানের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নিষ্ঠা এবং নির্ভর।

ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অতীতের শ্রেষ্ঠ অবদান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক দেশই অনেক রকম অতীত গৌরবের গর্ব্ব কত্তে পারে, অনেক দেশই অতীতের অনেক অবদান তাদের বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজনের দাবীকেও অংশতঃ পূরণ ক'রে যাচ্ছে কিন্তু ভারতেরই কেবল সেই মর্য্যাদা নেই, একথা বলতে যাওয়া বা ভাবতে যাওয়া পাগলামি মাত্র। বরং একথা বজ্রকণ্ঠে বলা চলে যে, ভারত তার অতীত গৌরবের মধ্যমণি-রূপে যে জিনিষটীর জন্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কত্তে পারে, সেই জিনিষটী পৃথিবীর আর কোথাও প্রথাবদ্ধ সংস্কার-রূপে এবং জাতি-সৃষ্টির ভিত্তি-রূপে পরিগৃহীত হয় নাই। পিরামিডের যুগের এক বিস্ময়কর সভ্যতার জন্মদাতা মিশর কি জেনেছিল যে, পুরুষানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্য একটা জাতির পক্ষে কতখানি হিতকর হতে পারে?

কিন্তু দিগ্বিজয়ে তাঁরা প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন শতাব্দীর পর শতাব্দী। উল্লাস-পরায়ণ মধুময় সুখী জীবন যাপনকারী গ্রীস্ সভ্যতার সর্ব্বস্তরে উন্নতির অবকাশ সত্ত্বেও আশ্রম-রূপে বা বাধ্যকর অনুশীলন রূপে ব্রহ্মচর্য্যকে ধ্যানে বা ধারণায় আনতে সমর্থ হয় নাই। দিগ্দেশব্যাপী রক্তাক্ত দিগ্বিজয়ের রণ-বাহিনীর পরিচালনে দক্ষ রোমকরা কি তাদের চিন্তায়, আচরণে, সামাজিক জীবনে ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখবার দুঃসাহস কদাচ প্রদর্শন কত্তে পেরেছে? আধুনিক কালের পাশ্চাত্য দেশ ও জাতিগুলির কোনোটা কোনোটা বা কেউ কেউ সমাজ-জীবনে সুষম যৌন-চিন্তার উন্মেষ সাধনের প্রয়োজন-বোধে উদ্দীপিত হচ্ছেন বা হয়েছেন ত' যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে অকল্পনীয় পশুভাব-চর্চ্চার অস্বাভাবিক উৎপাত লক্ষ্য ক'রে নিতান্তই আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে। অথচ এসব দেখে আতঙ্কিত হ'য়ে নয়, পরন্তু জীবমাত্রেরই আদিম প্রকৃতি বা স্বাভাবিক তাড়নাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা সফল হ'লে তার ফলে দেহে, মনে, প্রাণে ও অধ্যাত্ম-চেতনায় যে অনির্ব্বচনীয় শক্তি-প্রবাহের লীলা সঞ্চারিত হ'তে পারে, সেই সত্যকে নিজেদের জীবনে উপলব্ধিগত করার পরে ভারতবর্ষ জীবনের মূলদেশে ব্রহ্মচর্য্যকে স্থাপন করেছিল। ভারতই প্রথম জেনেছিল যে, ব্রহ্মচর্য্যই তপোত্তম, ব্রহ্মচর্য্যের চূড়ান্ত অনুশীলন ছাড়া শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ অসম্পূর্ণ, ব্রহ্মচর্য্য-বিরহিত সাংসারিক জীবন বিড়ম্বনা, ব্রহ্মচর্য্য

ছাড়া বানপ্রস্থ অলীক কল্পনা, ব্রহ্মচর্য্য-বিরহিত সন্ন্যাস মূল্যহীন জল্পনা। ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠার পুরুষানুক্রমিক প্রয়াস ভারতবর্ষকে তার যা-কিছু মহৎ, সবই দান করেছিল। এই চর্চ্চাকে ব্যাপক ভাবে সর্ব্বজাতির সর্ব্বস্তরে বিস্তারিত করা সম্ভব হ'লে ভারতে ব্যাপক বৈদেশিক আক্রমণ সুরু হওয়ার অনেক আগেই দেবমানবের সমাজ গ'ড়ে উঠ্‌ত। পৃথিবীর অনেক জাতি অনেক উপায়ে জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার চেষ্টা করেছে, ভারতের সেই চেষ্টা ছিল অধ্যাত্মচিন্তার মাধ্যমে। বেদশাস্ত্রের পরম জ্ঞানকে পূর্ণতঃ অধিগত করার প্রয়োজনে তার প্রখর স্মৃতিশক্তি লাভের প্রয়োজন ছিল এবং প্রধানতঃ ব্রহ্মচর্য্যের মহিমায় পুরুষানুক্রমিক চেষ্টায় সে-তা' পেয়েও ছিল। নানা দেশে দিগ্বিজয় করার সামর্থ্য ভারতবাসীর ছিল কিন্তু দিগ্বিজয়ের দিকে তার মন ছিল না। বলপূর্ব্বক ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে নিজেদের মতাবলম্বী করার প্রয়োজনে ধরাপৃষ্ঠে রক্তের স্রোত বহিয়ে দেওয়ার তার সামর্থ্য ছিল, কিন্তু এই সামর্থ্যের ব্যবহারে তার রুচি ছিল না। তার যাবতীয় প্রতিভাকে সে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-কেন্দ্রিক ক'রে অজানাকে জানতে, অধরাকে ধরতে, অদেখাকে দেখতে ও অশ্রুতকে শুনতে হয়েছিল সব চেয়ে বেশী আগ্রহী। এই জন্য তার স্মৃতিশক্তিরও প্রয়োজন ছিল, ব্রহ্মচর্য্যেরও প্রয়োজন ছিল। ব্রহ্মচর্য্য তাকে উপহার দিল স্মৃতিশক্তি, স্মৃতি তাকে দিল

আত্মশ্রদ্ধা আর আত্মশ্রদ্ধা তার নিকটে ব্রহ্মচর্য্যের মূল্যমান বাড়িয়ে দিল। ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর দিয়ে ভারত যখনি তার আত্ম-পরিচয়কে পেয়েছে, তখনি সে হয়েছে দুর্দ্ধর্ষ এবং অপরাজেয়, তখনই সে হয়েছে জ্ঞান-শ্রদ্ধ এবং জগৎপূজ্য। দুদিন আগে হোক্ আর পরে হোক্ সে তার পুরোনো ও হারাণো আসন আবার ফিরে নিশ্চয়ই পাবে। এই বিশ্বাস অন্তরে রাখি ব'লেই দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণের ক্লেশকে অগ্রাহ্য ক'রে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছি শুধু কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে ব্রহ্মচর্য্যের নব-সঞ্জীবনী-সুধা বিতরণ করার লক্ষ্যে। ব্রহ্মচর্য্য ভারতের অতীতের অবদান, ব্রহ্মচর্য্য ভারতের ভবিষ্যতের মহিমা।

ব্রহ্মচর্য্যই সোণার সূতা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—রাজার ছেলে ভিখারী সেজে তার জীর্ণ দীর্ণ ছিন্ন কন্থাখানা গায়ে জড়িয়ে রাজপথের এক প্রান্তে দীনাতিদীনের অভাজন-জীবন যাপন কচ্ছে কিন্তু তার কাঁথার পাড়গুলি যে সোণার আঁচল ছাড়া কিছু নয়, এটা সে জানে না। সে জীর্ণ কন্থার মলিনতা দেখে তাকে উপেক্ষায় সুদূরে নিক্ষেপ কত্তে প্রলুব্ধ হ'তে পারে। কারণ, এতে তার অকারণ ঘাড়ের বোঝা কিছু ক'মে যায়। কিন্তু ফেলে দেবার আগে তার কি একটু কষ্ট ক'রে আঁচলের

সোণার সুতোগুলিকে খুলে নেওয়া উচিত নয়? জীর্ণ কন্থা তার অনাদরণীয় হ'তে পারে কিন্তু আঁচলের সোণার সুতোগুলি ত' জীর্ণও নয়, কন্থাও নয়, অবহেলার বস্তুও নয়, তাদের ত' দাম আছে। সেগুলি যে আসল, নির্ভেজাল, মুল্যবান্ সোণা। প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচর্য্য-সম্পর্কেও এই কথাটা স্মরণ রাখ্‌তে হবে।

আকাশে ঘনঘটা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। মধ্যে দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িয়াও গেল। কিন্তু একটী প্রাণীও সভাস্থল ত্যাগ করিলেন না, একটী শ্রোতাও চঞ্চল হইলেন না। বক্তৃতা পূর্ণ আড়াই ঘণ্টা চলিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রোতাদের ধন্যবাদ দিয়া বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শ্রোতারা অনেকেই শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত দেখা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু আকাশের মেঘাড়ম্বর তাহাতে বাধার সৃষ্টি করিল।

বর্দ্ধমান-হরিসভা
১৩ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৪২
(২৮শে জুন, ১৯৩৫)

যৌগিক আসন-মুদ্রা শিক্ষার্থীর সংখ্যা অদ্য আরও বেশী হইল। সহরের বহু বিখ্যাত পুরুষ এবং সম্ভ্রান্ত মহিলারা আজ প্রাতে দর্শনার্থে আসিতেছেন। বুঝা গেল পূর্ব্ববর্ত্তী দিবস-ত্রয়ের বক্তৃতায় সহরময় একটা বিরাট আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানবাসীর প্রশংসা-ভাষণ

একজন বর্ষীয়ান্ ভদ্রলোক বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর (শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেনের) বক্তৃতার পরে দেশবাসী এমন ভাষণ আর কখনো শোনে নাই।

উক্ত ভদ্রলোকের নাম কুমার নাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি জ্ঞানী ও সাধক-পুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিপূজিত। "গীতা-মধুকরী" নামক এক পদ্য-গীতার রচয়িতা-রূপে ইনি যশস্বী।

অপর এক বর্ষীয়ান্ পুরুষ বলিলেন,—বর্দ্ধমানকে আপনি তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন। এমন তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য, এমন ললিত বচন-মাধুরী, এমন কাব্যরসাশ্রিত বাক্যাবলী কল্পনাতীত।

উক্ত ভদ্রলোকের নাম তারক নাথ রায়। ইনি স্থানীয় উকিল-সভার একজন যশস্বী সভ্য এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তি।

একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিলেন,—প্রাচীনকে এমন নবীন ক'রে উপস্থাপন, কটু, অরুচিপ্রদ সত্যকে এমন মনোহারী ক'রে পরিবেশন আমাদের কাছে কল্পনার অতীত ছিল। বর্দ্ধমানবাসীরা একটী নূতন অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে ধন্য হ'লেন।

অভিক্ষা

আসন-মুদ্রার ক্লাস হইয়া যাইবার পরে প্রসঙ্গ-ক্রমে "অভিক্ষার" কথাটা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি যে আমার আশ্রমের জন্য বা আমার ধর্ম্মপ্রচার-প্রয়াসকে সফল করার জন্য কারো কাছে এক কপর্দ্দকও আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করি না, এটাকে অসাধারণ একটা কৃতিত্ব ব'লে মনে করার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা একদিন এমন দাঁড়াবে যে, যে-কোনও সংপ্রতিষ্ঠান যদি নিজের বলে নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারে, তাহ'লে তা' হয়ত লুপ্ত হ'য়ে যাবে। একদা এমন অবস্থা আসতে পারে, যাতে দেশের অধিকাংশ লোকের মানসিক রুচি সৎ-প্রতিষ্ঠানে দান করার বিরুদ্ধে যাবে। এমন অবস্থাও আসতে পারে, যাতে অধিকাংশ লোকের আর্থিক দুরবস্থা কল্পনাকেও পরাস্ত ক'রে যাবে। এটা আমি অনুমান কত্তে পারি। তারই জন্য আমি আমার সমাজসেবা-মূলক প্রয়াস থেকে ভিক্ষাবৃত্তিকে নির্ব্বাসন দিয়ে দিয়েছি। অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের লোক-কল্যাণমূলক জনসেবাকে হেয় কর্ব্বার জন্য আমি 'অভিক্ষা' ব্রত গ্রহণ করেছি, একথা ভাবতে যাওয়া নিরর্থক কষ্ট-কল্পনা হবে। আমার নিজের কাজটী আমি নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে দাঁড় করাতে চাই, আমার আগ্রহ শুধু অতটুকু। অন্যেরা কি ভাবে কি কচ্ছেন, তার সমালোচনা করা আমার সাজে না। তা' নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাও নেই। তাঁরা সমাজ-সেবা কচ্ছেন, আপ্রাণ শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার ক'রে মানুষের অন্ধ চোখে আলো, বধির কর্ণে বাণী, ক্ষুধিত উদরে অন্ন, পিপাসিত

ওষ্ঠে জল যে দান ক'রে যাচ্ছেন, এই প্রশংসনীয় সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। আমি প্রচলিত পথ ছেড়ে দিয়ে নূতন পথে কিছু কত্তে যাচ্ছি ব'লে আমার বিরুদ্ধে একটা চাপা গুঞ্জন যে উঠেছে বা উঠ্‌বে এটাতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছু নেই। কারণ, নূতন-কিছু কত্তে গেলে সকলের সম্পর্কেই এসব ঘ'টে থাকে। আমার 'অভিক্ষা'র ভিতরে কেউ দেখেছেন অদমিত অহঙ্কারের উদ্ধত বিজৃম্ভন, কেউ দেখেছেন দুঃসাহসিকতার বৃথা বাহাদুরীর প্রকাশ, কেউ দেখেছেন পুঞ্জীভূত অজ্ঞতার পরমনিশ্চিন্ততা, কেউ দেখেছেন অন্য সংপ্রতিষ্ঠানগুলিকে লোক-চক্ষে হেয় করার ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা। এ সব দেখা ত' চোখের দোষে হ'য়ে থাকে। তবে আমি ঘাবড়াবই বা কেন, অন্য প্রতিষ্ঠানের নিন্দামুখর রসনার প্রতিবাদ কত্তেই বা যাব কেন? সত্য চিরকালই কালোত্তীর্ণ হয়, সত্য-চেষ্টাকে বিধাতা নিজে সহায়তা দেন। আমার ভরসা সেইখানে।

দুর্ব্বলতা, দরিদ্রতা, সংখ্যাল্পতা উন্নতির বাধা নহে

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত কালীহাটি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যতই দুর্ব্বল আর দরিদ্র হও, যতই সংখ্যাল্প আর

নগণ্য হও, ঐক্যের শক্তি আলাদা। ধর্ম্মের শিক্ষা যাঁহারা দিয়াছেন, তাঁহারা নমস্য কিন্তু ঐক্যের শিক্ষা যাঁহারা দিয়াছেন, তাঁহারা শক্তির সন্ধানও দিয়াছেন। সামাজিক বা রাষ্ট্রিক জীবনে ঐক্যের চেয়ে অধিকতর প্রভাবশালী সহায়ক বস্তু আর কিছুই নাই। ঐক্য আসে উদ্দেশ্যের সমতা হইতে। ঐক্য কখনো কখনো আচরণের সমতা হইতেও আসে। উদ্দেশ্য যদি বিভিন্ন হয় আর আচরণে যদি সমতা থাকে, তাহা হইলে কিছুকাল সেই ঐক্য বজায় থাকে, কিছুকাল পরে সেই ঐক্যে ভাঙ্গনও ধরিতে পারে। দুই দল লোক দুই বিপরীত উদ্দেশ্য নিয়া সম-আচরণে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। এরূপ ঘটনার অভাব নাই। নিজ নিজ উদ্দেশ্য পূরণোন্মুখী হইলে কে আর অন্যের সঙ্গে ঐক্য-সম্বন্ধ অটুট রাখিবার জন্য আগ্রহী হয়? রাজনীতির ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা সহস্র সহস্র ঘটিয়া থাকে। দুর্ব্বলতা এবং দরিদ্রতাকে যদি যোগ্য ভাবে পরাহত করিতে চাহ, তাহা হইলে ঐক্যকে চিরস্থায়ী করিবার উপায়ের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইতে হইবে। ঐক্যের নামে নানা রূপ সাময়িক ব্যবস্থা-সমূহ করিয়া জীবনে বিড়ম্বনার মেঘাড়ম্বর বৃদ্ধি করার চেয়ে বেদনাদায়ক অবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ঐক্য স্থাপনও এক-প্রকারের দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম্ম মনুষ্যত্বের বনিয়াদে বাড়িয়া ওঠে, ধর্ম্মমতাবলম্বীদের চরিত্রের বনিয়াদে গড়িয়া

ওঠে, দৃঢ়বদ্ধ ঐক্যের সহায়ে অমানুষিক আচরণের দ্বারা ধরিত্রীকে আতঙ্কিত করিবার মধ্য দিয়া নহে। অপরকে যে অভয় বিতরণ করিতে পারে, সে-ই প্রকৃত ধার্ম্মিক। অপরকে যে আতঙ্কিত করিতে পারে, সে ধর্ম্ম-বিশেষের দোহাই দিয়া ঐক্যবল বর্দ্ধিত করিয়া অপকার্য্য-সমূহ করিলে বা করাইলে ভীতির পাত্র হইতে পারে কিন্তু ধার্ম্মিক-রূপে শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যখন লুণ্ঠন চলে, গৃহদাহ চলে, নরহত্যা চলে, নারী-ধর্ষণ চলে, তখন তাহাতে প্রতিবাদ করিবার সৎসাহস যদি স্বধর্ম্মাবলম্বীদের না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামিটা মাত্র কতিপয় ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকার নহে, ব্যাপক ভাবে ঐ ধর্ম্মাবলম্বী প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তির মানসিক সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। লুণ্ঠন-কার্য্যের দ্বারা স্ব-সম্পদ-বৃদ্ধি নিশ্চয়ই একটা অর্থনৈতিক ব্যাপার। এই অর্থকে সদুপায়ে অর্জ্জিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, কিন্তু ইহা যে অর্থনৈতিক পার্থিব এক উন্নতির সহায়ক ব্যাপার, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অর্থনীতির বিচারে সফল লুণ্ঠন-চেষ্টা যে একটা সত্যিকারের কার্য্যকর ভূমিকা, একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিদাতা এই সুনীতিবিগর্হিত অপচেষ্টাটীকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ধর্ম্ম কখনও উস্কানি দিয়াছে কি? ধর্ম্ম যদি লুণ্ঠনে উৎসাহ দেয়, তাহা হইলে তাহা আর ধর্ম্ম থাকে না, তাহা রাজনীতি বা সমরনীতিতে

পরিণত হয়। রাজনীতি যখন ধর্ম্মের দোহাই দেয়, তখন তাহার পক্ষে ধর্ম্মের ভণ্ডামিতে পরিণত হওয়া খুব কঠিন বা সুদূর ব্যাপার নহে। ধর্ম্মের নামে ঐক্য যখন তোমাদিগকে এই রূপ অসৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তনা বা প্ররোচনা দিবে, তখন বুঝিতে হইবে, ইহা ধর্ম্মান্দোলন নহে, ইহা পরস্বাপহারীদের মুখরোচক ছলনা-বাদ বা ডিপ্লোম্যাসি মাত্র। ধর্ম্ম যখন জীবে জীবে ঐক্য, সখ্য, প্রেম ও নির্ব্বিরোধ ভাব উপজাত করিবার কাজে নিজেকে বিরত না রাখিয়া নিরত করে, ধর্ম্ম যখন জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, দেশ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকে ভালবাসিবার ও সেবা করিবার সৎপ্রবৃত্তি জোগায়, তখনই ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্মবাচ্য হইয়া থাকে। সেই প্রকৃত ধর্ম্মকে তোমাদের প্রতিজনের জীবনে রূপায়িত করিবার জন্য তোমরা বদ্ধপরিকর হও। কি হইবে তাহার উপায়, তদ্বিষয়ে আগে একমত হও এবং সেই উপায়কে অবলম্বন করিবার জন্য প্রতিজনে দৃঢ়ধী হও। সাময়িক দুর্ব্বলতা, সাময়িক দরিদ্রতা বা সাময়িক সংখ্যাল্পতাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিও না। জাতীয় জীবনে নিজেদের যোগ্য প্রাপ্য লাভ করিতে হইলে সংখ্যাও একটা গণনীয় জিনিষ বটে, কিন্তু কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা জগতে কোনও সুমহতী কীর্ত্তি স্থাপন কেহ করিতে পারে না। সংখ্যাল্প মানুষদের ভিতরেও যদি মনুষ্যত্বের প্রকৃত দীপ্তি অধিক থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বুকে নিজেদের ছাপ রাখিয়া যাইতে পারে। সাম্প্রদায়িক বিচার-বুদ্ধির দ্বারা

নিজেদের একটী কর্ত্তব্যকেও নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিও না, চেষ্টা করিও উদার মানবিক ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে। বিশ্বের সমস্ত মানুষ কখনই একধর্ম্মাবলম্বী হইবে না। এই বিষয়ে যাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যতই অধিক হউক, পূর্ণতঃ আশাপূরণ কদাচ কাহারো হইবে না। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির বিচিত্রতা যেমন অনবগাহ, জগতে ধর্ম্মের বিচিত্রতাও তেমনই অনবগাহ থাকিবে। নিজধর্ম্মকে দিগ্‌বিদিকে প্রচারের চেষ্টার মধ্য দিয়া পৃথিবীর কতকগুলি লোক এক প্রকারের সদনুশীলনে নিরত থাকে, নিজ নিজ ধর্ম্ম-প্রচার-চেষ্টা সম্পর্কে এই কথাটুকুই প্রশংসার সহিত উচ্চারিতব্য। একমাত্র অমুক ধর্ম্মের প্রচারের মধ্য দিয়াই জগতের উদ্ধার হইবে আর তমুক ধর্ম্ম দ্বারা জগতের লোক কেবল নরকের দুয়ারই খোলা পাইবে, এতজ্জাতীয় প্রচারে আস্থা স্থাপন করিয়া বিভ্রান্ত হইবার মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই। অপরের শান্তি ও সুস্থিরতার অবিরোধে যে যে যার যার নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণ করিলে বা ধর্ম্মের নির্দ্দেশ পালন করিয়া গেলে জগতে ধর্ম্ম নিয়া বিরোধাত্মক, বিদ্রূপাত্মক বা দ্বন্দ্বমূলক তর্ক বা সমালোচনার আর ক্ষেত্রই থাকে না। একদা জগতে এমন দিন নিশ্চয়ই আসিতে পারে, যেদিন ধর্ম্ম লইয়া বিরোধ থাকিবে না, ধর্ম্ম মানুষের প্রাণে কেবল অনাবিল শান্তিই বিতরণ করিতে থাকিবে। ভাবী সেই শুভ দিনটীর দিকে তাকাইয়া তোমরা নিজেদের দুর্ব্বলতা, দারিদ্র্য

ও সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও একলক্ষ্য হও, ঐক্যবদ্ধ হও, সখ্যসম্পন্ন হও, সৎ-ক্রিয়ান্বিত হও। দুর্ব্বলতা, দরিদ্রতা, সংখ্যাল্পতা কিছুই তোমার উন্নতির পক্ষে প্রকৃত বাধক নহে, যদি তোমার মানস-চেতনায় উদার বিশ্বালিঙ্গনকারী প্রেমকে একেবারে বনিয়াদে নিয়া বসাইতে পার। ইতিহাস তাহার কন্দুক-ক্রীড়ায় কতবার যে তোমাদের বিরুদ্ধে 'গোল' দিবে, তাহার স্থিরতা নাই। তথাপি কদাচ তোমরা তোমাদের মানবিকতা-বোধকে বিসর্জ্জন দিয়া ভ্রান্ত উন্মায় বিচলিত হইও না। আত্ম-রক্ষার অধিকার জগতের প্রত্যেকেরই আছে, কিন্তু আত্মহননের অধিকার তোমাকে কে দিল? নিজেদের ভবিষ্যৎকে অবিশ্বাস করা আত্মহননেরই নামান্তর। উদ্বেগাকুল হইয়া ব্রতভ্রষ্ট, অভয়ভ্রষ্ট, কক্ষভ্রষ্ট হওয়া আত্মহননেরই রূপান্তর। তোমাদের জীবনের মধ্য দিয়া ঘুমন্ত বিশ্বমানব নূতন করিয়া এক দিব্য জীবন লাভ করিবে, এই বিশ্বাসে অবিচল হইয়া প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিও, প্রতিটি হৃৎস্পন্দন গণিও।"

সৎ চিন্তা, সৎ চেষ্টা ও সৎ কর্ম্ম

কুমিল্লা জেলান্তর্গত ইলিয়টগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা তোমাদের দুর্জ্জয় শক্তিকে অবিশ্বাস করিও না। সকলে জানিও যে, শক্তির উৎস ঐক্যে এবং ঐক্য আসে সম্প্রীতি হইতে আর সদুদ্দেশ্যের অভিন্নতা হইতে। চরিত্রবান্

আদর্শ-নিষ্ঠ কলহলেশ-বর্জ্জিত সৎ-লোকদের ঐক্য জগতে কল্পনাতীত শুভ সম্পাদন করে। চারিদিকের গ্রামগুলিতে অবাধে বিচরণ কর। নানা সৎপ্রসঙ্গের মধ্য দিয়া, গ্রাম-হিতকর নানা সদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সেই লোকগুলিকে খুঁজিয়া বাহির কর, যাঁহাদের মন রহিয়াছে সৎ হইবার, সৎ কাজ করিবার, সৎপ্রয়াসের সহিত নিজেদিগকে সংযুক্ত রাখিবার। শ্রমে অকাতর রহিয়া এই যে অন্বেষণ, ইহার এক অসাধারণ মূল্য আছে জানিও। সৎলোক, সদভিমুখী লোক, সচ্চেষ্টা-পরায়ণ লোক খুঁজিতে গিয়া তোমার মন নিয়ত যে সদাদর্শের ধ্যান করিবে, তাহা তোমার জীবনটীকে এক অপরূপ সুষমায় সুন্দর করিয়া তুলিবে। তুলনাহীন এক শুচিশুদ্ধ মনের অধিকারী হইয়া তুমি কৃতকৃতার্থ হইবে। আমি যে সুযোগ পাইলেই পরিচিত বা অপরিচিত পল্লীর পর পল্লীতে কেবলই ঘুরিয়া মরিতেছি, তাহারও উদ্দেশ্য শুধু এই। আজ যেখানে সৎ মানুষ খুঁজিতে গিয়া বৃথা বিফলতাই শুধু আহরণ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিলাম, এক যুগ বা এক শতাব্দী পরে সেখানে আমার এই আকুতি এমন লোকের প্রাণটীকে সবলে আকর্ষণ করিবে, যে আমাকে দেখে নাই, যাহাকে আমি তাহার পার্থিব শরীরে নিরীক্ষণ করিতে পাই নাই, যাহার জন্ম ঘটিয়াছে আমার দেহান্তের এক দশক বা এক শতাব্দী পরে। আমার এই কথায় পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া তোমরা গ্রামে গ্রামে যাও, গান গাহিয়া কর্ণে কর্ণে মধু

ঢালো—'মানুষ খুঁজিয়া মরে মানুষেরি মন।' তোমরা যে খুঁজিয়াছ, ইহাই হইবে বড় কথা বা দুর্লভ সত্য। তোমরা কাহাকেও পাইয়াছ বা পাও নাই, ইহা বড় কথা নহে। ছুটিয়া যাও-গ্রাম-গ্রামান্তরে, খুঁজিতে থাক কুটীর-কুটীরান্তরে। কাহাকেও পাইলে না বলিয়া আফশোষ রাখিও না,—একদা এক সুদূর ভবিষ্যতে হইলেও তোমাদের এই অন্বেষণের শ্রম পরিপূর্ণ সার্থকতায় পুরস্কৃত হইবে। তোমার জীবনান্তের সঙ্গেই তোমার কাজ ফুরাইয়া যাইতেছে না, তুমি যে কাজ করিয়া যাইতেছ, তাহা তোমার পরে এবং তাহারও পরে অগণিত কর্ম্মিচম্ নিজেদের হাতে তুলিয়া নিবে। সৎ ও শুদ্ধ কর্ম্মের ইহা এক স্বাভাবিক সৌভাগ্য যে, এই কর্ম্ম-স্রোতের ধারাবহনকারী ভগীরথেরা এক এক জনের দেহান্তের পরে কেবলই জন্ম লাভ করিতে থাকে। ইতিহাসের অজ্ঞাতসারে এবং আমাদের অজানিতে এই সত্যটী নিরন্তর তাহার কাজ করিয়া যাইতেছিল বলিয়াই কোন্ সুদূর অতীতের মন্ত্রদ্রষ্টা পূর্ব্বপুরুষের বিস্মৃত যুগের সাধনার মূল অগ্নিশিখাটী এখনো প্রণব-মন্ত্র রূপে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। তোমার আমার পূর্ব্বপুরুষেরা ত' নিজ ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য কখনও প্রচারণার আশ্রয় নেন নাই, বরং যুগের পর যুগ নানা অনার্য-উপাসনা-পদ্ধতির প্রতি সহনশীল থাকিবার ফলে নিজেদের মূল লক্ষ্য হইতে সরিয়া পড়িবার দুর্নিবার সম্ভাবনার

কবলে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছেন শুধু ঐ একটী কারণের জন্য, যাহা এই মাত্র বলিয়াছি। সৎ ও শুদ্ধকর্ম্মের স্বাভাবিক শুভফলই হইতেছে, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভাবে প্রবহমান থাকা। অর্থাৎ অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র ধনু হইতে ছাড়িয়া দিবার পরে ধানুষ্ক রণক্ষেত্রে পতিত হইলেও ব্রহ্মাস্ত্র ততক্ষণ তাহার নিজ লক্ষ্য-পথে চলিতেই থাকে, যতক্ষণ না সে তাহার অভিলষিত বস্তুতে পৌছিয়া যায়। ব্রহ্মাস্ত্র কখনও পথমধ্যবর্ত্তী বাধাকে গ্রাহ্য করে না। সৎ চিন্তা, সৎ চেষ্টা, সৎ কর্ম্ম কদাচ মিথ্যা হয় না, কদাচ ব্যর্থ হয় না, কদাচ মরে না।"

জীবন পণ কর

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত মহামুনি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একজনে বিপদে পড়িলে সমাজের দশজনে তাহার উদ্ধারের জন্য ছুটিয়া আসিবে, ইহাই সুস্থ সমাজের লক্ষণ। সমাজের সৃষ্টি এই উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল যে, একের বিপদের দিনে দশ জনে যেন সহায়তা দিয়া তাহাকে বাঁচিয়া থাকিবার সহায়তা করে। কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের মনের গঠন এবং শারীরিক অনুশীলন এমন হওয়া প্রয়োজন যেন নিজের বিপদ নিজ-ভুজবলে দূর করিবার সামর্থ্যটী পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রহে।

"বিপদে পড়িয়া বারংবার একই মানুষদের কাছে সাহায্যের জন্য গেলে, তাহাদের মন ও প্রবৃত্তি যথেষ্ট সৎ ও উদার থাকা সত্ত্বেও বারংবার তাহারা হয়ত তোমাকে সহায়তা করিতে সমর্থ হইতে পারে না। উপায় বাহির কর, যাহাতে, কোনো বিপদেই কাহারো কাছে সহজে যাইতে না হয়। যে জীবন-পণ করিয়া পথের অনুসন্ধান করে, তাহার জন্য দুর্গম অরণ্য আর দুর্লঙ্ঘ্য উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা পথ ছাড়িয়া দেয়, তার জন্য মরুভূমির বালুকা-বিস্তারে ঘন ঘন না হউক, দূরে দূরে হইলেও ছায়াশীতল খর্জ্জুর-কুঞ্জ রচিত হয়। বাধা, বিঘ্ন ও বিপত্তিকে পরমেশ্বরেরই দান বলিয়া গ্রহণ কর। দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণা ও উপদ্রব তাঁহার দান ভাবিয়া তাঁহার নামে কাঁদিতে শিখ। দেখিও, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমার জন্য কাঁদিবে। দুঃখ যতই বিপুল হউক, হতাশ, নিরুদ্যম ও মনের দিক দিয়া দুর্ব্বল হইলে চলিবে না, তোমাকে দুঃখজনক পরিস্থিতিকে জয় করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে। সংগ্রাম করিতে করিতে মৃত্যুবরণ শ্লাঘ্য, বিনা যুদ্ধে পলায়ন বড়ই অপমানজনক।"

অদ্য বর্দ্ধমানের বক্তৃতার চতুর্থ দিবস। অপরাহ্নে বর্দ্ধমান হরিসভার মাঠে লোকে লোকারণ্য। সম্মুখস্থ জনপথ জাম্ হইয়া গিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষগুলিতে পর্য্যন্ত শত শত মানুষ,—বিশেষ করিয়া বালক ও যুবকের দল,—উঠিয়া বসিয়া আছেন। নিদ্রিত বর্দ্ধমান আজ সত্যই জাগিয়াছে।

যুগোচিত কর্ত্তব্য

আবেগকম্পিত কণ্ঠে শ্রীশ্রীবাবামণি ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন,—মিথ্যা ক'রেই রটনা করা হয় যে, ভারতবাসীরা মারা গেছে, দেহ্ আছে ত' প্রাণ নাই, প্রাণ আছে ত' তার ক্রিয়া নাই, ক্রিয়া আছে ত' তার কোনো লক্ষ্য নাই, লক্ষ্য আছে ত' তার কোনো মর্য্যাদা নাই। চিত্তাবসাদক আত্মশ্রদ্ধানাশক এই সকল উক্তি বারংবার উচ্চারণ কত্তে কত্তে আর শুন্‌তে শুন্‌তে মরীচিকামুগ্ধ মায়াজালবদ্ধ মৃগের ন্যায় ভারতাত্মা কেবল শেষ মুহূর্ত্তটুকুর জন্য থরহরি কম্পমান হ'য়ে কাল কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু ভারতের সিংহ-পুরুষেরা কেশরি-গর্জ্জন ক'রে এই ভ্রম ভেঙ্গে দিয়েছেন। আজ কর্ম্মে ব্রতী হওয়ার দিন এসেছে, আজ প্রত্যেকের অমিত উৎসাহে প্রবল বিক্রমে কেবল অগ্রসর হ'য়েই যেতে হবে। "অগ্রগামী হও", "অগ্রগামী হও", কেবল এই একটী বাণীই সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের দাবীকে মিটাবার চেষ্টাই আজকের যুগোচিত কর্ত্তব্য।

বক্তৃতা আড়াই ঘণ্টাকাল চলিল। চিত্রার্পিতবৎ নিঃশব্দে বসিয়া সহস্রাধিক নরনারী আদ্যোপান্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন।

দীক্ষা না নিয়াও শিষ্যত্ব

লোকজন কমিয়া গেলে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত একান্তে দেখা করিলেন। বলিলেন,—

বাবা, আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল যে, আমি আপনার চেয়ে বয়সে জ্যেষ্ঠ, এই অবস্থায় আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ কত্তে পারি কিনা। আপনার আজকের বক্তৃতার নানা ঘটনার উল্লেখের মধ্যে দেখ্‌লাম বুদ্ধদেব নিজ মাতা, পিতা, গুরুজনদের পর্য্যন্ত নিজ ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছেন। আচ্ছা বাবা, আমি কি আপনার কাছে দীক্ষা পাব?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—দীক্ষা নিতেই হবে, তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। দীক্ষা না নিয়েও প্রকৃত শিষ্য হওয়া যায়। বরং চেষ্টা কর, দীক্ষা-রূপ একটা প্রথার কাছে মাথা বলি না দিয়েও প্রকৃত শিষ্য হ'তে পার কিনা।

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—সেটা আবার কি রকম ক'রে হতে পারে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার প্রদত্ত শিক্ষাগুলি থেকে সার-সংগ্রহ কর, তাকে নিজ জীবনে এবং নিজ পরিবারস্থ সকলের জীবনে রূপবন্ত করার চেষ্টা কর, আর সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাটী রেখে যাও যে, আমারই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তুমি চল্‌ছ। এটা কি তেমন কঠিন কাজ?

প্রকৃত শিষ্য

জিজ্ঞাসু আর একটী প্রশ্ন করিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি নীতি তোমাকে অবশ্যই এজন্য

অনুসরণ কত্তে হবে। প্রথমতঃ আমার চিন্তা, ভাবনা, আদর্শ ও কর্ম্মচেষ্টার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন হবে। আর প্রয়োজন হবে, এই কর্ম্মচেষ্টায় স্বেচ্ছাদত্ত সহযোগ,—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। এই সর্ত্তগুলি পালন কল্লেই তুমি আমার শিষ্য হ'লে। পালন যদি না কর, তবে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েও তুমি আমার শিষ্য নও, শিষ্য-নামধারী একজন প্রতারক মাত্র।

আমি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—তবে আমি কি নাম ধ'রে ভগবানকে নিরন্তর স্মরণ কর্ব্ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে তুমি ভগবানকে যে নাম ধ'রে ডেকেছিলে, ঠিক সেই নাম ধ'রেই ডাক্‌বে।

জিজ্ঞাসু বলিলেন,—আমিও বাড়ী থেকে আসবার সময়ে এই কথাটীই মনে মনে ভেবে এসেছিলাম যে, আমি যে নামে তাঁকে আজ ডেকেছি, সেই নামেই যদি দীক্ষা দেন, তবেই দীক্ষা নেব।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—চমৎকার ত' তোমার ফন্দী। গুরুকে আগে পরীক্ষা করবে, তার পরে দীক্ষা নেবে। কিন্তু তুমি ত' তোমার পরীক্ষার ফলটী পেলে। কিন্তু তোমাকে আমি দীক্ষা দেব না। কারণ, স্বভাবতঃই তোমার একনিষ্ঠা আছে। তবে আর দীক্ষা নিবার প্রয়োজন কি রইল?

জিজ্ঞাসু বলিলেন,—আমি আপনার বক্তৃতাবলির ভিতরে আমার এই প্রশ্নটীর জবাব খুঁজছিলাম যে, আপনি কোন্ মন্ত্রে দীক্ষা দেন। যে যা' চায়, তাকে সেই মন্ত্রেই কি দীক্ষা দেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার সমস্ত জীবনের সবগুলি বক্তৃতা শুনেও তুমি কদাচ ধারণা কর্ত্তে পার্ব্বে না যে, আমার নিজের ধর্ম্মমতটা কি। আমার মতটা লোককে জানানোর আমার গরজ নেই। যার যেই মত, সে সেই মতে সাধন ক'রেই কৃতার্থ হোক্, এইটাই আমার উদ্দেশ্য। ভাষণমঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি কখনো আমার নিজের ধর্ম্ম মত ব্যাখ্যা করি না। এরই ফলে অন্যের ধর্ম্মমতকে সমালোচনা করার আমার প্রয়োজন হয় না। সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে যে কথাগুলি প্রয়োজন, আমি অবিচলিত বিক্রমে সেই কথাগুলিই ব'লে যাই। এজন্যই কেউ কখনো জানতে পারে না যে, আমি কোন্ মন্ত্রে দীক্ষা দেই। আমি নিজে যে মন্ত্রের সাধন ক'রে এসেছি এবং করি, মাত্র সেই মন্ত্রেই দীক্ষা দেই। এজন্য আমার প্রকৃত ধর্ম্মমত দীক্ষার ঘরে ছাড়া অন্যত্র কেউ জানতে পারে না।

জিজ্ঞাসু বলিলেন,—এতে ত' দীক্ষার্থীর পক্ষে অসুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি দলে দলে লোককে দীক্ষা

দিয়ে শিষ্য কর্ত্তে আগ্রহী নই। তারা যখন নিজের গরজে আগ্রহী হ'য়ে দীক্ষাগৃহে প্রবেশ কর্ব্বে, তার আগে আমি আমার নিগূঢ় ধর্ম্মের রহস্যাবলি উদ্‌ঘাটিত ক'রে কি উলুবনে মুক্তা ছড়াব? জীবন-কর্ম্মেও আমি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, জীবন-ধর্ম্মেও আমি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক।

সাম্প্রদায়িকতা ও অসাম্প্রদায়িকতার দুই দিক

নানা রকমের কথাই উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাম্প্রদায়িকতার বিপদ হচ্ছে সঙ্কীর্ণতা এবং অপরের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অন্ধতা। অসাম্প্রদায়িকতার বিপদ হচ্ছে অত্যধিক উদারতা এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে অনবধানতা। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিসম্পন্নেরা অতি দ্রুত এবং একটী মাত্র ভাবাবেগের সংঘাতে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে যায়। অসাম্প্রদায়িক ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা অতীব গুরুতর প্রয়োজনের সময়েও ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে না এবং সম্ভাব্য শত্রু বা আক্রমণকারী সম্পর্কে সতর্ক হতে চায় না। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ঐক্যবদ্ধ হ'লে অনেক সময়ে এমন কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, যার জন্য কোনো মানুষ কদাচ গৌরব অনুভব কর্ত্তে পারে না। অসাম্প্রদায়িক মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হ'লে কোনও গুরুতর

কুকার্য্যের অনুষ্ঠানের আপাত-প্রতীয়মান প্রয়োজন এসে পড়লেও দশ জন চিন্তাশীল লোক এমন কুকার্য্য অনুমোদন কত্তে অস্বীকার করে। সাম্প্রদায়িকতা ও অসাম্প্রদায়িকতার ভালমন্দ দুইটী দিকই আছে।

ভদ্রলোক প্রণত হইয়া বলিলেন,—কাল আমি সকালে গাড়ী নিয়ে আসব। আপনাকে আমার বাড়ীতে যেতেই হবে। আমার স্ত্রী, আমার বিধবা ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতির দীক্ষা চাইই চাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভদ্রলোকের নাম খগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, তিনি ইরিগেশান্ বিভাগের এস-ডি-ও।

মানুষের ভবিষ্যৎ

ইহার পরেই একটী জন-সেবক যুবক কতকগুলি কথাবার্ত্তার অবতারণা করিলেন। উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনুষ্য-জাতির সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা একদা কি হবে, তা' নিয়ে গবেষণা করার বিপদ আছে। বিপদ হচ্ছে অসম্পূর্ণতার আর অনুমানের। শ্রেণী থাক্‌বে না, পরিবার থাক্‌বে না, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাক্‌বে না, ধর্ম্ম থাক্‌বে না, রাষ্ট্র থাক্‌বে না, অথচ মানুষগুলি থাক্‌বে,—এই প্রস্তাব মেনে নিলেও তখনকার মানুষের শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি, উন্নতি, স্বাধীনতা বা উপলব্ধি কোন্ স্তরে থাক্‌বে, তা' ত' বাবা

অনুমান করা যাচ্ছে না। আদিম অবস্থায় মানুষের শ্রেণীবোধ ছিল না, ধর্ম্মবোধ জাগে নাই, পরিবার গঠনের রুচি আসে নাই, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বা অনধিকার সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, রাষ্ট্র ছিল না, শাসক ছিল না, শোষক ছিল না, কিন্তু তখন মানুষ শান্তিতে, তৃপ্তিতে আনন্দে ছিল কি? যদি তাই থেকে থাকে, তবে ভবিষ্যতে মানুষের ক্রমোন্নতি হ'তে হ'তে সেই অবস্থাটী অতি অবশ্যই আপনা আপনি আস্‌বে। মানুষকে সরল হ'তে দাও, কুটিলতা বর্জ্জন কত্তে দাও, ক্রূরকর্ম্ম হ'তে বিরত হ'তে দাও, বিবেকবান্ হ'তে দাও এবং সেই দিকে যাতে তার গতি বাড়ে, তার জন্য প্রয়াসপরায়ণ হও। স্বভাবের গতিতেই একটা ক্ষুদ্র কীট থেকে তুমি আমি মানুষ-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছি, স্বভাবের গতিতেই মানুষ তার আদর্শ লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। মানুষের ইতিহাস যারা অধ্যয়ন বা উদ্‌ঘাটন করেছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, মানুষের কেবলই ক্রমোন্নতি হচ্ছে। শরীরে, মনে, নীতিতে, জ্ঞানে, ব্যবহারে, জীবন-চর্য্যায় মানুষ পূর্ণতর হবার দিকে ছুটে চলতে চাচ্ছে, এটাই মানুষের ইতিহাস। কিন্তু মানুষের লোভ, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়লিপ্সা এবং পরবঞ্চনা-প্রবৃত্তি তাকে ঠিক মত এগুতে দিচ্ছে না। মানবজাতির যে একটা অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে, এই বিশ্বাস নিয়ে চল এবং এই বিশ্বাসটী

অপরাপরের প্রাণে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দাও। অবশ্য, তুমি আমি যদি একাজটী নাও করি, তথাপি মানবের স্বাভাবিক পরিণতি পথমধ্যে হোঁচট খেয়ে আট্‌কে পড়ে থাকবে না। মানুষকে সুখী, জীবনকে সুখ-নিকেতন ক'রে তোলার জন্য মানব-মনীষা নিজে থেকে একাজ ক'রে যাবে। তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। আর্থিক অবস্থা দিয়ে বা পেটের ক্ষুধা দিয়ে মানুষকে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। মানুষ এর চেয়ে অনেক বড়। তাকে মাপতে হবে ত্যাগ দিয়ে, সংযম দিয়ে, আর ভবিষ্যতের মহত্তর পরিণতিকে ত্বরান্বিত করার কাজে আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে।

মানুষ সর্ব্বাগ্রে মানুষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিক্ষার গুণে মানবজাতিকে এক নবীনতর স্তরে উন্নীত করা যায়। প্রকৃত শিক্ষা আর যোগ্য শিক্ষাদাতার হচ্ছে প্রয়োজন। মানুষ যে সর্ব্বাগ্রে মানুষ, পশু নয়, কীট নয়, পতঙ্গ নয়, মানুষ যে অনেক লক্ষ বৎসর আগেই পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গের স্তর অতিক্রম ক'রে এসেছে, এই কথাটা প্রত্যেকটী কর্ণে প্রবেশ করাতে হবে। নিজের বিচারশক্তি দিয়ে মানুষ নিজের সম্ভাব্য ভবিতব্যকে বিচার করুক, তৌল করুক। স্বাধীন ইচ্ছায় সে গ'ড়ে উঠুক। লক্ষ লক্ষ লোকের স্বাধীন ইচ্ছা যখন ঐক্যতানের মত বাজতে

থাকে, তখন সে যা-কিছু করুক না কেন, তাতেই দেখা যাবে যে, যতিভঙ্গ নেই, তাল-ভঙ্গ নেই, রাগিণীর অন্তর্ঘাত নেই। সেই সুমধুর মিলন-সঙ্গীত গাইবার জন্যই মানুষকে ভগবান্ কণ্ঠ দিয়েছেন।

বর্দ্ধমান-হরিসভা
১৪ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৪২
(২৯শে জুন, ১৯৩৫)

উপবীত ধারণ সম্পর্কে

প্রাতঃকালীন যৌগিক-আসন-মুদ্রার শিক্ষাদানের পরে জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রাহ্মণদের উপবীত-ধারণ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রাহ্মণের ছেলেদের কেন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নির্ব্বিশেষে ত্রিবর্ণের সন্তানদেরই উপবীত-ধারণ প্রাচীনকালে বাধ্যকর ছিল। এটাকে নানা জনে নানা দৃষ্টিতে দেখেছেন। কেউ ভেবেছেন, এটা জাত্যভিমানের পরিপোষক এবং নিম্নতর বর্ণের প্রতি বিদ্বেষের উত্তেজক। সুতরাং এটাকে রহিত ক'রে দেওয়াই উচিত। সেই চেষ্টা স্বধর্ম্মাবলম্বী ও বিধর্ম্মী উভয় দিক্ থেকেই হয়েছে। আবার কেউ ভেবেছেন, অতীতের গৌরব ত' নিজেদের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট নেই, যা' আছে, তা' কেবল বংশের পরিচয়টুকু। এইটুকুকে সযত্নে ধ'রে রাখলে যদি কখনো কোনো সৌভাগ্যের ফলে বা

কারো কোনো তপস্যার বলে প্রকৃত দ্বিজত্ব নিজ-চরিত্রে ফুটে ওঠে, তবে তা' হবে এক মহাভাগ্যের কথা। সুতরাং পৈতেটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে লাভ নেই, ওটা গলায় জড়ানোই থাক। এইরূপ দ্বিবিধ চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে দুই দল লোক দুই প্রকারের আচরণ করেছেন। উভয় আচরণের শুভ বা অশুভ ফলাফল যে কি হ'তে পারে, তা' সঠিক জান্‌বার জন্য আমাদের আরো বেশ কিছুদিন প্রতীক্ষা কত্তে হবে। যে সকল বংশে উপবীত ধারণের রীতি চলে এসেছে, তারা সমস্ত জীবন যাই করুক আর না করুক, উপবীত ধারণের প্রথম তিনটী দিন বা প্রথম দ্বাদশ দিন একটা বিশেষ নিয়মের মধ্যে অবস্থান করে। এই নিয়ম আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের জীবনের সুদীর্ঘকালের এক সদাচরণের স্মারক ও প্রতিচ্ছবি। যার রুচি আছে, সে যদি অতীতের স্বর্ণযুগকে এভাবে একবার স্মৃতিপথে টেনে আনে, তবে তা' যে মঙ্গলজনক হতে পারে, সেকথা অস্বীকার করা সঙ্গত নয়। কিন্তু যে যে পরিবারে উপবীত ধারণের প্রথা স্মরণাতীত কাল থেকেই নেই, সেই সেই পরিবারের লোকেরা উপবীত ধারণ কর্ল্লে আত্মীয়-পরিজনদের ভিতরে উক্ত রূপ আচরণের দৃষ্টান্ত না থাকায়, তার পক্ষে 'হংসমধ্যে বকো যথা' অবস্থা হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং উপবীতী হবার জন্য তাকে এগিয়ে আসবার জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা প্রদান করা সঙ্গত হবে কিনা, সেটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারের উপরে নির্ভর কর্ব্বে।

দীক্ষা ও উপনয়ন

আর একজনের আর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা যদি যজ্ঞোপবীত ধারণেই ইচ্ছুক হও, তাহ'লে দীক্ষার দিনই দীক্ষার আনুষঙ্গিক-রূপে গুরুদত্ত-যজ্ঞোপবীত ধারণ কত্তে পার। তার জন্য আলাদা কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই প্রথমতঃ এই যুক্তিতে যে, দীক্ষা-কালেই গুরুদেব কর্ত্তৃক উপবীত প্রদান একটী শিষ্টানুমোদিত প্রথাই হ'য়ে গেছে। বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী, বাবা সন্তদাস আদি মহাপুরুষেরা এরকম করেছেন। আলাদা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন যে নেই, তার দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, তোমরা আমার কাছে যে দীক্ষা পাও, তা হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যের দীক্ষা। সুতরাং প্রাক্-প্রচলিত যজ্ঞসূত্র-প্রদান ও ধারণের প্রথাটুকু ছাড়া এর মধ্যে আর সবটাই প্রাচীন কালের গুরুগৃহে গিয়ে ব্রহ্মবিদ্যালাভের ব্রতগ্রহণের অনুকল্প মাত্র। অখণ্ডদের দীক্ষা ব্রাহ্মী দীক্ষা। সুতরাং উপবীত নিলেই নেওয়া যেতে পারে, দিলেই দেওয়া যেতে পারে। প্রাচীন "মাতৃদেবো ভব" "পিতৃদেবো ভব" এ দীক্ষাতে র'য়ে গেছে, এ দীক্ষার লক্ষ্যও জীবনে সংযম-ব্রহ্মচর্য্যকে যথাসাধ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা, সর্ব্বোপরি অখণ্ড-দীক্ষার পরম ও চরম লক্ষ্য নিজের মোক্ষের পথে সাথে সাথে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কুশলের জন্য তপস্যা করা। আদর্শের দিক্ থেকে অখণ্ড-দীক্ষা এত উঁচু যে, এই দীক্ষার

সময়ে দীক্ষাদাতা ইচ্ছা করলেই তোমাকে যজ্ঞোপবীত দিয়ে দিতে পারেন, ইচ্ছা কল্লেই এই পবিত্র প্রতীকটী তুমি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নিতে পার।

যজ্ঞোপবীত একটী প্রতীক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, যজ্ঞোপবীত একটী প্রতীক। সংশিতব্রত, সংযতচেতা, আত্মগঠনকামী, নিয়ত উন্নতিপরায়ণ, ঊর্দ্ধমুখ ও সর্ব্ব-জনকল্যাণে মননশীল একটী জীবনের এটী প্রতীক। উপবীত তোমাকে অন্য দশ জনের কাছ থেকে পৃথক্ ক'রে দিচ্ছে। বারংবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তুমি অন্য দশ জনের মতন নও, তুমি তাদেরই সমান নও, তোমার জীবন-গতি ও গমন-পথ হুবহু তাদেরই মতন আটপৌরে নয়, তোমার ভিতরে একটী বিশেষত্ব আছে, যেই বিশেষত্ব নেই ব'লে অন্য লোকেরা অব্রাহ্মণ, অজ্ঞান, অন্ত্যজ বা অপাংক্তেয়, আর যা' আছে ব'লে তুমি ব্রাহ্মণ, জ্ঞানবান্, বর্ণশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনমান্য। সেই বিশেষত্ব তোমার পরম বিদ্যা লাভের আগ্রহ, চরম সত্য জানার ব্যাকুলতা, জীবনকে সত্যানুবর্ত্তী করার উদ্যম, নিজের ভিতরে শূদ্রত্বকে প্রবেশাধিকার দিতে সশস্ত্র আপত্তি, নিজেকে নিয়ত দিব্যভাবে ভাবিত ও দিব্যরূপে রূপায়িত ক'রে রাখার জন্য জাগ্রত, উদগ্র ও একাগ্র সাধনা। উপবীত ধারণ করার পরেও তুমি অতি সাধারণ তামসিক জীবন-

যাপন কর্ব্বে, হীনরুচি গ্রাম্য কথায় কাল কাটাবে, নীচবুদ্ধি ইতর কর্ম্মে আসক্ত হবে, জীবনের কুকর্ম্ম দিয়ে জীবনের মূল্যকে হেয় ও হীন কর্ব্বে,—এরূপ কখনো তুমি হ'তে দিতে পার না। উপবীত একটা ইউনিফর্ম্ম, এক সাত্ত্বিক সৈনিকের ইউনিফর্ম্ম, যা' ধারণ করার পরে তুমি কর্ত্তব্য থেকে নিজেকে পরিভ্রষ্ট কত্তে পার না, কুকার্য্যে, কুচিন্তায়, কুচর্চ্চায়, কদাচারে আসক্ত হতে পার না, ইতর সুখে গা ঢেলে দিয়ে নিজেকে সস্তা ক'রে ফেল্‌তে পার না। সুতরাং যজ্ঞোপবীত ধারণ একটা তুচ্ছ ব্যাপার নয়, একটা ছেলেখেলা নয়।

উপবীত গ্রহণ বনাম হাতে-খড়ি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধারণ অর্থে উপবীত গ্রহণ আর হাতে-খড়ি একই কথা। যে বয়সে আজকাল তোমাদের ছেলেমেয়েরা হাতে-খড়ি দিয়ে বিদ্যারম্ভ করে, প্রাচীন কালে ঠিক সেই বয়সে ছেলেমেয়েরা গুরুগৃহে গিয়ে উপবীতী হ'ত। হাতে-খড়ির মানেও বিদ্যা অর্জ্জনের সঙ্কল্প, বিদ্যা অর্জ্জনের সুরু, উপবীত ধারণের মানেও ঠিক তাই। তখনকার দিনে বিদ্যা বল্‌তেই লোকে প্রথমে বুঝ্‌ত ব্রহ্মবিদ্যা, তারপরে ভাব্‌ত সাংসারিক নানা বিদ্যার কথা। আজকাল শুধু সাংসারিক বিদ্যাটাকেই বিদ্যা ব'লে ভাবা হয় এবং সেই ভাব নিয়ে হাতে-খড়ি হয়। প্রাচীন-কালে ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে

গিয়েও সংসারের যা' প্রয়োজনে আস্‌বে এমন অসংখ্য বিদ্যা শিষ্যশিষ্যাদের আয়ত্ত কত্তে হ'ত। পার্থক্যটুকু মাত্র এইখানে। নতুবা উপনয়ন আর হাতে-খড়ি একেবারে এক কথা। হাতে-খড়ির দিনই বা হাতে-খড়ির সঙ্গে সঙ্গেই বালক-বালিকার দীক্ষা এবং উপনয়ন হ'য়ে যেতে পারে, এতে অসঙ্গতি কিছু নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ত হাতে-খড়িটা উপনয়নেরই অপভ্রংশ মাত্র। যাঁরা বৈদিক বিধির বাইরে থেকে নিজেদের সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিলেন, যাঁরা বৈদিক আর্য্যদের বংশধর ছিলেন না অথচ ছিলেন বিপুল জ্ঞান ও অতুল বিদ্যার অধিকারী, হাতে-খড়িটা তাঁদেরও প্রচলন হ'তে পারে। কিন্তু অভিপ্রায়ের দিক দিয়ে দুটোই এক।

উপবীত ও অহঙ্কার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু উপবীত ধারণের মধ্যে অহঙ্কারের একটা দিক্ আছে। আমি উপবীতী, অতএব আমি তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্ট, তোরা অনুপবীতী, অতএব তোরা আমার চেয়ে নিকৃষ্ট,—এই একটা বোধ প্রায় প্রত্যেকের মনে জন্মে। তখন উপবীতটা একটা আবর্জ্জনার বোঝার মত বা অদৃশ্য ভূতের মত কাঁধে চেপে বসে, তাকে সেখান থেকে নড়ানো যায় না, অথচ নিজেকে উৎকৃষ্ট রাখার জন্য কঠোর তপশ্চর্য্যার দিকে দৃষ্টিও হ'য়ে পড়ে বড় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। এর

ফলে একদল লোক উৎকর্ষের অনুশীলন না ক'রেও নিজেদিগকে উৎকৃষ্ট ব'লে চালিয়ে দেবার জন্য নানা ছলনা ও কূট-কৌশলের চর্চ্চা কত্তে সুরু করেন, অন্য একদল লোক এদের চালাকী বুঝতে পেরে এদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে তোলার অনুকূল পরিস্থিতি সব সৃষ্টি করেন। সংস্কৃতিগত এক শ্রেণী-সংগ্রাম তাতে সুরু হ'য়ে যায়। উপবীতী শ্রেণীর লোকদের প্রতিনিধিরা একবার ক'রে শাস্ত্রগুলিকে এক রকম ক'রে রচনা করেন, আবার আর একবার ক'রে অনুপবীতী শ্রেণীর লোকদের প্রতিনিধিরা সেই সকল শাস্ত্রবচনের উৎপীড়নের দিক্‌টাকে দুর্ব্বল ক'রে দেবার জন্য, ভেদ-দ্বেষের নেকড়েগুলির হাত-পায়ের নখ কেটে ফেলার জন্য, নূতন নূতন আন্দোলন উপস্থিত করেন। হিন্দু-সমাজের সাংস্কৃতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে এবং এক কথায় হ'ল এই। যজ্ঞসূত্র অহমিকাকে স্পর্দ্ধিত কচ্ছে, সেই স্পর্দ্ধাকে খর্ব্ব ক'রে দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সমত্বকে সুস্বীকৃত করিয়ে দেবার জন্য শক্তিশালী সাধকেরা কেউ বেদ-শাস্ত্রকে একেবারে অস্বীকার কচ্ছেন, কেউ বা বেদবিধির বাইরেই মানুষকে পরমতৃপ্তির পথ দেখিয়ে দিয়ে বলছেন,—হরিভক্তিপরায়ণ যদি কেউ হয়, তবে সে চণ্ডালকুলে জন্ম নিলেও দ্বিজগণের শ্রেষ্ঠ হয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশায়কে বল্‌তে শোনা যেত, "পৈতায় কামড়াচ্ছে।" যেখানে পৈতা

মানুষে মানুষে ভেদসৃষ্টির হয় সহায়ক, সেখানে পৈতা সমত্ববোধ-সম্পন্ন মমত্বশীল মহৎকে বারংবার সাপ হ'য়ে কামড়ায়, শত-বৃশ্চিক-দংশনের যন্ত্রণা দেয়।

প্রথা ও অধিকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা যারা উপবীত ধারণে ইচ্ছুক, তাদের এই কথাগুলি ভাব্‌বার প্রয়োজন আছে। যাদের কুলপ্রথাই উপবীত-ধারণ, তাঁরা চিরপ্রচলিত প্রথার প্রতি অনুরাগ অনুভব কর্ব্বেন, এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। যাঁদের কুলপ্রথার মধ্যে উপবীতের কোনও স্থান ছিল না, তাঁরা নূতন ক'রে উপবীত ধারণ কত্তে গেলে যে প্রথার সুবিধাভোগীরা আপত্তি কর্ব্বেন, কলরব তুলবেন, বিরুদ্ধতা কর্ব্বেন, আশ্চর্য্য হচ্ছে এইটুকু। তাঁদের দিকে যুক্তি হচ্ছে এই যে, প্রথা একটা অধিকার ; যার যা প্রথা, তার তা' অধিকার ; চিরাচরিত প্রথার মানে হচ্ছে চিরাচরিত অধিকার ; যাদের এ বিষয়ে প্রথা ছিল না, তাদের কোনো অধিকারও ছিল না ; যাদের কোনো প্রথা নাই, তাদের কোনো অধিকারও নাই। অপর পক্ষের যুক্তি এই যে, প্রথা কখনো অনাদি হ'তে পারে না, একদিন তার সৃষ্টি হয়েছিল, আর সেই সৃষ্টির মূলে ছিল একটী সুনির্দ্দিষ্ট সুস্পষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ববর্জ্জিত প্রয়োজন। যে প্রয়োজনে বিশেষ এক গোষ্ঠির মানুষগুলির ভিতরে একটী

প্রথার সৃষ্টি দশ হাজার বা দুই লক্ষ বছর আগে হয়েছিল, সেই প্রয়োজনে অপর এক গোষ্ঠির মানুষগুলির ভিতরে বা সমগ্র মানব-সমাজের মধ্যে সেই প্রথাটীর সৃষ্টি আজ এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বা কাল একবিংশ, একত্রিংশ বা একচত্বারিংশৎ শতাব্দীর শেষ ভাগে কেন হ'তে পার্ব্বে না? খ্রীষ্টের জন্মেরও দুচার হাজার বছর আগে গ্রীসে বা পারস্যে গোলাপ ফুল ফুট্‌ত ব'লে কি আজ তা ভারতবর্ষের উদ্যানে ফোটবার কোনো বাধা আছে? প্রাচীন হ'লেই প্রথা দামী হয় না, তার প্রয়োজন থাকা চাই। উপবীতী উপাধ্যায়ের পুত্র আজ মদের দোকান খুলছে, তার পৌত্র দিচ্ছে জুতোর দোকান আর যত জাতির যত খদ্দের আস্‌ছে, সকলের পায়ে ধ'রে ধ'রে জুতো পরিয়ে পরখ কচ্ছে যে, মাপে বন্‌ল কিনা, জুতোর দোকানের কর্ম্মচারীদের মধ্যে উপবীতী-বংশের পুত্রদের ত' দলে দলে দেখা যাচ্ছে, পৌত্রেরা হয়ত মুরগীর মাংসের ঝোল আর শূকরের মাংসের চপ তৈরী ক'রে রেস্তোঁরা চালাচ্ছে। উপবীতের উদ্দেশ্য এখানে বজায় রইল কৈ? এসব ক্ষেত্রে উপনয়ন, যজ্ঞসূত্র ধারণ, গলায় পৈতে ঝোলান ত' নিতান্তই একটা ফাঁকীবাজী ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। দোকানের সামনে মস্ত বড় সাইনবোর্ড,—"কল্পতরু-ভাণ্ডার, এখানে জগতের সব শ্রেষ্ঠ জিনিষ পাওয়া যায়," কিন্তু ঘরে ঢুক্‌লে কতকগুলি মরা ইন্দুর আর কাণা চামচিকা ছাড়া অন্য

কোনও বস্তুর দর্শন না মিললে যেমন অবস্থা হয়, এক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি অবস্থা হয়েছে।—এসব যুক্তি বড়ই শ্রুতিকটু কিন্তু মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

সর্ব্বমানবের অধিকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুতরাং উপবীত ধারণের আগে তোমাদের শতবার চিন্তা ক'রে দেখা উচিত যে, এটা ধারণ ক'রে একটা অনাবশ্যক উপসর্গের সৃষ্টি ক'রে বস্‌বে কিনা। আমি ত' নির্দ্দিষ্ট একটা বয়সে সর্ব্বমানবের উপবীত ধারণকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি। যারা কুলপ্রথা না থাকা সত্ত্বেও উপবীত ধারণ কচ্ছে, আমি তাদের সম্পর্কেও বিরুদ্ধচিন্তক নই। যাতে একটী মানুষের অধিকার আছে, তাতেই আমি সর্ব্বমানবের অধিকার স্বীকার করি। যে অবস্থায়, যে উদ্দেশ্যে, যে প্রয়োজনে, যে লক্ষ্যের দাবীতে একজনের পক্ষে উপবীত ধারণের অধিকার, সেই অবস্থায়, সেই উদ্দেশ্যে, সেই প্রয়োজনে এবং সেই লক্ষ্যের দাবীতে যদি হয়, তবে অপর সকলেরই সেই অধিকার আছে। মূলতঃ মানুষ মাত্রের সমত্বে ও সম-সম্ভাবনায় আমি বিশ্বাসী কিন্তু সবাই শূদ্র হ'য়ে, অধম হ'য়ে, চরিত্রে আর আচরণের নিকৃষ্টতম স্তরে নেমে এসে সমানত্ব প্রমাণ করুক, এ আমি চাই না। সবাই উত্তম হোক্, উচ্চতম হোক্, শ্রেষ্ঠ হোক্, অতুলনীয় হোক্, অপ্রতিদ্বন্দ্বী

হোক্, আর এই ভাবেই সকলের মধ্যে সমত্ব প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণিত হোক্। শ্রেষ্ঠত্বে সকলের আছে অধিকার এবং তপস্যা ক'রে প্রত্যেকে সেই অধিকার অর্জ্জন করুক। বিনা তপস্যায় শুধু কাঁধের উপরে কয়েক নাল কার্পাসের সুতো ঝুলিয়ে দিলেই অধিকার অর্জ্জিত হয় না। এই সত্য বিস্মৃত হ'য়ে তোমরা অন্ধের মত কেবল আচারকে অনুসরণ ক'রো না। আচারকে বিচারে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে, বিচারকে সত্য আচরণের ভিত্তিতে দাঁড়াতে হবে।

সবাইকে কি উপবীত দেওয়া যায়

যুবক আরও প্রশ্ন করিলেন,—আপনি কি কখনো নিজ হাতে কাউকে যজ্ঞোপবীত দেবেন? এমন কি, শূদ্র বা চণ্ডাল হ'লেও।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে কারো স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত তুলে দেবার অধিকার আমার আছে। এ অধিকার আমি পরিশ্রম ক'রে অর্জ্জন করেছি। কিন্তু মানুষের অন্তরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার জাগিয়ে দেওয়াই আমার কাজ। যাদের বংশে উপবীত ধারণের প্রথা আছে কিন্তু দারিদ্র্য বশতঃ তা' কত্তে পাচ্ছে না, তেমন দু-একজনকে উপবীত দান আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু আমার প্রাণ তাদেরই জন্য কাঁদছে, যারা নীচ,

হীন, অন্ত্যজ, চামার, চণ্ডাল আদি নামে সমাজের সকলের কাছে অনাদৃত। অথচ তাদের মধ্যে একজন আর দুজন এলে নিশ্চয়ই আমি তাদের উপবীত দিতে পারি না। যার আত্মীয়-কুটুম্ব বা রক্ত-মাংসের নিকট পরিবারগুলি অন্য ভাবে জীবন-যাপন কচ্ছে, তাদের মধ্যে হঠাৎ একজনকে একটা উপবীত দিয়ে দিলে সেই উপবীত কদিন তার স্কন্ধে থাক্‌তে পারবে বলত। পরিবেশ অনুকূল না হ'লে এবং সমাজটার ভিতরে একমুখ মনোভাব না এলে ঐ সমাজের মাঝ থেকে একজন আর দুজনকে ডেকে এনে উপবীত দেবার কোনো সুফল নেই। স্বামী বিবেকানন্দ প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ, তিনি কিছু জেলেকে ডেকে এনে যজ্ঞোপবীত পরিয়ে দিয়েছিলেন ব'লে আমরা শুনেছি এবং ধন্য ধন্য করেছি। কিন্তু খোঁজ ক'রে দেখ গিয়ে, কৈবর্ত্ত রূপ বিরাট সমাজ-সাগরে ঐ উপবীতের বাহক আজও আছে কিনা। এজন্যই একজন আর দুজন শূদ্রকে ডেকে এনে উপবীত দিতে পাচ্ছি না।

প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের কারণ

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি স্তূপীকৃত পত্রের জবাব দিতে বসিলেন। কুমিল্লা-জেলান্তর্গত ধর্ম্মনগর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমাদের দেশে অধিকাংশ মহৎ প্রতিষ্ঠানই যে অল্পায়ু হয়, ইহা বোধ হয় এতদিনে তোমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছ।

ইহার কারণ কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? তোমাদের মধ্যে যাহার সেবাশক্তি যতটুকু আছে, তোমরা তদপেক্ষা অধিক শক্তির দাবী কর। তোমাদের মধ্যে যে যতটুকু সেবা দিয়াছ বা দিতেছ, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দিয়াছ বা দিতেছ বলিয়া ভাণ কর। সহকর্ম্মীদের মধ্যে নিজেকেই শ্রেষ্ঠ সেবক বলিয়া অভিমান কর। কে কাহার অপেক্ষা পর্য্যায়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিয়া নিরন্তর কলহ কর। প্রতিষ্ঠানকে সেবা দিয়া তার আবার প্রতিদান প্রত্যাশা কর এবং যে প্রতিষ্ঠানকে বিশ বৎসরের মধ্যে মাত্র একটী চৌ-আনি দান করিয়াছ, সেই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রভাবশালী ট্রাষ্টী বা ন্যাস-রক্ষক হইবার অধিকার দাবী কর। আত্মভোলা সেবা তোমাদের নাই। প্রায় অধিকাংশ সেবাই তোমাদের আত্মস্পর্দ্ধিতাকে উঁচাইয়া তুলিতেছে। সেবা করিয়া তোমরা প্রতিষ্ঠানকে কৃতার্থ কর, নিজেরা কৃতার্থ হও না। প্রতিষ্ঠানের কত জানি ভাগ্য যে, তোমাদের সেবা পাইতেছে, কিন্তু সেবা করার সুযোগকে তোমরা নিজেদের ভাগ্য বলিয়া গণনা কর না। অপেক্ষাকৃত অল্প সেবা দিয়া অপর একজনের কেন নাম-যশ বেশী হইয়া গেল, এই ঈর্ষ্যাতেই তোমরা জ্বলিয়া পুড়িয়া মর বা ম্রিয়মাণ হও। নিজ চরিত্র, পুরুষকার, শ্রমশীলতা বা মিষ্ট-ভাষিতার গুণে অথবা সহকর্ম্মী ও জনসাধারণের মনে সম্ভ্রম সৃষ্টি করিতে সমর্থ হওয়ায় অপর একজনের হাতে কেন প্রতিষ্ঠান-পরিচালনের গুরুতর দায়িত্ব-সমূহ চলিয়া গেল, ইহা তোমাদের

হাহাকার সৃষ্টি করে। নিজে কোনও ত্রুটী করিলে, অপরে তাহার মধ্যেই গুণ অন্বেষণ করুক, এইরূপ দাবী কর, কিন্তু অপরের কার্য্যে কোনও ত্রুটী ঘটিলে তাহার জন্য লঘু পাপে গুরুদণ্ড বিধানার্থে আদা-নূন খাইয়া কোমর কাছ। চিরকাল যে প্রতিষ্ঠানের জন্য অতিশ্রম করিয়া সুখ ভুলিল, স্বাচ্ছন্দ্য অগ্রাহ্য করিল, স্বাস্থ্যে জলাঞ্জলি দিল, সে আজ গুরুতর দৈহিক পীড়া বশতঃ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে চাহিলে তাহাকে দিয়া জোর করিয়া শ্রম করাইয়া নিবার জন্য দলাদলি সুরু কর, কিন্তু কাজের চাপের মুখে নিজেরা নির্লজ্জের মত দূরে সরিয়া প্রাণ বাঁচাও। যাহারা রৌদ্রে শুকাইবে, বৃষ্টিতে ভিজিবে, আগুনে দগ্ধ-প্রায় হইবে, তাহাদের স্বাস্থ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে তোমরা যাহারা আরাম-কেদারায় বসিয়া দিস্তার পর দিস্তা কাগজে কেবল নাম সহি করিবে, তাহারাই নিজেদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যকে অধিকতর প্রয়োজনীয় জ্ঞান কর। অল্পবুদ্ধি গো-বেচারীদিগকে দাবার বোড়ে করিয়া তোমরা কূটনীতির চাল চাল এবং ভাগ্য-দোষে কিস্তিমাৎ করিতে না পারিলে নিজেদের দোষ সেই মূর্খ আহাম্মকের মস্তকে নিক্ষেপ কর। একজন কেহ তোমাদের মধ্যে লোক-দৃষ্টিতে একটু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলে সঙ্গোপনে তিন জনে মিলিয়া Balance of power (প্রভাবের সমতা) রক্ষার জন্য নানা কূট আয়োজনে লাগিয়া যাও এবং এভাবে শান্তিময় প্রতিষ্ঠানে অশান্তির বীজ বপন কর। অহংবুদ্ধির এই সকল ভ্রান্তির ফলেই এই দেশে

অধিকাংশ সৎ-প্রতিষ্ঠান অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে। কবি রজনীকান্ত অবশ্য একটী প্রিয়জনের বিয়োগেই শোকের গানটী গাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেই কয়টী পংক্তিই আমাকে তোমাদের গড়া বহু প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই বলিতে হয় যে,—

'ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে,
মরমে ম'রে গেল, সরমে ঝ'রে গেল,
প্রাণ-ভরা আশা-সমাধি-পাশে।'

প্রতিষ্ঠান স্থায়ী করিবার উপায়

"সুতরাং সত্যিকারের প্রতিষ্ঠান যদি কিছু গড়িতে চাহ, সমগ্র প্রাণ মন-দিয়া সাত্ত্বিক হও, অহমিকা-বর্জ্জিত হও, নিরভিমান হও, প্রতিদান-লাভ-বুদ্ধি বর্জ্জন কর, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি ও স্নেহশীল হও, ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ দূর কর, অসদুপায়কে অবলম্বন করিয়া সৎকার্য্য করিবার কুবুদ্ধি পরিহার কর। প্রকৃতই যদি কাজের মত কাজ কিছু করিতে চাহ, তাহা হইলে প্রতি পদক্ষেপে নিজের দোষ ও নিজের ত্রুটীর প্রতি খরদৃষ্টি হও, আত্ম-সংশোধনকে প্রধান প্রয়োজন বলিয়া জ্ঞান কর, দোষদৃষ্টি পরিহার কর, মানুষ-মাত্রকেই ভগবানের সন্তান জ্ঞানে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে শিখ, ছোট বড় সকলের প্রতি সম্ভ্রমবুদ্ধি-সম্পন্ন মমত্ববোধ-যুক্ত হও। সত্য সত্যই যদি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া জগতে আদর্শের

জয়ধ্বজা উড্ডীন করিতে চাহ, তাহা হইলে আত্মাভিমানকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়া পরহিতকে পরসুখকে ঈশ্বর-প্রীতিকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য কর। এসব করিলেই প্রতিষ্ঠান জগতে অমর হইয়া থাকিবে।"

ভালবাস

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"তোমরা যে পরস্পরকে সহিতে পারিতেছ না, তোমরা যে এক সহকর্ম্মী অন্য সহকর্ম্মীকে সরল সহজ ভাবে উদার অন্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া নিতে পারিতেছ না, তোমাদের যে একের প্রতি অপরের বাহ্য বিনয় বিদ্যমান থাকিলেও অন্তরের সহানুভূতি মোটেই নাই, ইহার প্রকৃত কারণটী কি জানো? তাহা হইতেছে এই যে, তোমাদের এক এক জনের অন্তরের ভালবাসা এক এক দিকে গিয়াছে, সকলে একটী স্থানে নিজ নিজ ভালবাসা সমর্পণ করিতে পার নাই। যাহাদের ভালবাসা এককে অর্পিত হইয়াছে, তাহারা কখনো পরস্পরকে অসহিষ্ণুতার দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না। তোমরা প্রতি জনে নিজ নিজ অন্তরকে একেবারে অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যাইয়া অনুসন্ধান কর এবং আবিষ্কার করিতে চেষ্টা কর যে, কাহার ভালবাসা কোন্ দেশের আসমানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশে নয়, পাতালে নয়, তোমাদের সকলের ভালবাসার

পরম বস্তুটাকে এই মাটির পৃথিবীর বুকের উপরেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাঁহাকে যদি ঠিক ঠিক আপনার জন বলিয়া চিনিতে পার, তাঁহাকে যদি সকলে মিলিয়া অকুণ্ঠ প্রেম অর্পণ করিতে পার, তাঁহার প্রীতি-সম্পাদনকে যদি জীবনের পরমপুরুষার্থ বলিয়া প্রতিজনে স্বীকার করিয়া নিতে পার, তবে তোমাদের আর ভয় নাই, ভয় নাই তোমাদের প্রতিষ্ঠানেরও। একজনকে সমগ্র মনঃপ্রাণ দিয়া ভালবাসিতে শিখিলে না বলিয়াই ত' এক এক জনে এক এক তালে সুর ভাঁজিয়া যাইতেছ, ফলে অত মধুর কণ্ঠগুলি তোমাদের অর্থহীন কলরবই শুধু সৃষ্টি করিতেছে, সঙ্গীত নহে। অথচ সবাই সমস্বরে মিলনানন্দের মধুর সঙ্গীতাবলি গাহিবে বলিয়াই কণ্ঠ পাইয়াছিলে। পুনরায় বলি,—ভালবাস। বারংবার বলি,—ভালবাস। অনন্তকাল ব্যাপিয়া কেবলই বলিতে থাকিব,—ভালবাস। ঐ একজনকে ভালবাসিলেই সকলের প্রতি ভালবাসা উৎসারিত হইবে, আর, ভালবাসার মতন ঐক্য-বিধায়ক মহাবস্তু ত্রিজগতে আর কিছুই নাইও।"

সংগঠন অফুরন্ত

কুমিল্লা জেলান্তর্গত বাদৈর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংগঠন এমন একটা ব্যাপার, যাহার ধারাবাহিকতা কদাচ ক্ষুণ্ণ করা উচিত নহে। কখনো তীব্র, কখনো মন্দগতি,

কিন্তু সর্ব্বদাই প্রবহমাণ,—নদীর যেমন স্রোত সর্ব্বদাই চলে কিন্তু কখনই সে স্রোত থামে না, থামা সঙ্গত নহে, থামিয়া গেলে নদী-জলের স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নাশ পায়,—সংগঠনের প্রকৃতি তাহাই হওয়া উচিত। দেশ, জাতি ও জগতের কতটুকু তোমরা আজ দেখিতে পাইতেছ? তোমাদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের কোন্ দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত আছে বল ত'? স্থান-কালের জগতে এবং ভাবের জগতে নিরন্তর আমরা প্রতিজনে যাযাবরের মত ছুটিয়া চলিতেছি। কোথাও আমাদের স্থিতি নাই কেবল পরিবর্ত্তন আর পরিবর্ত্তন চলিতেছে। আজ যে এখানে, কাল সে হাজার মাইল দূরে। কিন্তু সেই দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না রাখিয়া তোমরা যদি নিজেদের কাজ নিজেরা করিয়া যাইতে থাক, তবে ঐ ক্ষুদ্র বাঁদের গ্রামের সেবাটুকুই সুদূর গুজরাটে একদিন পৌঁছিতে পারে। উচ্চ ভাব বিদ্যুতের বেগে এক দেশ হইতে অন্য দেশে ছুটিয়া চলে। তোমরা ভাবের হও উপাসক। নিজেদের অন্তরের শুচিতা এবং চরিত্রের সংযম দিয়া সংগঠন-কার্য্যকে কর দৃঢ় এবং অব্যর্থ। আর সকলের অন্তরের সকল ভালবাসা একটী স্থানে অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়া তোমরা পরস্পরের প্রতি হও একান্তই প্রীতিবদ্ধ। সম্প্রীতি না থাকিলে ঐক্য শুভফলপ্রসূ হয় না। সুগভীর সম্প্রীতির মধ্য দিয়া সহযোগ করিলে অল্প কয়েকজন লোকেই বহুজনসাধ্য বিরাট কার্য্য সমাপন করিতে পারে। যাহাদের মধ্যে প্রীতির অভাব, মিলের অভাব,

একলক্ষ্যতার অভাব, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের ও শ্রদ্ধার অভাব, তাহারা হাজার জনে মিলিয়া কাজ করিলেই বা কত কাজ হইবে? বরং যতটুকু কাজ হইবে, তার দশগুণ অকাজ বাড়িবে, জঞ্জাল জমিবে, বিঘ্ন-বাধার সৃষ্টি হইবে। আজ যাহা করিতেছ, তাহা আজই ফুরাইয়া যাইবে না, ওখানে যাহা করিতেছ, তাহা শুধু ওখানেই আবদ্ধ থাকিবে না। আজিকার কাজ অনন্ত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া ফল দিতে পারে, একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের কাজ সমগ্র ভূমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। অন্ত-অবধি-হীন অফুরন্ত কাল আর সীমা-পরিধিবর্জ্জিত অনন্ত জগৎ সবটাই যে তোমার কর্ম্মের ক্ষেত্র, এই কথা মনে রাখিয়া পবনের হিল্লোলে হিল্লোলে মহাভাবের বীজ বপন করিয়া চল।"

সমগ্র বিশ্বকে লইয়া তোমার কাজ

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"মহদ্‌ভাব বস্তুটা অতীব ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম কিন্তু নিরন্তর ও ধারাবাহিক অনুশীলনের ফলে তাহা অতীব বৃহৎ এবং সর্ব্বজন-নয়ন গ্রাহ্য বিপুল অবয়ব লাভ করে। এই অনুশীলন প্রথম সুরু হয় নিজের মনের ভিতরে, তারপরে বিস্তার পায়, বিকাশ পায়, নানা বৈচিত্র্যে ও নানা বৈদগ্ধ্যে মণ্ডিত হয়, শাখা-পল্লবে ফল-ফুলে নয়ন-মন-বিমোহন সুশোভন মূর্ত্তি

পরিগ্রহণ করে হাজার হাজার মনে এবং হাজার হাজার কর্ম্মঠ বাহুযুগের অবিশ্রান্ত আত্মনিয়োগের মধ্য দিয়া। সৎচিন্তার এই মহতী শক্তিতে বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিয়া যাও। কাজ করিয়া যাও, ক্ষণকালের জন্য নহে,—অফুরন্ত ভবিষ্যতের জন্য। কাজ করিয়া যাও, নির্দ্দিষ্ট একটী ক্ষুদ্র পল্লীর জন্য নহে,—কোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্ত কোটি জীবকুলের জন্য। তোমরা যদি প্রত্যেকে দেশ ও সমাজের প্রয়োজনকে তোমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উর্দ্ধদেশে স্থাপন করিতে পার, তাহা হইলে অল্প উদ্যমে তোমরা যে সিদ্ধি অর্জ্জন করিতে পারিবে, নিদারুণ পৌরুষ প্রয়োগ করিয়াও অন্যেরা তাহা করিতে পারিবে না। তোমরা যদি তোমাদের দৈশিক ও সামাজিক প্রয়োজনকে বিশ্বের সমস্ত মানবের যাবতীয় প্রয়োজনের দাবী-পূরণে সার্থক করিতে পার, তবে এমন কাজের সার্থকতার কোনও সীমা থাকিবে না। সমগ্র বিশ্বকে লইয়া তোমাদের সাধনা, গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্রায়তন মনকে বিশ্বতোমুখী বিশ্বতোব্যাপী বিশ্বৈকাত্মক কর। প্রতিটি বাক্য শুধু এক আকাঙ্ক্ষা লইয়াই উচ্চারণ কর যে, ইহা যেন বিশ্ববাসী সকলের কাজে আসে। প্রতিটি কর্ম্ম এই অভিপ্রায় লইয়া কর যে, ইহার শুভফল যেন বিশ্ববাসী প্রতিজনের পক্ষে সহজপ্রাপ্য হয়। প্রতিটি চিন্তায় কেবল ঝঙ্কার তোল,—"ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি—আমি জগতের কল্যাণকারী হইতেছি।" তুমি নিজে একা জগতের কল্যাণকারী হইলেই চলিবে না, তোমার প্রভাব

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যত জনের উপরে পড়িবার সম্ভাবনা বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে আছে, তাহাদের প্রতি জনকে জগৎকল্যাণকর্ম্মে ব্রতী করিতে হইবে। হউক না সে যে-কোনও সম্প্রদায়ের, তাহা নিয়া তুমি মাথা ঘামাইও না। হউক্ না সে যে-কোনও ধর্ম্মাবলম্বী, তাহা যেন তোমার মনে দ্বিধার সৃষ্টি না করে। হউক্ না সে ভিন্নভাষাভাষী বা ভিন্নদেশবাসী, তাকেও যেন জগতের কল্যাণে কর্ম্মক্ষেত্রে নামাইয়া দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা এবং অভীপ্সা তোমার থাকিবে। তবে তুমি আমার সন্তান।"

অদ্য বর্দ্ধমানের পঞ্চম বক্তৃতা। মাঠে তিলধারণের স্থান নাই। সম্মুখস্থ সদর রাস্তা জনারণ্যে অবরুদ্ধ। গাছের ডালে ডালে পর্য্যন্ত মানুষ উঠিয়া বসিয়া আছে। বক্তৃতাকালে হর্ষজ্ঞাপনার্থে করতালি-ধ্বনি করিতে গিয়া একটী তরুণ কিশোর গাছের ডাল হইতে পড়িয়া গেল। নীচে অগণিত মানুষ থাকায় ছেলেটী গুরুতর কোনও আঘাত পাইল না সত্য কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার বক্তৃতা সংক্ষেপ করিলেন। অর্থাৎ মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় ভাষণ দিলেন।

স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্বপ্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বদেশ-প্রীতি বিশ্বপ্রীতিরই বনিয়াদ আর মাতৃপিতৃভ্রাতৃপ্রীতি স্বদেশ-প্রীতিরই বনিয়াদ। বিশ্বকে ভালবাসতে শেখানর মধ্যেই শিক্ষাদানের সার্থকতা

আর বিশ্বকে ভালবাসতে শিখবার জন্যই স্বদেশকে ভালবাসতে হবে। স্বদেশের ধূলিকে স্বর্ণরেণু ব'লে যতদিন না মনে কত্তে পাচ্ছি, ততদিন বিশ্বের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা আমার সম্প্রসারিত হবে না। স্বদেশের একটী মাত্র মানুষের মধ্যে বিশ্বের সমস্ত মানবজাতিকে দেখতে পাওয়ার নামই খাঁটি স্বদেশপ্রেম। বিশ্বের সমস্ত মানবজাতির ভিতরে স্বদেশকে আর স্বদেশবাসীকে দেখ্তে পাওয়ার নামই হচ্ছে খাঁটি বিশ্বপ্রেম। সে স্বদেশপ্রেমিক নয়, যে প্রতিবেশী দেশকে বিদ্বেষ করে। সে বিশ্বপ্রেমিক নয়, যে বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেম দেখাবার জন্য নিজের দেশকে ঘৃণা করে।

জননী, জন্মভূমি ও বিশ্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বদেশকে ভালবাসতে হ'লে স্বদেশের অতীতকে শ্রদ্ধা কত্তে হয়, স্বদেশের ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস কত্তে হয়। স্বদেশের মঙ্গলসাধনের জন্য প্রধান উপায়-রূপে কি কি অবলম্বন কত্তে হবে, নির্দ্ধারণের জন্য স্বদেশেরই প্রামাণ্য ইতিহাস ভক্তি-সহকারে ধৈর্য্য-সহকারে বারংবার অধ্যয়ন কত্তে হয়। ইতিহাস যে সকল ঘটনাপুঞ্জ রেখে গেছে, তা' পুনঃপুনঃ আলোচনা ক'রে তার প্রকৃত শিক্ষাটী খুঁজে বের কত্তে হয়। দেশটার প্রতি যার মমত্ববুদ্ধি নেই, ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা নেই, সে যে ভাবে ঘটনাবলিকে ব্যাখ্যা ক'রে গেছে, সেই ব্যাখ্যা প্রকৃত

ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা কিনা, তা' বিচার কর্ব্বার যোগ্যতা নিয়ে নূতন ক'রে গবেষণা কত্তে হয়। সেই গবেষণার আলোকে নূতন ক'রে দেশের অতীত সত্তাকে চিনতে হয়, জানতে হয়, নূতন ক'রে ভবিষ্যতের জন্য দিগ্‌দর্শন নির্ম্মাণ কত্তে হয়। ভাবালুতার নাম স্বদেশপ্রেম নয়, বাস্তববুদ্ধির সঙ্গে ভাবুকতাকে যুক্ত ক'রে নিয়ে স্বদেশকে ভালবাসতে হয়। যে নিজ জননীকে ভালবাসতে জানে, সে-ই দেশ-জননীকে ভালবাসতে পার্ব্বে। যে দেশ-জননীকে ভালবাসতে শিখেছে, মাত্র সে-ই বিশ্ব-জননীকে চিনতে পারবে এবং ভালবাসতে সমর্থ হবে। জননী, স্বদেশ ও বিশ্ব যেন একটা ফটোগ্রাফেরই তিন মাপের এনলার্জ্জমেণ্ট। প্রকৃত প্রস্তাবে জননী, জন্মভূমি ও বিশ্ব এক জিনিষেরই তিনটা নাম। এই বোধ অন্তরে সুজাগ্রত রেখে ভারত বাসীকে স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে। চতুর্দ্দিকের বিভীষিকা দেখে ভয় পাবার কোনো প্রয়োজন নেই, ভয়কে জয় ক'রে আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে।

ভয়কে জয় করিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভয়কে জয় করার একটী উপায় পরমেশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস, অপর উপায় ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা। ভয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও যিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, সত্যই তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ। ভয়কে জয় করা যায় আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য দ্বারা। ভয়কে জয় করা যায়

অভয়-পুরুষদের জীবনালেখ্য নিজের নয়ন-সমক্ষে সর্ব্বদা তুলে ধরার দ্বারা। ভয়কে জয় করা যায়, সুদৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা। সঙ্কল্পকে দৃঢ় করার জন্য চাই ব্রহ্মচর্য্য। এই জন্যই ব্রহ্মচর্য্যকে তপোত্তম বলা হয়। আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে আর প্রত্যন্তে, প্রতিটি কুটীরে আর হর্ম্মে, প্রতিটি পল্লীতে আর নগরে, প্রতিটি অরণ্যে আর প্রান্তরে, লোকপ্রচুর জনপদে আর জনবিরল মালভূমিতে ব্রহ্মচর্য্যের বাণী দাবানলের মত ছড়িয়ে দিতে হবে। কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর থেকে সুরু ক'রে, কন্দর্পকান্তি সবল সুস্থ ব্যক্তিটি পর্য্যন্ত প্রত্যেকের জীবন-চর্য্যায় ব্রহ্মচর্য্যকে অবধারিত রূপে প্রতিষ্ঠা ক'রে দিতে হবে। এতে চপলতাও দূর হবে, ভয়ও দূরে পালাবে।

ব্রহ্মচর্য্যই শক্তির উৎস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যের কথা শুনলেই এক শ্রেণীর লোক একেবারে উন্নাসিক হ'য়ে পড়েন। এটা যে এঁদের অসম্যগ্ দর্শনের ফল, তা' এঁরা বুঝতে পারেন না। আর এক শ্রেণীর লোক ত' ব্রহ্মচর্য্যের নাম শুনলে "অসম্ভব" "অসম্ভব" ব'লে চীৎকার সুরু ক'রে দেন। এটাও অভিজ্ঞতার অভাব থেকেই সঞ্জাত। মাত্র একটা দিন ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্লে ঐ এক দিনেই যে দেহমনে এক বিশেষ আনন্দ আস্বাদন

করা যায়, এটা এঁদের অনুভবের জগতে নেই। তাই এত বিদ্রূপ, এত সমালোচনা। যার যার স্বাধীন মত প্রকাশ করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। সুতরাং এঁদের কথায় কর্ণপাত ক'রো না। তুমি বিশ্বাস কর যে, তোমার ব্রহ্মচর্য্য-সাধনের ফল তুমি পাবেই পাবে। যে যতটা ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ, সে ততটা আত্মবিশ্বাসী। যার ব্রহ্মচর্য্য যতটা অটুট, তার পক্ষে দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করা তত সহজ। মদিরা আর মেয়ে মানুষ দিয়ে মুগ্ধ ও মাতাল ক'রে যাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়, তারা শুধু খুনই কত্তে পারে, মাথা ঠিক রাখতে পারে না। মদের নেশায় নয়, মেয়ে মানুষের নেশায় নয়, একমাত্র সংযমের শক্তিতে নির্ভর ক'রে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যায়, তারা অসাধ্য সাধন করে। যে-কোনও বিরাট আন্দোলনের নেতারা নিজেরা যখন নৈতিক দুর্গতির ক্রীতদাস হন, তখন তাঁদের পরিচালিত কর্ম্মিদলের অবস্থা বড়ই সঙ্গীণ। সংযম-প্রবুদ্ধ এক মহাজাতি এই ভারতের বুকে নিশ্চয়ই একদা মাথা তুলে দাঁড়াবেন, এই বিশ্বাস অন্তরে রেখে আমাদের কাজ করা প্রয়োজন।

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে যে কাজটুকু কচ্ছি, তা' যে ভবিষ্যৎ কালের মানুষদের জন্য

কচ্ছি, তা' যে শুধু আজকালকার সাময়িক সমস্যার সমাধান মাত্র নয়, এই কথাটী আমাদের ভাল ক'রে মনে রাখ্‌তে হবে। দল, সঙ্ঘ, সম্প্রদায় কত কত গড়া হচ্ছে, কিন্তু আমাদের কি এই কথাটা মনে থাক্‌ছে যে, আমরা কাজ কচ্ছি আজকের জন্য নয়, কালকের জন্য নয়, বরঞ্চ অনেক দূরবর্ত্তী এক ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে? সাগর-তরঙ্গ-রাজির মতন কত কত দলের কত কত সঙ্ঘের, কত কত সম্প্রদায়ের উত্থান হবে, বিলয় হবে, কিন্তু ভাবী কাল আমাদেরই সেবার প্রতীক্ষায় বসে থাক্‌বে। এই কথাটী আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। পর্ব্বত-শৃঙ্গে উঠে যেমন জনপদের উঁচু-নীচু সব মাঠগুলি সমতল দেখা যায়, ভাবী কালের উপরে দাঁড়িয়ে যদি আমরা আমাদের বর্ত্তমান কাজগুলিকে দেখ্‌তে চেষ্টা করি, তা' হ'লে দলের সঙ্গে দলের, সঙ্ঘের সঙ্গে সঙ্ঘের, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের বিরোধের হেতু একটী নিমেষে দূর হ'য়ে যাবে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা বর্ত্তমানকে সেবা দিব এবং সেই সেবা হবে বিশ্বতোমুখী কুশলের প্রার্থী স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ সাধকের।

বক্তৃতা শেষ হইলেও জনতার ভীড় আর কমিতেছে না দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি তিনটী তুড়ি দিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে এই মৌন ভঙ্গ হইবে।

বৰ্দ্ধমান-হরিসভা

১৫ই আষাঢ়, রবিবার, ১৩৪২

(৩০শে জুন, ১৯৩৫ ইং)

বাঁচার মতন বাঁচো

একটী ভক্তিমান্ যুবক প্রণাম করিল এবং আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিল। বলিল, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বেঁচে থাকি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—মানে, ম'রে যেন না যাও। কেমন এই ত'? কিন্তু মরতে হবেই একদিন আর মরতে হবে সবাইকে। একজনও অনন্তকাল জীবিত থাক্‌বেন না, দারুণ বার্দ্ধক্য এলে বরং অনেকে মৃত্যুকে আবাহন ক'রে বল্‌বেন, এস মৃত্যু, এস শান্তি। সুতরাং শুধু বাঁচবার জন্য কোনো কামনা বা প্রার্থনা কদাপি ক'রো না। বেঁচে থাক্‌তে হবে বাঁচার মত ক'রে, মরার মত বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত সময় যাতে সত্যিকারের মহৎ কাজে লাগানো যায়, তেমন ভাবে আমাদের প্রতিজনকে বেঁচে থাকবার জন্য চেষ্টা কর্ত্তে হবে। আশীর্ব্বাদ যখন চেয়েছে, তখন ওতে আমার কোনো কার্পণ্য নেই। আমি আশীর্ব্বাদ করি যেন সুদীর্ঘকাল বাঁচো এবং বাঁচার মতন বাঁচো। যে বাঁচায়, একজনের বেঁচে থাকায় দশ জনের জীবনের পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়, দশ জনের জীবনের গৌরব বাড়ে, তেমন বাঁচা বাঁচো।

অসঙ্গত বিবাহ

একটী যুবক সঙ্গোপনে তাহার জীবনের কিছু ঘটনা নিবেদন করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না বাবা, কালীঘাটে গিয়ে একটী মেয়ের কপালে সিন্দুর লাগিয়ে দিলেই তাতে বিবাহ হয় না। অথবা বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে "আমরা দুজনে স্বামী-স্ত্রী হ'লাম" ব'লে প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন ক'রে মালা-বদল কর্লেও বিবাহ হয় না। বিবাহে এর চেয়ে বেশী জিনিষের প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ কাজটী হবে সম্মানিত নিমন্ত্রিতদের সকলের সমক্ষে, যাঁদের জানানো হয়েছে যে, অমুক দিন অমুক সময়ে অমুকের সাথে তমুকের বিবাহ হবে। দ্বিতীয়ত, কাজটী হওয়া সঙ্গত পাত্র-পক্ষের এবং পাত্রী-পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতির মধ্য দিয়ে। তাঁদের আশীর্ব্বাদ থেকে জীবনের এমন একটা বিরাট ঘটনার দিনে বঞ্চিত থাকার মতন দোষ বা দুর্ভাগ্য আর কিছু হ'তে পারে না।

ভালবেসে বিবাহের ঝুঁকি

যুবকটী বলিল,—কিন্তু বাবামণি, আমি যে মেয়েটীকে ভয়ঙ্কর ভালবেসে ফেলেছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মেয়েটিকে তুমি ভয়ঙ্কর

ভালবেসে ফেলেছ ব'লেই ত' অতি ভয়ঙ্কর পরিণাম থেকে বাঁচবার জন্য তোমার অত্যধিক সতর্কতার দরকার। তরুণদের ভালবাসা অধিকাংশ সময়েই সাময়িক চোখের নেশা মাত্র। দুচার বৎসর আত্ম-পরীক্ষা না ক'রে, দুচার বৎসর ভাবনা-চিন্তা না ক'রে হঠাৎ বিয়ে করা এক মারাত্মক ঝুঁকি। এভাবে যত জায়গায় বিয়ে হয়েছে, তার ফল অধিকাংশ স্থলে দেখা গিয়েছে পারস্পরিক অবিশ্বাসে পরিণত হ'তে। বিয়ের আগে যার সম্পর্কে ভাব্‌ছ যে, ওকে ছাড়া চলবে না, দুদিন পরে হঠাৎ তোমার বা তার মনে প্রশ্ন আস্‌বে, আমার সঙ্গে বিয়ের আগে মানুষটা যে সব ব্যবহার কর্ল, তা' কি পৃথিবীতে আর কারো সঙ্গে কখনো করে নি বা কত্তে পারে না? এই প্রশ্নটা মনের ভিতরে ঘুণ ধরিয়ে দেয়, তারপরে একেবারে মজ্জায় ঢুকে সন্দেহ-বায়ু মানুষ দুটীর জীবনের সম্পর্কটুকু আস্তে আস্তে কুটুর কুটুর ক'রে কেটে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে দেয়। হঠাৎ প্রেমে বিয়ের বাজনা বাজতে দিও না। ধৈর্য্য ধর, পরীক্ষা কর নিজেকে, পরীক্ষা কর অপর পক্ষকে, দীর্ঘ পরীক্ষায় যখন তোমাদের প্রেম উত্‌রে যাবে, তখন বিশ্বাস ক'রো যে, ভালবেসে বিয়ে কর্লে কুফল কিছু হবে না। এমন ছেলে হাজার গণ্ডা মিল্‌বে, যারা একই সঙ্গে তিনটে মেয়ের সঙ্গে প্রেম কচ্ছে, এমন মেয়েও অনেক পাবে, যারা এক সঙ্গে তিনটে ছেলেকে নিয়ে খেল্‌ছে।

ভালবাসা ছাড়া বিবাহের ফল

যুবকটী বলিল,—ভালবাসা ছাড়া যে বিবাহ হয়, তার ফল কি ভাল হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মা-বাপ, স্বামী বিবেকানন্দের মা বাপ, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের মা বাপ, বা আমার মা-বাপ পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করেন নি। পিতামাতা যেমন পাত্র বা যেমন পাত্রী জুটিয়ে দিয়েছেন, তেমন পাত্রে বা পাত্রীতে বিবাহিত হয়েছেন। ইতিহাস কখনো বল্‌বে না যে, তাঁদের বিবাহের ফল খারাপ হয়েছে। বিবাহ জিনিষটা একটা বংশোৎকর্ষ-দায়ক ব্যাপার। বংশের প্রধানেরা এই ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব কর্ব্বেন, মনোনয়ন বা নির্ব্বাচনের ভার তাঁদের উপরে থাক্‌বে, এটা কোনো অন্যায় বা অসঙ্গত কথা নয়। অপরিণত-বুদ্ধি তরুণ-বংশধর কি ক'রে অনুমান কর্ব্বে যে, কোন্ বংশে বিবাহ হ'লে তার ফলে বংশের ক্রমিক উৎকর্ষ ঘটবে? তরুণ-তরুণীরা অনেক সময়েই চখের নেশায় প'ড়ে ভালবাসে, যে ভালবাসা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যখন মোহভঙ্গ ঘটে, তখন বিবাহিত জীবনটাকে একটা শুষ্ক মরুভূমি ব'লে তারা মনে কত্তে বাধ্য হয়। কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য আছে আর উভয়ের মিলিত কর্ত্তব্য হচ্ছে ভাবী বংশধারার প্রতি, এই কথা মনে রেখে সম্পূর্ণ অপরিচিত

পাত্র-পাত্রীরা যখন পিতামাতার ইচ্ছায় বিবাহ করে, তখন কিছুকাল যাবার পরে একে অন্যের প্রতি আস্তে আস্তে অনুরাগ অনুভব কত্তে থাকে এবং কোনও কারণে যদি দুজনের মনের মিল নাও ঘটে, তথাপি, "পিতামাতার আদেশ-পালন করেছি" ব'লে মনে একটা সন্তোষ বা আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন কত্তে পারে। নিজে ভালবেসে বিয়ে করার পরে যদি কখনো সেই ভালবাসা দীর্ঘস্থায়ী না হয়, তাহ'লে একজন অপর জনকে প্রতারক, প্রবঞ্চক, ভাণকারী লম্পট ব'লে মনে মনে অভিযোগ ক'রে নিরন্তর দুঃখ সঞ্চয় করে। বিবাহের সঙ্গে ভালবাসা যুক্ত হ'লে হয় সোণায় সোহাগা, কিন্তু পিতৃমাতৃ-আদেশ পালনার্থ বিবাহ করাও সোণার মতনই দামী জিনিষ। বাপ-মা সাধারণতঃ জেনে শুনে নিজের ছেলে বা মেয়েকে খারাপ মেয়ে বা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন না,—অবশ্য যদি তাঁদের নিতান্ত মতিভ্রম না ঘটে।

বিবাহে পিতৃমাতৃ-আদেশ কখন অপালনীয়

যুবক প্রশ্ন করিল,—বিবাহের ব্যাপারে কি বিবাহকারীর কোনও কথাই বল্‌বার নেই? প্রয়োজন স্থলে পিতামাতার আদেশ কি এসব স্থলে লঙ্ঘন করা যায় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যার তার সঙ্গে তোমার বিয়ে

হবে আর পিতামাতাকে তাতেই সম্মতি দিতে হবে, এতটা আশা করা অন্যায়। কিন্তু তাঁরা যদি এমন মেয়ের সঙ্গে তাঁদের ছেলের বা এমন ছেলের সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বিয়ে দেওয়া স্থির করেন, বয়সের দিক দিয়ে যে একেবারেই বেখাপ্পা বেমানান, যার শরীরে যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, উপদংশ, বাতব্যাধি, জীবাণুঘটিত ইন্দ্রিয়-পীড়া, উন্মাদ, পুরুষোচিত অক্ষমতা বা স্ত্রীজনোচিত যোগ্যতার অভাব আছে, তাহ'লে পিতামাতাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, এখানে বিয়ে হবে না, হ'তে পারে না। এসকল ক্ষেত্রে হিতৈষী প্রতিবেশীদের উচিত, চারদিক থেকে বাধা দিয়ে বিবাহটাকে না হ'তে দেওয়া। অনেক অর্থ-পিশাচ পিতামাতা নিজ পুত্র বা কন্যাকে টাকার লোভে এসব ক্ষেত্রে অপাত্রে বিবাহ দেয়। তাদের কাজের প্রতিবাদ করা প্রত্যেক সুস্থচিত্ত মানুষের পক্ষে বৈধ। অগম্যাগমন কত্তে বল্লে যেমন পিতা, মাতা বা গুরুর আদেশও অপালনীয় হয়, এসব ক্ষেত্রেও তেমন জানবে। কিন্তু যেখানে পাত্র-পাত্রীর অযোগ্যতা বা বিপজ্জনকতা কোনো উপলক্ষ্য নয়, সেখানে পিতামাতার আদেশ পালনে দ্বিধা করা সঙ্গত কাজ নয়।

সুধন্য বিবাহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভালবাসা এক অপার্থিব বস্তু। এ জিনিষের উৎপত্তি যার মনে একবার হয়েছে, সে আর

জীবনে কখনো ভালবাসার বস্তুকে ভুলতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা স্বতোবিস্তারশীল। একজনকে ভালবাস্‌লে সেই ভালবাসা আস্তে আস্তে দশ দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন দেখা যায় যে, জগতে তোমার বা আমার প্রিয় মাত্র একজন বা দুইজনই নয়, শত শত, সহস্র সহস্র। সেই ভালবাসা এলে দেহে আর ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা থাকে না। সেই ভালবাসা এলে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এসে হৃদয়-মন্দিরে তাঁর পদযুগল স্থাপন করেন। তখন আর লালসার তৃষ্ণা মায়া-মরীচিকা দেখিয়ে জীবকে ভ্রান্ত-পথে পরিচালিত করে না। কে একটী সুন্দরী মেয়ে কবে এসে একটী মুচ্‌কি হাসি দিয়ে কথা কয়েছিল, আর তুমি তার জন্য পাগল হ'লে, শক্ত মানুষের জীবনে তেমন ভালবাসার স্থান শুধু কাব্যরসমিশ্রিত সঙ্গীত-রচনায় আর সাহিত্য-চর্চ্চায়,—অন্যত্র তার স্থান নেই। ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি নিষ্ঠুর দানবের নির্ম্মম লুণ্ঠন বৃত্তির উৎকট আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে তোমরা ঠুনকো ভালবাসার ক্ষণ-ভঙ্গুর মাটির প্রদীপ জ্বালবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ো না। সমস্ত পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে দানবীয়তার পূর্ণ অবসান ঘটাবার জন্য পুরুষের চাই বীর্য্যবতী শক্তিময়ী পত্নী আর নারীর চাই পৌরুষ-প্রবুদ্ধ অপরাজেয়-বিক্রম স্বামী। এই দিকে লক্ষ্য রেখে পথ চল বাবা, তোমার বিবাহ বিশ্ববাসী সকলের ত্রাসহরণ

দুঃখতাড়ন ভয়বিদূরণ মহাপুরুষের আবির্ভাবের সহায়ক হবে। এইরূপ বিবাহই সুধন্য বিবাহ।

বিবাহ ও আদর্শের উচ্চতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিয়েটা হ'য়ে যাবার আগে ঠিক ঠিক কেউ জানেই না যে, যার সঙ্গে বিবাহ, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে মিলের মধ্য দিয়ে, তাকে কখন পেলে সুরু হবে গরমিলের পালা। এই জন্য জীবন-সাথীটিকে উচ্চভাবের অনুকূল ক'রে নেবার জন্য উভয়েরই আদর্শের দিকে তাকিয়ে পথ চলতে হয়। উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য রেখে যারা চলে, একই জীবন-লক্ষ্যকে যারা জীবনের ধ্রুবতারা করে, তাদের মধ্যে বাস্তব-ব্যবধান যতই থাকুক, অজ্ঞাতসারে তা' কমতে থাকে এবং তা' কম্‌তে কম্‌তে একদা দেখতে পাওয়া যাবে যে, তারা একেবারে বুকে বুকে মিলে গেছে, প্রাণে প্রাণে মিশে গেছে। এই সাধনা বিয়ের পরেই আরম্ভ কত্তে হয়।

অদ্যই বর্দ্ধমান-ত্যাগের কথা ছিল কিন্তু বিগত দিনের বক্তৃতার পরে সভাস্থলেই জনসাধারণের পক্ষ হইতে আরও বক্তৃতার অনুরোধ পুনঃ পুনঃ আসিতে থাকিলে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি আরও দুইটি দিন থাকিবেন এবং প্রত্যহ ভাষণ দিবেন। অদ্য বর্দ্ধমান হরিসভার প্রাঙ্গণে ষষ্ঠ ভাষণ হইল।

জীবনের সার্থকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনের চাই সার্থকতা। কিন্তু কেমন ক'রে হবে তার সার্থকতা? কেউ বল্লেন, দেশকে সেবা কর,—জীবনের সার্থকতা লাভ হবে এই পথে। কেউ বল্লেন,—দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ শোধ কর,—জীবনের সার্থকতা এই পথে। কেউ বল্লেন, সমগ্র মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের পানে তাকাও, সেই পথে চল, যে পথে বিশ্ব মানবের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি,—জীবনের সার্থকতা সেই পথে। কেউ বল্লেন,—ঈশ্বরাশ্রিত জীবনই সত্যিকারের জীবন, ঈশ্বরাশ্রিত হও, নিজেকে পরমেশ্বরের হস্তধৃত-যন্ত্র মাত্রে পরিণত কর, তাঁকে যন্ত্রী ক'রে নিজে যন্ত্র হ'য়ে জীবনের ছোটবড় সব-কিছু কাজ অনাসক্ত হ'য়ে ক'রে যাও,—জীবনের সার্থকতা এই পথে।

বিশ্বতোব্যাপ্ত মহাযজ্ঞ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপর্য্যুক্ত উপদেশ-প্রবক্তাদের প্রত্যেকেই কার্য্যকালজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি, এতে সন্দেহ নেই। এঁদের যে-কাহারো উপদেশ নিষ্ঠা সহকারে পালন কর্ম্লে অবশ্যই জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হবে। আরো একটা মজার কথা এই যে, এঁদের যে কোনো জনের উপদেশ যদি

পালন কত্তে পার, তাহ'লে লক্ষ্য করা যাবে যে, অন্যান্যদের উপদেশেরও কতকটা মর্ম্মার্থ তুমি অজ্ঞাতসারেই পালন করেছ। দেশকে অকপট সেবা দিতে গেলেই দেখ্‌তে পাবে যে, তোমার সেই সেবা পৌঁছে গেছে সমস্ত মনুষ্যজাতির সেবায়। মানবজাতিকে সেবা দিতে গেলেই দেখ্‌তে পাবে যে, তোমার সেই সেবা পৌঁছে গেছে পরমেশ্বরে। পরমেশ্বরকে সেবা দিতে গিয়ে দেখ্‌তে পাবে যে, তোমার সেই সেবা অন্য সর্ব্বপ্রকার শুভসাধনের করেছে সূত্রপাত। একটী কেন্দ্রে অর্পিত সেবা যখন শুদ্ধতার পথে চলে, নিখাদ নির্ভেজাল ভাবে চলে, তখন অন্য শত কোটি সেবার সঙ্গে আপনা আপনি সমতালে চলে। মানুষের কল্পনায় যত প্রকারের উন্নত চিন্তা আছে, সব গুলির মধ্যে একটা ছন্দোময় আত্মীয়তা র'য়ে গেছে। এ যেন এক সুমহৎ ঐক্যতান, বেহালাটা যখন বাজতে সুরু করে, তখন ঠিক যতি বুঝে বুঝে বাঁশীটাও ধ্বনি ক'রে ওঠে, এস্রাজটা যখন তান ছড়িয়ে চলছে, তখন সেতারটাও মাঝে মাঝে এমন একটা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, যার দ্বারা প্রমাণিত হ'য়ে যায় যে, একটা ছাড়া অন্যটা পূর্ণ নয়, প্রত্যেকটার সাথী হ'য়ে প্রত্যেকটা বাজতে বাধ্য। দেশসেবা, জীবসেবা, বিশ্বসেবা, ভগবৎসেবা যেন এক সুবিশাল ঐক্যতানবাদনা, যার মাঝখানে প্রত্যেকটার আছে শুচিস্মিত সুন্দর একটী মধু-ঝঙ্কারের আবেদন ও অধিকার। সুতরাং

বিশ্ববাসী যে যেখানে যে-ভাবে নিজের জীবনকে পরিপূর্ণ সার্থকতা দেবার জন্য আস্‌ছে এগিয়ে, তারা প্রত্যেকে আমাদের প্রতিজনের জীবনকে সার্থক করার সাধনায় প্রকৃত প্রস্তাবে তন্ত্রধার বা মন্ত্রাধার। আমার জীবন-যজ্ঞ, তোমার জীবন-যজ্ঞ, সবই বিশ্বতোব্যাপ্ত এক অসাধারণ মহাযজ্ঞের অংশ মাত্র। আমরা প্রতিজনেই নিজ নিজ জীবন দিয়ে বিশ্বপিতার পুণ্য অভিপ্রায়কে পূর্ণ ক'রে যাচ্ছি।

অদ্বিতীয় জ্ঞানামৃত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা সম্পাদনে সন্ন্যাস-জীবন অধিকতর সহায়ক, না গার্হস্থ্য-জীবনে এর সফলতা লাভের সম্ভাবনা বেশী, এ নিয়ে তর্ক আছে। একদল লোক সন্ন্যাসকে পছন্দ করেন, গার্হস্থ্যকে গর্হণ করেন। আর একদল লোক গার্হস্থ্যকে প্রশংসা করেন, সন্ন্যাসকে সমাজের জঞ্জাল বা দুর্ব্বহ বোঝা ব'লে জ্ঞান করেন। জীবনের সার্থকতার পথকে আবিষ্কার করার জন্য কত জন সাজানো সংসার পরিহার ক'রে সন্ন্যাসের আশ্রয়ে চলে গেছেন, কত জন সন্ন্যাসকে ত্যাগ ক'রে গার্হস্থ্যের দিকে ফিরে এসেছেন, কত জন রোরুদ্যমানা সাধ্বী পত্নীকে অসহায় অবস্থায় গৃহে ফেলে রেখে অজ্ঞাতপূর্ব্ব কঠোরতার পথ-চারণায় বেরিয়ে গেছেন জীবনের মত, কত জন সুপ্রতিষ্ঠিত

সন্ন্যাসকে বর্জ্জন ক'রে সাধারণ লোকের মত প্রবেশ করেছেন গৃহস্থাশ্রমে,—এসব দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কেউ বা সমস্ত জীবনে যোষিৎ-প্রসঙ্গই করেন নাই, কেউ বিবাহিতা পত্নীকে ছেড়ে চলে গিয়ে আর কোনো নারীর মুখদর্শনেও আগ্রহ অনুভব করেন নাই, কেউ বা বিবাহিতা পত্নীকে উপেক্ষায় ফেলে রেখে নিঃসম্পর্কিতা নারীর আশ্রয়ের মধ্যে দিব্য জীবনে প্রবেশের চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছেন, হয়ত এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব হবে না। কিন্তু আরম্ভটা কার কোথায় এবং কেমন ক'রে, সেটা নিয়ে ভাব্‌বার কিছু নেই, প্রণিধানযোগ্য হচ্ছে সেই শুভফলটুকু, যা' তাঁরা নিজ নিজ জীবনের পরম মুহূর্ত্তে শেষ পর্য্যন্ত লাভ কত্তে সমর্থ হয়েছিলেন। এই পরম লভ্যকে প্রতিজনেই নাম দিয়েছেন, জরামরণ-বিনাশকারী অমৃত ব'লে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য অমৃত। কে কি ভাবে তাকে আহরণ কর্লেন, তাতে বিচিত্রতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু যা' পেলেন, তা' এক, অদ্বিতীয়, পরম ও চরম জ্ঞানামৃত, এতে সন্দেহ কি? মত বা পথের পার্থক্য খুব বড় কথা নয়। কিন্তু প্রাপ্তির মধ্যে যদি থাকে একত্ব, তবেই ত' সকল ল্যাঠা চুকে গেল।

সহজ সন্ন্যাসী ও বিমুক্ত গৃহী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই জগতে কাউকে কাউকে আজন্ম সন্ন্যাসী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পদ্মপত্রের গায়ে যেমন

জল লেগে থাক্‌তে পারে না, পিছলে পড়ে যায়, তাঁদের গায়ে সংসার লেগে থাকতে পারে না, সংসার তাঁদের যতই আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চায়, ততই তাঁরা যেন সংসারের কবল থেকে আপনা-আপনি মুক্ত হ'য়ে যান। এঁদের বলা চলে সহজ সন্ন্যাসী বা স্বাভাবিক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস যাঁদের পক্ষে জন্মজাত সংস্কারের মতই স্বাভাবিক, তাঁদের কেউ জোর-জবরদস্তি ক'রেও সংসারী কত্তে পারে না। আবার এমন মানুষও দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যাঁরা সংসারের গরল পান ক'রেও নীলকণ্ঠ মহাদেবের মত সর্ব্ববিষ-বিশুদ্ধ মুক্ত মহাপুরুষ, সংসারের পঙ্কপুটে ডুবে থেকেও তাঁরা নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দ আত্মভূ। দুইটী দৃশ্যই বিরল কিন্তু অসম্ভব কিছু নয়। দুইটী দৃষ্টান্তই দুর্ল্লভ কিন্তু অলভ্য নয়। অন্যান্যেরা এই দুই থাকের মাঝামাঝি বলা যেতে পারে। কিন্তু কে কতটা সন্ন্যাসী আর কে কতটা সংসারী, তা' আমাদের খোঁজ ক'রে লাভ নেই, তাঁরা সমগ্র জীবনের একাগ্র সাধনায় যে পরম সত্যকে পেয়েছেন, যে অভয়ামৃত আস্বাদন করেছেন, তাঁর কণা মাত্র পাওয়াতেই আমাদের লাভ। মহামৃতের একটী কণাও অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে অনেক বেশী বড়।

পরমামৃতের প্রয়াসী হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রতিজনে সেই পরমামৃতের প্রয়াসী হও, সেই পরমামৃতের পিপাসু হও। জগতের প্রতিটি

পানপাত্রে সেই পরমামৃতের সন্ধান কর। যে পানপাত্রে সেই বস্তু নাই ব'লে বুঝতে পার, তাকে পরিহার কর। যে পানপাত্রে সেই মহাবস্তু আছে ব'লে জান্‌তে পাচ্ছ, নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে সেই পানপাত্রে চুমুক দাও। নির্ভয়ে উদরপূরণ ক'রে সেই পরম পানীয় নিঃশেষে খেয়ে নাও। লক্ষ্য রেখো, বিচারে যেন তোমার ভুল না থাকে। শুধু পিপাসাই কখনো পানপাত্রের অভ্যন্তরস্থ বস্তুর সত্তা নির্ণয় কত্তে পারে না, তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হ'লে পলে পলে তিলে তিলে তাকে বিচার ক'রে তার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এই বিচারের বুদ্ধি যাতে তীক্ষ্ণ হয়, এই বিচারের শক্তি যাতে নির্ভুল হয়, তারই সৌকর্য্যার্থে জগতে নানা সাধন-পন্থা আবিষ্কার হয়েছে এবং কেউ একটী পন্থা আশ্রয় ক'রে কেউ বা অপর পন্থা আশ্রয় ক'রে ক্রমশঃ নিজের পথে এগিয়ে চলে যাচ্ছে। যে সাধন করে না, সে আবার সিদ্ধির কি প্রত্যাশা করবে? যে পরিশ্রম করে না, সে আবার কোন্ পারিশ্রমিকের দাবী কর্ব্বে? যে যেখানে আছ, একটু স্থির চিত্তে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখ যে, তোমার অনন্তকালের অফুরন্ত পিপাসার পরিতৃপ্তি-যোগ্য কোন্ সুমহৎ পানীয় তোমার হাতের কাছে আছে। মনে ক'রো না যে, অনেক দূরে যেতে হবে। যা' তোমার প্রকৃত প্রয়োজন, তা' তোমার অতি নিকটেই রয়েছে। চিন্‌তে পারছ না ব'লেই দূরদূরান্তরে ছুটাছুটি ক'রে বেড়াতে হচ্ছে।

ছুটাছুটি করার সার্থকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, ছুটাছুটি করারও সার্থকতা আছে। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ ক'রে ব্যর্থকাম হ'য়ে মানুষ যখন নিজের কাছেই নিজে ফিরে আসে, তখন অশেষ ক্লেশ ও অসহ ক্লান্তির মাঝখান দিয়ে তার হঠাৎ এক সম্বিৎ লাভ হয়। সে দেখতে পায় যে, যা-কিছু খোঁজার, যা-কিছু পাওয়ার, সব তার নিজের কাছেই আছে। তখন সে বুঝতে পারে যে, প্রাচীন ঋষি কেন বলেছিলেন,—"আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে জানো।"

তুমি স্বয়ং-সম্পূর্ণ

বক্তৃতা দেড়ঘণ্টাকাল হইল। বক্তৃতান্তে কত জনের যে কত রকমের জিজ্ঞাসা, তাহা বর্ণনা কঠিন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছ বাছারা, সব জিজ্ঞাসার জবাব যে নিজের কাছেই পাবে। পরমেশ্বর তোমাকে একেবারে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ক'রেই সৃষ্টি করেছেন। তোমার যা-কিছু প্রয়োজন, সব তোমার কাছেই আছে।

চাকুরী থাকিবে না

ভিড় কিছুতেই কমিতেছিল না। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এখন তোমাদের বাড়ী যেতে হবে। নইলে আমার চাক্‌রী থাক্‌বে না। চাক্‌রী গেলে খাব কি?

একজন জিজ্ঞাসা করিল,—চাক্‌রী? কিসের চাক্‌রী? কার চাক্‌রী? আপনি আবার চাক্‌রী কর্ব্বেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার চাক্‌রী হচ্চে চিঠি লেখার চাক্‌রী। ঐ দেখ্‌তে পাচ্ছ না, কয় শত চিঠি উত্তরের আশায় আমার বিছানাটার শিয়রে বালিশের কোণে জমে আছে? তোমরা যেমন উৎকর্ণ হ'য়ে বক্তৃতা শোন, এসব চিঠির লেখকেরাও তেমন উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমার পত্রের প্রত্যাশায় দিন গণে। জীবনে আর কিছু কাজ করিনি, কেবল লক্ষ লক্ষ চিঠিই ত' লিখেছি এবং লিখ্‌ছি।

স্নান, বস্ত্র-পরিবর্ত্তন, উপাসনা ও সংক্ষিপ্ত আহার সারিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন। আগামীকল্য দ্বিপ্রহরে স্থানীয় হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ে এবং অপরাহ্ণে বর্দ্ধমান হরিসভা-প্রাঙ্গণে, এই দুই স্থানে দুইটী বক্তৃতা দিতে হইবে। দিনের বেলা পত্র লিখিবার অবকাশ পাইবেন না। সুতরাং অদ্য রাত্রি একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া পত্রই লিখিতে হইল।

সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার বার

কুমিল্লা জেলান্তর্গত হাজিগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটীর প্রতি প্রত্যেক অখণ্ডকে

বিশেষ ভাবে আগ্রহী করিয়া তোল। নৈমিত্তিক উপাসনাগুলিতে কেহ কারণাধীনে যোগ দিতে না পারিলে দোষ ধরিও না বা সমালোচনা করিও না। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সাপ্তাহিক উপাসনার দিনটীতে কেহ ঠিক সুনির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া যোগদান করিলে তাহাকে অশেষ প্রশংসার পাত্র বলিয়া জ্ঞান করিও এবং মনে মনে তাহাকে সম্মান করিও।

"নিজেদের বাড়ীতে বসিয়া একক উপাসনা ত' প্রত্যেককে নিয়মিত ভাবে ও নিষ্ঠার সহিত করিতে হইবেই। কিন্তু তাই বলিয়া সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটী বাদ দেওয়া চলিবে না। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটী তোমাদের সকলের শক্তি, উৎকর্ষ ও উপলব্ধিকে একমুখ করিবার এক দিব্য উপলক্ষ্য। এই উপলক্ষ্যের সদ্ব্যবহার করিও।

"সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার বারটী কোথায় কি হইবে, তাহা নিয়া নিজেদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হইতে দিও না। যে বারে ঐ উপাসনাটীর অনুষ্ঠান হইলে অধিকাংশ উপাসকের মিলিত হইবার সুযোগ-সুবিধা বেশী, সেই বারটীকেই নির্ব্বাচন করিতে হইবে। রহিমপুর আশ্রমে থাকিবার কালে আমি বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানটী করিতাম বলিয়া সর্ব্বত্র বৃহস্পতিবারেই করিতে হইবে, এই জিদ ঠিক নহে। তখন কেহ জানিতই না যে, মঙ্গলবার আমার জন্মবার। এই

কথাটী আমি কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলি নাই। কিন্তু একদা ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন হইতে অনেকের ঝোঁক হইয়াছে যে, মঙ্গলবারেই সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটীর অনুষ্ঠান করা চাই। যেখানে মঙ্গলবার হাটবার বলিয়া উপাসকেরা বাজারে থাকিবে ব্যস্ত, সেখানে মঙ্গলবারের জন্য জিদ ধরিয়া থাকার কোন অর্থ নাই। সপ্তাহে একটী দিন মিলিতেই হইবে। সেই দিনটা যে-বার হইলে সকলের সুবিধা, সেই বারটীই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই বিষয় নিয়া তর্কাতর্কি সঙ্গত নহে। সংঘ গড়িয়াছ শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, শক্তির অপচয়ের জন্য নহে।

"ভারতে ইংরেজ-শাসন প্রবর্ত্তনের পর হইতে অফিস, আদালত, বিদ্যালয় প্রভৃতি রবিবারেই বন্ধ থাকিবার প্রথা হইয়াছে। এই দিন অনেকেই ছুটি পায় বলিয়া অবসর করিয়া সমবেত উপাসনাতে মিলিত হইতে অধিক সুযোগ পায়। সেই কারণে অনেক স্থানে রবিবার দিনটীই সমবেত উপাসনার জন্য বিশেষ ভাবে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। ইহাও ভাল ব্যবস্থা। প্রত্যেক অঞ্চলেই বা প্রত্যেক গ্রামেই অখণ্ডোপাসকদের জন্য একটী সুবিধাজনক বার এমন ভাবে সংরক্ষিত থাকুক, যেন অধিকাংশ অখণ্ড সেই পুণ্যানুষ্ঠানে যোগদান করিবার সুযোগ পায়। অধিকাংশের পক্ষে অসুবিধাজনক একটী বার এই কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত হইলে সকলের মধ্যে অধিকাংশকে নাও পাওয়া যাইতে পারে। বার-নির্দ্ধারণের ব্যাপারে কাহারও

উচিত নহে ব্যক্তিগত জেদ বা গোঁড়ামিকে আশ্রয় করিয়া চলা। রাম একদা এক সোমবারে তাহার বাড়ীতে একটী সমবেত উপাসনা দিয়াছিল, অতএব রামের সম্মান রক্ষার জন্য প্রতি সোমবারেই রামের বাড়ীতে সকলকে সমবেত উপাসনায় আসিতে হইবে, যদিও উক্ত বারটী অন্যান্য সকলের পক্ষে বড়ই অসুবিধাজনক,—এই জাতীয় জিদ রাখা উচিত নহে। শ্যামের বাড়ীতে শনিবার দিন এক মহাপুরুষের শুভাগমন হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষ্যে সমবেত অখণ্ডোপাসনার অনুষ্ঠান করিয়া দিনটীকে আনন্দ-মুখরিত করা হইয়াছিল, অতএব ঐ গ্রামের বা ঐ অঞ্চলের সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটী ঐ বারেই করিতে হইবে, এইরূপ জিদ রাখাও কাহারও উচিত নহে। যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের বেশীর ভাগ লোকের সমবেত উপাসনায় যোগ দিবার সুবিধার দিকে তাকাইয়া বারটী নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তুমি তোমার ব্যক্তিগত উপাসনার মধ্যে যতগুলি মর্জ্জি খাটাইতে পার, সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার মধ্যে ততগুলি মর্জ্জি খাটান সম্ভব নহে, সঙ্গতও নহে। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগদান করিয়া প্রত্যেকে কৃতার্থ হইতেছ, অন্তরে এই ভাবটী রাখিও। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা তোমাদের ব্যক্তিগত অহংকে খর্ব্ব করিয়া সকলের মিলন-সূত্র সৃষ্টি করিয়া দিবে, এই আশা লইয়া প্রতিটি কার্য্য করিও।"

জাতিধ্বংস নিবারণের উপায় আছে

বগুড়া জেলান্তর্গত ডেমাজানি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দেশের প্রকৃত অবস্থার দিকে তাকাইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। অতীব দ্রুত আমরা অবনতির গহ্বরে নামিয়া যাইতেছি এবং দেখিলে মনে হয় যেন প্রতিযোগিতা করিয়াই আমরা সর্ব্বনাশের পথে কেবলই গতিবেগ বর্দ্ধন করিয়া চলিয়াছি। দেশের লোকের ভিতরে দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতা যে ভাবে বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে দুশ্চিন্তা না করিয়া কেহ পারে না। কিন্তু দুশ্চিন্তার দ্বারা ইহার প্রতীকার হইবে না, প্রতীকার করিতে হইবে লোক-মনকে বারংবার আদর্শের বাণী শুনাইয়া শুনাইয়া সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টার মধ্য দিয়া। জাতির সম্মুখে যে নিবিড় অন্ধকার পুঞ্জায়মান, একথায় সন্দেহ নাই কিন্তু আলো জ্বালিয়া,—সেই আলো জ্ঞানের আলো, সেই আলো দৃষ্টান্তের আলো, সেই আলো শুভবুদ্ধির আলো,—একমাত্র আলো জ্বালিয়াই এই অন্ধকারকে দূর করিতে হইবে। প্রবঞ্চনা, পরস্বাপহরণ, অবৈধ ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা, অসত্য ভাষণ, প্রতিশ্রুতি-লঙ্ঘন, হিংসা, বিদ্বেষ, হত্যা ও লুণ্ঠন যখন একটা জাতিকে চতুর্দ্দিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলে,

তখন তাহার সর্ব্বনাশের আর বাকি কি রহিল? কিন্তু হতাশ হইলে চলিবে না। ইহারই মধ্যে তুমি, আমি ও সকলে আমাদের কাজ করিয়া যাইব এবং ধীরে ধীরে সমাজকে রূপান্তরিত করিব। বেপরোয়া লোকসংখ্যাবৃদ্ধি, অবিরাম নবজাতকের জন্ম সমস্যাগুলিকে ক্রমশঃ কঠিনতর করিয়া দিতেছে। অত্যধিক সংখ্যায় পুত্রকন্যা পালন করিতে অক্ষম হইবার ফলে অতীব সাধু চরিত্রের সরল মানুষটীও কল্পনাতীত অসততার পথে পা বাড়াইতে বাধ্য হইতেছে এবং চোরের ঘরে চোর, ডাকাতের ঘরে ডাকাত, হত্যারুর ঘরে হত্যারু, নারী-লাঞ্ছনাকারীর ঘরে নূতন নূতন নারীলাঞ্ছনাকারী লালিত-পালিত হইয়া বড় হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ব্যাপক প্রচারের দ্বারা বয়স্ক পুরুষ-নারীদিগকে সন্তান-সংখ্যা বর্দ্ধনের অদম্য উৎসাহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে। চেষ্টাকৃত সংযমের পথে ইহা সম্ভব হইলে ইহা সর্ব্বপ্রকার প্রতিক্রিয়া বর্জ্জিত হইবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে এবং বহুক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, কাল যে দম্পতীকে নিতান্তই কাম-কাতর ও কদর্য্য লালসার হেয় ক্রীড়নক বলিয়া মনে করা হইতেছিল, সামান্য কিছু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সহায়তা পাইবার পরে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃত সংযম পালন করিয়া সুখের সংসারী জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইতেছে। মানুষ পশু অপেক্ষা যে চেষ্টা করিলেই শ্রেষ্ঠ থাকিতে পারে,

এগুলি তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। প্রত্যেকের কর্ণে এই বিশ্বাসভরা বাণী শুনাইতে হইবে যে, উপায় আছে, উপায় আছে, উপায় আছে, তোমরা নিরুপায় নহ। উৎস-মুখে যদি সংযমের বাঁধন কষা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশের স্রোত দিনের পর দিন প্রবলতর হইতে পারে না। সেই উৎসটী হইতেছে প্রতিটি পিতামাতার সংগোপন দাম্পত্য জীবন। এই জীবনটুকুর মধ্যে পিতামাতা যদি সংযমের লাগাম কষিতে পারেন, তাহা হইলে দুই, তিন, চারি পুরুষ পরের মানুষগুলি স্বভাবতই অন্য ধাঁচ নিয়া, অন্য চরিত্র নিয়া, অন্য ভূমিকা লইয়া আবির্ভূত হইবে। এ কাজ কঠিন কিন্তু অসম্ভব নহে। লক্ষ দম্পতী যেখানে অসাফল্যে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেখানে যদি একটী দুইটী দম্পতীও সফল হয়, তবে তাহাদের দেহের সূক্ষ্মতম এক একটা ভগ্নাংশ তিন শত বৎসর পরে এক নূতন শক্তি নিয়া আবির্ভূত হইবে। এই উপায়টী সম্পর্কে সকলকে অবহিত করিবার জন্য শত শত নরনারীর প্রচারব্রতী হওয়া প্রয়োজন। মানুষ-রূপ-ধারণকারীরাও যে ইতর যোনিতে জাত পশুপক্ষিকীট পতঙ্গের অধম হইয়া যাইতেছে, ইহা সৃষ্টির এক নিদারুণ অভিশাপ। কিন্তু এই অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবার পথ আছে। যে মানুষ আজ পশুত্বের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিবার জন্য তীব্র-বেগে পথ-পরিক্রমা করিতেছে, সেই মানুষ একদা যে দেব-মানবে রূপান্তরিত হইবে, তাহার উপায় আছে।"

পদমর্য্যাদার সদ্ব্যবহার কর

কুমিল্লা জেলান্তর্গত বাঙ্গোরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ পদাধিকার পাইয়াছ, ইহা খুবই আনন্দের কথা। এই পদের মর্য্যাদা রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিও। অতীতে যাঁহারা মণ্ডলীর উচ্চ উচ্চ পদ ও পদবী অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সহযোগ-মূলক মনোভাব নিয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিবে। প্রকৃতই যাহারা কাজের কাজী, তাহারা প্রবীণ ও নবীন সকলের প্রাণঢালা সহযোগ আদায় করিবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক শহরের বা প্রত্যেক গ্রামের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রত্যেক মণ্ডলীরই কাজ করিবার সুযোগ যথেষ্ট আছে এবং যেখানে সুযোগ নাই, আছে শুধু দুর্য্যোগ, সেখানে সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিবার অকুণ্ঠ-রুচি-সম্পন্ন কর্ম্মিদল গড়িয়া নিবার দায়িত্বও সাহসের সহিত গ্রহণ করিতে হয়। যে-কোনও উল্লেখযোগ্য কর্ম্মে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইলে কাহারও একক শক্তি, একক প্রভাব বা একক প্রতিভার উপরে নির্ভর করিয়া অন্যদের নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে দিবার মতন ভুল আর কিছু নাই। যে-কোনও স্তরের, তাহা উচ্চ গ্রামের হইতে পারে,

নিম্ন গ্রামেরও হইতে পারে, কর্ম্মীকে যোগ্য কর্ম্ম হাতে তুলিয়া দিয়া একটী গণনীয় সৎকর্ম্মীতে পরিণত করিবার জন্য পদাধিকারীদিগকে রীতিমত তপস্যা করিতে হয় এবং প্রাক্তন কর্ম্মীদের মর্য্যাদা যেমন রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হয়, তেমন আবার ভাবী কর্ম্মীদের আবির্ভাবকে সম্ভব করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার যোগ্য আয়োজনে নামিয়া যাইতে হয়। তোমরা কয়েক জনে যে উচ্চ পদ পাইয়াছ, নিজেদের কর্ম্ম, সেবা ও শ্রম দিয়া সেই পদের মর্য্যাদা শুধু রক্ষা করাই নহে, বর্দ্ধনও করিতে হইবে। পদ অনেকেই পায় —কিন্তু পদের মর্য্যাদা কিসে থাকে, তাহাও যেমন জানে না, কি করিয়া পদের মর্য্যাদা বাড়ান যায়, তাহাও তেমন ভাবে না। পদমর্য্যাদাকে নব নব কর্ম্মী-সৃষ্টির কাজে লাগাও।

"মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটী কর্ম্মীকে সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজে নামাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে যে কৌশলটী অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে নির্ব্বিরোধিতার কৌশল, অর্থাৎ যে ভাবে চলিলে, বলিলে, ভাবিলে কাহারও বিরুদ্ধকারিণী শক্তি ও বিপরীতচারিণী বুদ্ধি হঠাৎ জাগ্রত হইয়া কর্ম্মের পথে বাধার সৃষ্টি করিতে প্ররোচিতা হইবে না। প্রত্যেকের যেখানে লক্ষ্য 'কাজ আমরা করিবই', প্রত্যেকের সেখানে এই লক্ষ্যও থাকা প্রয়োজন,—'কলহ আমরা কিছুতেই করিব না।' 'কাজের শত্রু বেশী কথা',—ইহা আমার একটী সুপ্রসিদ্ধ

উক্তি। কথার বহর কমাইতে পারিলে কলহ প্রশমিত করিতে অধিক বেগ পাইতে হয় না। কর্ম্ম-সাফল্যের অনুকূলে প্রচণ্ড পরিশ্রম, দৃঢ়-সঙ্কল্প, অদম্য অধ্যবসায়ের যেমন প্রয়োজন, বাক্-সংযমেরও তেমনই প্রয়োজন। এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদের মূলমন্ত্রই হইল,—'কাজ করিব না, কাজ কেবল পণ্ড করিব।' তাহাদের প্রধান অস্ত্র বাক্‌প্রগল্‌ভতা, রসনার চাপল্য। তাহারা অবান্তর কথার সৃষ্টি করে, অপ্রাসঙ্গিক আড়ম্বর দিয়া আসল কাজকে ধূম্রাচ্ছাদিত করে। ইহার ফল লঙ্কাকাণ্ড ও খাণ্ডবদহন ছাড়া আর কিছু হয় না। লভ্য-স্বরূপে কিছু ছাই পাওয়া যায় কিন্তু সেই ছাই যজ্ঞভস্ম নহে বলিয়া কাহারও কোনও কাজে আসে না।

"পদাধিকারের মোহে মশগুল হইয়া তোমার আসল কর্ত্তব্য কিন্তু ভুলিয়া যাইও না। সর্ব্বদা চেষ্টা রাখিবে যে, মণ্ডলীর সভ্যগণের মধ্যে কি করিয়া ঐক্য বাড়ে। যাহা করিলে, কহিলে, ভাবিলে ঐক্যে ফাটল ধরিবার সম্ভাবনা, প্রত্যেকে তাহা প্রাণপণ যত্নে এড়াইয়া চলিবে। পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রেমভাব বর্দ্ধনই পদাধিকারীদের প্রধানতম কর্ত্তব্য, নিজেদের পদগৌরবের ইজ্জৎ বাড়াইবার জন্য কর্ত্তৃত্বের ছটা ঘুরান তাহাদের আসল কাজ নহে।

"যাহারা তোমাদের মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নহেন, এমন লোকদের সহিতও বিভেদের সম্ভাবনা সৃষ্টির সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা

হইতে প্রত্যেককে বিরত রাখিবে। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তোমারই যে অগ্রগতির সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়, তাহা মনে রাখিবে। কলহ করিয়া তারপরে শান্তি স্থাপনের চেষ্টার চেয়ে, কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া শান্তি-সংরক্ষণ অনেক বেশী সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

"অনেক স্থানেই তোমাদের সংখ্যা-গৌরব বাড়িতেছে কিন্তু কর্ম্ম-গৌরবও সঙ্গে সঙ্গে বাড়া প্রয়োজন। সংখ্যাকৌলীন্য কৌলীন্য নহে, কর্ম্মকৌলীন্যই প্রকৃত কৌলীন্য। প্রকৃত কৌলীন্যের অধিকারী হইতে হইলে প্রতিটি নেতাকে সেবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিতে হইবে। মনে সেবাভাব থাকিলেই তুমি প্রকৃত নেতা হইবে, পদাধিকার পাইয়াছ বলিয়াই তুমি নেতা নহ। পদাধিকার যদি চিত্তে বিনয় না দেয়, তাহা হইলে পদের মর্য্যাদা কমিয়া যায়, এই কথাটি মনে রাখিবে।"

ঐক্য ও শক্তি

পাবনা জেলান্তর্গত ডেমরু-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"শক্তিলাভ হয় ঐক্যে। শক্তিলাভ হয় সংযমে। শক্তিলাভ হয় অনুশীলনে। শক্তিলাভ তপঃসাপেক্ষ। অনেকেই শক্তিমান্ হইতে চাহে কিন্তু প্রয়োজনীয় তপস্যায় ব্রতী হয় না। গালগল্প করিয়া আর আড্ডা মারিয়া শক্তি অর্জ্জন করা যায় না।

শক্তিলাভ করিতে হইলে ধারাবাহিক, পদ্ধতিবদ্ধ, দীর্ঘপ্রযত্ন-পরিসেবিত শুদ্ধ শ্রম চাই।

"ব্যক্তিগত মহত্ত্বের অহমিকা পরিহার করিয়া প্রত্যেকে অনুগত সেবক হও। সহস্র সেবক একত্র মিলিতে পারে কিন্তু দুইটী অহমিকা গ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে মিলন-সাধন সম্ভবপর হয় না। অহমিকা না গেলে শক্তির উদ্বোধন ঘটে না।

"শক্তির উদ্বোধনের জন্য তোমরা সাধনায় ব্রতী হও। যাহাদের সাহচর্য্যে জগতে মহৎ কর্ম্ম-সমূহ করিবে, তাহাদের প্রতিজনকে সাধনশীল করিয়া তুলিবার অকপট ও আপ্রাণ চেষ্টা কর।

ঐক্য সাধনার একটী বড় উপায় হইতেছে, যাহাদিগকে দীর্ঘকাল নিষ্কর্ম্মা বলিয়া অবহেলা করা হইয়াছে, তাহাদের হাতে কাজ তুলিয়া ধরা এবং তাহারা যাহাতে আনন্দ-সহকারে সেই কাজটী সত্য সত্যই করে, তাহার চেষ্টা করা। কাজের মধ্য দিয়া ঐক্যই প্রকৃত ঐক্য। কথার মধ্য দিয়া ঐক্য প্রাথমিক স্তর মাত্র। প্রত্যেক নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তির হাতে কাজ তুলিয়া দিয়া যদি তাহাদিগকে দিয়া কাজ করাইয়া নিতে পার, তবে খুব একটা বড় কাজ করিলে বলিয়া মনে করিও। অলস, বাক্যবাগীশ ও উদাসীনদিগকে কাজে লাগান সম্ভব হইলে তোমরা দেশ ও সমাজের কত নিদারুণ সমস্যা সহজে মিটাইয়া ফেলিতে সমর্থ হইবে, তাহা বলিবার নহে।

দেশের সব চেয়ে বড় শত্রু হইতেছে অলসতা আর কর্ম্মে অনিচ্ছা। আর, সেই শত্রুকে নিয়ত মদত যোগাইতেছে আমাদের বড় বড় কথা, বাগাড়ম্বর, অহং-মদ-মত্ততা। বেশী কথার মত কাজের শত্রু জগতে দ্বিতীয় আর কিছু নাই। তোমরা বেশী কথা কহিবার কদভ্যাসটা একেবারে পরিহার কর। শিকারী কুকুর বেশী ঘেউ ঘেউ করে না, চুপ করিয়া তাক্ করে এবং ঠিক প্রয়োজনমত শিকারের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। প্রকৃত শিকারী বিড়াল বেশীক্ষণ মাটিতে নখর ঘষে না, স্বল্পকাল মধ্যেই সে স্থির হইয়া যায় এবং ঠিক যোগ্যতম মুহূর্ত্তে শিকার পাকড়াও করে। পশুপক্ষীর কাছে আমাদের কত শিক্ষণীয় আছে। সেগুলি শিখিয়া লও এবং সেই শিক্ষাকে কাজে লাগাও।

"সংসারের সহস্র কর্ত্তব্য মানুষকে পালন করিতেই হইবে। তাহার মধ্যেই চেষ্টা করিয়া কে কতটুকু অবসর বাহির করিয়া নিতে পারে, তাহার অনুসন্ধানে থাকিতে হইবে। যাহার যখনই একটু ফুরসুৎ হইল, তখনই সে সেই স্বল্পপরিসর অবসরটুকুকে কোনও না কোনও সমাজ-মঙ্গল কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া অল্প কালের জন্যও নিজের স্বার্থের গণ্ডীর বাহিরে আত্মনিয়োগ করিবার অনুশীলনটুকু বজায় রাখুক। এভাবে প্রতি জনে অনুপ্রাণিত হও। সমভাবে অনুপ্রাণিত লোকদের মধ্যেই ঐক্য স্বাভাবিক ও স্থায়ী হয়।

"পৃথিবীতে একাকী নিজের বাঁচিয়া থাকিবার সাধ যাহার যতই তীব্র হউক, সংসারের, সমাজের, দেশের ও জগতের অপর সকলের কুশল হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিয়া কেহই নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। আর, সেই চেষ্টা কদাচ সফল হইলেও সেই বাঁচা জীয়ন্তে মরিয়া থাকারই নামান্তর। অতএব তোমরা তোমাদের সমগ্র দিনের কতকটা অবসর সময় সমাজ-মঙ্গল-কর্ম্মে নিয়োগ করিতে সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া আইস আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বৃথা গলগ্রহগুলিকে দিয়া কিছু না কিছু কাজ করাইয়া নিবার চেষ্টা কর।

"তোমরা প্রত্যেকেই সাধনশীল হইবে। সাধকের মন সর্ব্বদা প্রশান্ত থাকে বলিয়া সে তুলনায় অন্য লোকদের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করিতে পারে। সাধনের ফলে অন্তরের বিশ্বাস প্রগাঢ়তর হইবে এবং প্রকৃত নির্ভর জন্মিবে। বিশ্বাস আসিলে ভয় দূরে পলাইয়া যায়, নির্ভর আসিলে ত্রাস থাকিতে পারে না। ফলে সর্ব্বত্র অভয় অন্তরে দৃঢ়পদক্ষেপে বিচরণ করিতে পারিবে। ইহা প্রকৃত সাধকদের জীবনে প্রত্যক্ষ করা নির্ভুল সত্য।

"নিজের সাধনানুরাগ বর্দ্ধনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সকলের মনে সাধনানুরাগ সৃষ্টির অনুকূল সাত্ত্বিক একটা চেষ্টা তোমাদের প্রত্যেকের থাকা উচিত। কারণ, পরিবেশ

অনুকূল হইয়া উঠিলে তোমার নিজেরই ত' লাভটা সকলের চেয়ে বেশী। শান্ত পরিবেশে সমমনোভাবসম্পন্ন লোকদের সংখ্যাবৃদ্ধি স্বাভাবিক।"

ঐক্য ও সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিশ্বকে আপন করা

নোয়াখালী জেলান্তর্গত ফেণী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সর্ব্বক্ষণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিবে। নিজেদের মধ্য হইতে চরিত্রবল কমিয়া গেলে সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া মনে করিবে। নিজেদের মধ্য হইতে ঐক্যবল কমিয়া গেলেও একটী ভীষণ সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল বলিয়া মনে করিবে। পরস্পর পরস্পরকে সহিয়া চলিতে না পারিলে ঐক্য থাকে না, কিন্তু ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবার কোনও অর্থ হয় না। জীবিতদের মধ্যে কখনো কখনো মতানৈক্য ঘটিতেই পারে, তাহা বিদ্বেষের ও পারস্পরিক শত্রুতার সৃষ্টি না করিলেই হইল। মৃতদের মধ্যে অনৈক্য কোথায়? চিরকালের পরম শত্রুদের নিয়া শ্মশানের চিতায় পাশাপাশি শয়ন করাইলেও কেহ মুখ ফিরাইয়া শোয় না। মৃতের এই ঐক্য ঐক্যই নহে। সেই ঐক্য দিয়া কি কাজ হইবে? তোমরা জীবিতদিগকে জীবন্ত থাকিতে দেও এবং

জীবিতেরা পারস্পরিক যৎ-সামান্য মত-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যাহাতে ঐক্যবদ্ধ হইয়া চলিতে পারে, তাহার প্রেরণা দিয়া যাও।

"তোমরা সম্প্রতি যে সম্মেলনটীর অনুষ্ঠান করিলে, তাহা যদি তোমাদিগকে বুকভরা সাহস এবং প্রাণভরা আত্মবিশ্বাস দিয়া থাকে, তবে বলিব যে, তোমাদের সম্মেলন সার্থক হইয়াছে কিন্তু আত্মবিশ্বাসই বড় কথা নহে, সাহসই শেষ কথা নহে, এই বিশ্বাস অনুযায়ী, এই সাহস সহকারে যদি প্রত্যেকে অকুণ্ঠ উদ্যমে কাজে লাগিয়া যাইতে পার, তবে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য অর্জ্জন সম্ভব হইবে। বুদ্ধি-পরামর্শ আর বাগ্মিতার উপরে সাফল্য নির্ভর করে না, সাফল্য আসে প্রচণ্ড পরাক্রমে পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠায়। অনেকে ভাল ভাল বক্তৃতা দিল, সকলে মন দিয়া শুনিল ও সমর্থন করিল,— সম্মেলনের সাফল্য বলিতে শুধু এইটুকু বুঝায় না। যাহা প্রস্তাবিত, আলোচিত, গৃহীত ও অভিনন্দিত হইয়াছে, তাহার বাস্তব রূপটী তোমাদের কর্ম্ম দ্বারা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

"তোমাদের যে সম্মেলনটী হইয়া গেল, এমন অনেকে আছে, যাহারা তাহাতে উপস্থিত থাকিয়াও তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। এমন অনেকে আছে, খবর পাইয়াও যাহারা সম্মেলনে যোগদান করে নাই বলিয়া প্রকৃত

বিষয় কিছুই জানে না। এমনও অনেকে থাকিতে পারে, যাহারা সম্মেলনের বিকৃত বিবরণ শুনিয়াছে এবং সম্মেলন সম্পর্কে তাহাদের যেরূপ অভিমত হওয়া উচিত নহে, ঠিক সেই অস্বাভাবিক অভিমতটীই গঠন করিয়া বসিয়া আছে। সম্মেলন শেষ হইয়া যাইবার পরে তোমাদের এতগুলি লোকের প্রতি কর্ত্তব্যের দায় আসিয়া পড়ে। তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পর্কে তোমাদের ভাবিতে হইবে, কর্ত্তব্য পালনের সহজতম পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে এবং সেই কর্ত্তব্য ত্বরিত পালন করিতে হইবে।

"তোমাদের ওখানে যে সম্মেলনটী হইয়া গেল, নিশ্চয়ই তাহা দ্বারা স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে বেশ খানিকটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, যাহা তোমাদের কল্যাণ-কর্ম্মের সাধনার পক্ষে নিশ্চয়ই অনুকূল। এই পরিবর্ত্তন ও এই অনুকূল অবস্থাটুকু থাকিতে থাকিতে তোমাদের কতকগুলি অতীব আবশ্যকীয় কাজ সারিয়া ফেলিতেই হইবে। এই বিষয়ে আলস্যের বা কালহরণের কোনও সার্থকতাই নাই। আর, এই পরিবর্ত্তনকে, এই আনুকূল্যকে কি ভাবে ক্রমবর্দ্ধনশীল এবং ভাবী যুগের দিকে ক্রম-সঞ্চরমাণ রাখা যায়, তাহার কৌশল ও কার্য্যক্রম তোমাদের দ্রুত অবলম্বন করিতে হইবে। দুদিনের হুজুগ তুবড়ীবাজীর ফুলঝুরির মতন ক্ষণিক ফুঁসফাঁস করিয়াই যেন চিরকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া না যায়। তোমাদের ঐক্যেরও

যাহা লক্ষ্য, সম্মেলনেরও তাহাই লক্ষ্য। সম্মেলন ঐক্যকে দৃঢ়তর করুক, ঐক্য বিশ্ববাসীকে তোমাদের বক্ষালিঙ্গনে আবদ্ধ করুক। বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীকে আপন করিয়া পাইবার জন্যই তোমাদের ঐক্য, তোমাদের সম্মেলন।"

বর্দ্ধমান-হরিসভা
১৬ই আষাঢ়, সোমবার, ১৩৪২
(১লা জুলাই, ১৯৩৫)

অদ্য প্রাতঃকালে যৌগিক আসন-মুদ্রার ক্লাস করা সম্ভব হইল না। কারণ অদ্য জিজ্ঞাসুর ভিড় অত্যন্ত অধিক।

প্রত্যেককে যার যার জিজ্ঞাস্যের জবাব দিতে দিতে বেলা এগারটা বাজিয়া গেল। বেলা একটায় হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা হইল।

নারীর উন্নতিতেই জাতির সামগ্রিক উন্নতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমস্ত গাছটার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চারণা আসে, ঠিক তেমনি মেয়েদের ভিতরে সত্য, শুচিতা, পবিত্রতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, আত্ম-সম্মান-বোধ এবং দক্ষতা জাগ্রত হ'লে সমগ্র জাতি অতি সহজে এবং স্বাভাবিক ভাবে উন্নতি-পথাশ্রিত হয়।

বক্তৃতা দেড় ঘণ্টাকাল চলিল।

বর্দ্ধমানের অষ্টম বক্তৃতা

অপরাহ্নে হরিসভা-প্রাঙ্গণে বিরাট জনতার যেন স্থান-সঙ্কুলান হইতেছিল না। অন্যান্য দিনের বক্তৃতা একেবারে নিঃস্তব্ধ অবস্থার মধ্য দিয়া চলে, অদ্য তাহার কিছু ব্যতিক্রম হইল। অদ্য জনতার অত্যধিক চাপে কোনও শ্রোতাই নিজ নিজ স্থানে স্থির ভাবে বসিতে পারিতেছিলেন না। বক্তৃতা দেড় ঘণ্টাকাল হইল।

আমার ধর্ম্মমত আমার প্রচারণীয় নহে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যদিও শ্রোতার শোনার আগ্রহ খুবই প্রবল, তথাপি আমি কোনো স্থানেই বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে আমার নিজের ধর্ম্মমত ব্যক্ত করি না। কারণ, আমার নিজের ধর্ম্মমতই যে জগতের সকলের ধর্ম্মমত হবে, এমন দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। মানুষ তার নিজের ধর্ম্মমতের স্বাধীনতা নিয়ে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে নিজ নিজ ধর্ম্ম সাধন করুক। তার এই অনুশীলনে বাধা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা সংশয় সৃষ্টি করার আমার প্রয়োজন কি? এ কয়দিন যিনি যা' শুনেছেন, স্পষ্টতই অনুভব কত্তে পেরেছেন যে, আমার নিশ্চিতই কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট ধ্যান-ধারণা আছে, যা' হচ্ছে আমার

জীবনের সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ামক। কিন্তু এই বিষয়ে যেটা আমার, সেটা আমারই থাকুক। আপনাদের সকলের পক্ষে গ্রহণীয় যদি কিছু থাকে, তবে তার বাইরে আমার আলোচনার পরিসর-বৃদ্ধি অনাবশ্যক। এই জন্যই কখনো কোথাও আমি সভাস্থলে আমার নিজের ধর্ম্মমত ব্যক্ত করি না বা প্রচার করি না।

ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ধর্ম্মের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। পত্রহীন বৃক্ষ যেমন শ্রীহীন, ধর্ম্মহীন জীবন তেমন শ্রীহীন, তেমন নিষ্প্রভ, তেমন রুক্ষ। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। যে নিজেকে যতই ধর্ম্মদ্বেষী বা ধর্ম্মহীন ব'লে বর্ণনা করার চেষ্টা করুক না কেন, তার হৃদয়ের মর্ম্ম-দেশে নিশ্চয়ই এমন কোনও সার সত্যের দাবী আছে, যার প্রেরণায় সে তার সমগ্র জীবনের সবচেয়ে প্রধান কাজগুলিকে পরিচালিত করে। এই জিনিষটাই তার ধর্ম্ম। প্রত্যেক মানুষ নিজের ধর্ম্মকে চিনতে সমর্থ হোক্, নিজের প্রকৃত ধর্ম্মকে পালন কত্তে সমর্থ হোক্, পৃথিবীর সব প্রেমিক মানুষেরা নিরন্তর এইটাই কামনা করেছেন। নিজের অন্তরের অন্তরে সুষুপ্ত উৎস-স্বরূপ এই ধর্ম্মকে যিনি চিনেছেন, জগতে তিনিই ধন্য।

প্রকৃত ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোটি কোটি মানব-মানবী যখন পরস্পর পরস্পর থেকে শত রূপে আর সহস্র প্রকারে বিভিন্ন, তখন তাদের অন্তরের ভিতরে প্রেরণার উৎস-স্বরূপে ধর্ম্মকে যে শত রূপে আর সহস্র প্রকারে অনুভব তারা কর্ব্বে, এতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছু নেই। আপত্তি করারও কিছু নেই। সামাজিক জীবেরা ধর্ম্মের ব্যাপার নিয়ে আপত্তি উত্থাপন কর্ত্তে বা প্রতিবাদ কর্ত্তে তখনই অধিকারী, যখন কারো ধর্ম্মোন্মাদনা অন্য সামাজিক জীবদের শান্তিভঙ্গ কর্ব্বে। শুধু আপত্তি বা প্রতিবাদ কেন, এমন অবস্থায় মানুষ প্রতিরোধ সৃষ্টি কর্ত্তেও অধিকারী হয়। নইলে একজনের ধর্ম্মমতের বা ধর্ম্মপথের সঙ্গে অপরের বিরোধের কারণ আমি দেখ্‌তে পাই না। ধর্ম্মহীন রাষ্ট্র, ধর্ম্মহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি ব'লে নানা আলোচনা বা আন্দোলন দেখা গেলেও, প্রকৃতই ধর্ম্মহীন কোনো মানুষ হ'তে পারে না, তার স্বাভাবিক কর্ত্তব্যজ্ঞান তাকে মানুষের মধ্যে বিশেষ ক'রে দেয়, তার স্বাভাবিক পবিত্রবুদ্ধি তাকে যে অসাধারণত্ব দেয়, তাই তাকে ধার্ম্মিক ক'রে তোলে। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ফোঁটা-তিলকই ধর্ম্ম নয়, জটাজুটই ধর্ম্ম নয়, সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদনকারী বিভূতিরাশিও ধর্ম্ম নয়, মালা-ঝোলাও ধর্ম্ম নয়, দণ্ড-কমণ্ডলুও

ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম হচ্ছে মনের সেই স্বচ্ছ অবস্থার নাম, যে অবস্থায় মানুষ জগতের প্রতি তার কর্ত্তব্য-সম্পাদন কর্ত্তে গিয়ে অনায়াসে হাসতে হাসতে অত্যাচারের যূপকাঠে আত্মবলি দিতে পারে।

মিলন আমাদের শাশ্বত বিধিলিপি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমরা প্রকৃত ধর্ম্মকে খুঁজে পাই নি ব'লেই ধর্ম্মের নামে একে অন্যের সঙ্গে কলহ করি। ধর্ম্মবোধে এবং ধর্ম্মাচরণে জগতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, পরিবারে পরিবারে, সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে বা যুগে যুগে অনেক রূপান্তর, পথান্তর বা পার্থক্য থাক্‌বে, কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষ যে প্রকৃত প্রস্তাবে একই পরম সত্যের অধীন, এই কথার স্বীকৃতি না দিয়ে আমাদের উপায় নেই। সেই একই সত্যকে জীবনে প্রতিভাসিত করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে সর্ব্বমানবে যে বিশ্বজনীন ঐক্য একদা সংসাধিত হবে, সেইটী হবে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমুন্নতির একটী স্মরণীয় দিন। কোটি বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকেও মিলন আমাদের শাশ্বত বিধিলিপি। এই কথাটী বারংবার তারস্বরে সকল লোককে শুনিয়ে দেবার জন্যই আমার স্থান থেকে স্থানান্তরে, দেশ

থেকে দেশান্তরে পর্য্যটন আর পথ-পরিক্রমা। কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা, কত বিপ্লব, কত আপ্লব, কত উন্নতি, কত অধোগতি, কত বিজ্ঞান, কত দর্শন, কত অদ্ভুত আবিষ্কার ও কত অভাবনীয় কৃতিত্বের মধ্য দিয়া হানাহানি কাটাকাটি ক'রে পরিণামে মানবজাতিকে এই সত্যটী একদা স্বীকার করে হবে।

(সপ্তদশ খণ্ড সমাপ্ত)

> **"বাণীরূপে প্রতি ঘরে**
> **করিব নিবাস,**
> **সবারে লইব বুকে**
> **এই মোর আশ।"**
>
> **—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ**

অখণ্ড-সংহিতা সপ্তদশ খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

(১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান॥
দেহে, মনে প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার॥
পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির॥
অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে॥
কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন॥
সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে॥
নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর॥
চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর আনন্দ আমার!

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৭৭' নং গান।

(২)

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভর-পুর॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৬' নং গান।

(৩)

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু,
গ্রাহ্য যাহার নাই॥

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন-দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে "ভাই"॥

কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই॥

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৬০' নং গান।

(৪)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ;
আমায় তুমি যুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ॥

সবাই যখন বন্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত॥

(৫)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান,
শিখ বা ইহুদী, মুসলমান
আমার চক্ষে সব সমান
যত আছে নানা জাতি,
সবাই আমার আপনার জন
সবাই আমার জ্ঞাতি॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৩১' নং গান।

জগতের মাঝে কেহ নাহি মোর পর,
সবায় হৃদয়ে আঁকড়ি' ধরিব
আসুক না যত ঝড়,
সবারে লইয়া গগনের তলে
বাঁধিব আমার ঘর,
সবার নয়নে দেখিব আমার
প্রভুর নয়ন-ভাতি॥

ভালবাসা দিয়া সবারে বাঁধিব
আমার বক্ষ-নীড়ে,
সকলের দুখে হব সমদুখী,
ভাসিব অশ্রুনীরে,
বিপদে আপদে বাহুযুগ বেড়ি'
রাখিব সবারে ঘিরে,
করিয়া লইব জীবন মরণে
সবারে মরম-সাথী॥

কাহারেও হেলা করিব না অনাদরে,
স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিব
সকলের অন্তরে,
সবার লাগিয়া জ্বালাইব আমি
সোহাগের শত বাতি,
সবার কুশলে তপস্যা আমি
করিব সারাটি রাতি॥

* মঙ্গল-মুরলী পুস্তক হইতে গৃহীত '২৫' নং গান।

(৬)

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার
জাগিবে আবার নিশ্চিত,
ক্ষণিকের এই পতন-দৃশ্যে
চিত্ত আমার নয় ভীত।
জানি আমি পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যে
লভিবে ভারত লুপ্ত মান,
লভিবে বজ্র-বীর্য্য শৌর্য্য,
কর্ম্ম-কীর্ত্তি-দীপ্ত প্রাণ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে
জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ,
শুদ্ধ, মহৎ, সু-বৃহৎ।
গভীর পঙ্কে আবদ্ধ যার
ডুবিয়া সপ্ত শতাব্দী
ম্রিয়মাণ ছিল জীবন-চেতনা—
শুষ্ক, শীর্ণ প্রেমাব্ধি;
নিজের মাঝারে বিশ্ব-জগৎ,
বিশ্ব-জগতে আপনারে,
—চক্ষু থাকিতে অন্ধ,—তাই ত
দেখিয়াও দেখা গেলনা রে;

কেবল আত্ম-বঞ্চনা-নীতি
নিজেরে বাঁধিল শৃঙ্খলে;
দাস, ক্রীতদাস বংশানুক্রমে
বাড়িল কেবল দলে দলে।
তাহারি মাঝারে লুকাইয়াছিল
ঋষির সাধনা সুজাগ্রৎ,
আবার ভারতে নূতন রীতিতে
দেখাতে মুক্ত শুদ্ধ পথ।
বর্ষ দ্বিশত প্রতীচীর যত
বিলাস মদিরা করিয়া পান
হইল বিভল সংযম-বল,
মত্ত চপল হইল প্রাণ,
লালসা-তাড়না জীবন-সাধনা,
স্বার্থ হইল জপ ও তপ,—
যে যেখানে আছ, সবে শুধু বাঁচ
করিতে স্বার্থ-মহোৎসব।
কঙ্কাল-সার নিরন্ন আর
বিবস্ত্র নিঃসম্বলে
কর বঞ্চনা, শুধু প্রতারণা
ছলে বলে আর কৌশলে।
ইহাই বর্ত্তমানের চিত্র,
কিন্তু এ নহে শাশ্বত,
আবার ভারত লভিবে মূর্ত্তি
গৌরবময় অক্ষত।

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,
অখিল বিশ্বে দেখাতে পথ,—
নির্ভর করে ভারতের 'পরে
নিখিল-বিশ্ব-ভবিষ্যৎ।
রণ-বাহিনীর বাজে জিঞ্জির
বিশ্বের প্রাণে সৃজিয়া ত্রাস,
বিশ্বের যারা শত্রু, তাহারা
চাহিছে বিশ্ব করিতে গ্রাস।
দিকে দিকে শুধু মিথ্যার মধু
মুক্ত হস্তে করিয়া দান
হিংসা-ঈর্ষ্যা-ঘৃণা-বিদ্বেষ
তরঙ্গ তুলি' খেলিছে বান
কে পারে কাহারে কত-কাল ধ'রে
পদানত করি' রাখিতে আজ,
শুধু তারি তরে রেষারেষি ক'রে
জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-সাজ;—
এর মাঝখানে ভারতের প্রাণে
জাগিবে সত্য বজ্রবৎ
বান্‌চাল করি' মিথ্যার তরী,
দেখাতে নিত্য সত্য পথ।

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,
ভয় নাই, ভয় নাই কোনো,
যে আছ যেখানে একান্ত প্রাণে
কাণ পেতে মোর কথা শোনো,—
সংযম-বলে হও বলীয়ান,

সাধনার বলে হও মহীয়ান,
নিজ নিজ হৃদি-ক্ষেত্রের মাঝে
ব্রহ্মনামের বীজ বোনো—
ক্ষুদ্র বটের বীজটীর মাঝে
মহা-মহীরুহ লুকাইয়া আছে;
সিঞ্চিবে বারি মহোৎসাহেরে,
ব্যর্থ হবে না একজনও।
বীর্য্যের বলে মহাকুতূহলে
আরোহণ করি' চিত্ত-রথ
করহ আপন ত্রিভুবন-জন
নেহারি' সবারে আত্মবৎ।
ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,—
এ নহে মিথ্যা কল্পনা,
এ নহে রচিত অলীক কাহিনী,
বন্ধ্যা-বিহীন জল্পনা।
দিব্য নয়নে দেখেছি, ভারত
অতিক্রমিয়া মৃত্যু-পথ
ভৃঙ্গার ভরি' অমৃত বিতরি'
বিশ্বের হিতে নিত্য-সৎ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে
জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ,
শুদ্ধ মহৎ সু-বৃহৎ।

* অখণ্ড-সংহিতা দ্বাদশ খণ্ড হইতে গৃহীত 'ভারতবর্ষ উঠিবে আবার'।

(৭)

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্;
ব্যথিত পতিত দুঃখী দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক।।
ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক।।

দুরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক।।

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগেই অমৃত, নহেক ভোগ।।

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৫৮' নং গান।


অখণ্ড
সংহিতা
বা
খণ্ড
স্বরূপানন্দ পর
দেবের
উপদেশ
অ
খ
ণ্ড
-
সং
হি
তা
সপ্তদশ
খণ্ড
অখণ্ড
সংহিতা
বা
সপ্তদশ
শ্রী শ্রী স্বামী
স্বরূপানন্দ পরমহংস দে
উপদেশ - বাণী